সূ চি প ত্র

উপন্যাস

জী ব ন প্র ণা লী

—'আজ আমি বায়স্কোপ দেখতে যাব—'

—'যেও—'

—'তুমি বললেই তো হবে না : এ বাড়িতে তো তুমি শালগ্রাম।' নিস্তব্ধ নীরব ছিলাম।

কিন্তু বায়স্কোপে যাবার জন্য অঞ্জলি আর পীড়াপীড়ি করল না—সন্ধ্যার সময় দেখলাম বালিশের বাঁ পাশে একটা হ্যাজাক লণ্ঠন রেখে একটা বই হাতে নিয়ে শুয়ে আছে।

পেছন থেকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম মার্টিমারের এথিকস পড়ছে। চলে যাচ্ছিলাম।

অঞ্জলি—'কে!'

—'আমি—'

—'চলে যাচ্ছ!'

'—হ্যাঁ'

—'কিসের জন্যে এসেছিলে?'

—'এমনিই।'

—'এমনিই? ভেবেছ, আমি বুঝি না কিছু? উঁকি দিয়ে দেখতে এসেছিলে আমি কী পড়ছি?'

—'বইখানা কোথায় পেলে তুমি?'

—'এই মার্টিমারের কথা বলছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'জোগাড় করে নিয়েছি। তোমার মুখাপেক্ষা করে তো আর দিন চালাই না। তা হলে—'

—'বি-এ পড়বে বুঝি?'

—'পড়ব বই কি—'

—'ফিলজফি নেবে?'

—'হ্যাঁ ফিল আর হিস্ট্রি—'

—'ইকনমিকস নিলে পারতে।'

—'বড্ড শক্ত না?'

—'ম্যাথমেটিকস নাও না?'

—'বটানি নিতে পারলে নিতাম—'

—'আর অ্যাডিশনাল বাংলা? বটানির সঙ্গে সেটা খাপ খায় বড় ভাল।'

—'পাশ আমাকে করতেই হবে—'

—'মাস্টারি করবে তুমি?'

—'তা ছাড়া তো আর-কোনো পথ নেই। বিয়ের পর চার বছর হয়ে গেল—' একটু চুপ থেকে—'তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে হাঁড়িতে ভাত ফুটবে না আর—এ-কথা আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল।—পরকাল তো খুইয়েইছি'—খানিক ক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে—'শালগ্রামকে উঠিয়ে-বসিয়ে ধুইয়ে-মুছিয়ে এ-চারবছর যত ছেলেখেলার পাপ হল, সে-সবের থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচি—'

—'কোথায় যাবে?'

—'যে কোনো দিকে—চাকরি পেলে—'

—'চাকরি পেতে হলে তোমাকে বি-টিও পড়তে হবে বোধ করি—'

—'আচ্ছা। সে আমি বুঝব—'

—'হয় তো এম-এ ডিগ্রিও পাশ করতে হবে—মেয়েদেরও আগের মতন সে-রকম সুবিধা এখন নেই। দিনের পর দিন শস্তা হয়ে যাচ্ছে সব—'

—'বি-এ পাশ করে আমি মাস্টারি পাব?'

—'হয় তো ত্রিশ টাকার—'

—'পঁচাত্তর টাকার এক পয়সাও কম নয়—একশও পেতে পারি'—অঞ্জলি এই

রকম মনে করে। কিন্তু একদিন দেখবে যে চল্লিশ টাকার মাস্টারিও একজন বি-টি পেয়ে গেছে—কিংবা একজন এম-এ······যাক্, বেচারিকে মিছিমিছি বকিয়ে কী লাভ! ক্রমে-ক্রমে সবই তো বুঝবে—

বললাম —'মাস্টারিই যখন করবে তোমার ম্যাথমেটিকস নেওয়া উচিত ছিল অঞ্জলি—অঙ্কের গ্রাজুয়েটের তবুও খানিকটা দাম আছে—'

—'অঙ্ক আমার ভাল লাগে না—'

—'কিন্তু নেওয়া উচিত ছিল—তবুও'

—'তোমার বুদ্ধিতে চলে এই চারটে বছর তো আমি খুইয়েছি—এখন আমাকে পরামর্শ দিতে এসো না আর—'

একটু চুপ থেকে—'আমি ম্যাট্রিক ক্লাস থেকেই অঙ্ক ছেড়ে দিয়েছি যে—'

—'ও তাই দিয়েছিলে না কি?'

—'কী করে বি-এ তে অঙ্ক নিই তা হলে?'

—'না, তা হলে তো আর নিতে পারা যায় না—'

বললাম—'কিন্তু সংস্কৃত ছাড়তে চাচ্ছ কেন? স্কুলের কাজে সংস্কৃতেরও খানিকটা মূল্য আছে—'

—'সত্যি বলছি তোমাকে, এ-রকম করে তুমি আমাকে ঘাবড়ে দিও না তো—'

—'সংস্কৃতটা নাও—'

—'আঃ!—এখান থেকে চলে যেতে পার তুমি—'

পরদিন সন্ধ্যার সময় অঞ্জলি—'সংস্কৃতের ব্যাকরণ হাতে নিলে আমার মাথা ধরে—'

—'তাই না কি? কিন্তু ব্যাকরণের এমন কী আর দরকার?'

—'সমাস-সন্ধি ভাঙতে হবে না? সূত্র মুখস্ত লিখতে হবে না? তোমার পায়ে ধরি—এ আমাকে দিয়ে কিছুতেই হবে না—'

—'সংস্কৃতের অক্ষরও বোধ করি চেনো না?'

অঞ্জলি মাথা নেড়ে—'চিনি; কিন্তু দেখলে ভয় করে, তাকাতে-তাকাতে মাথা ধরে যায়—'

লণ্ঠনটা বিছানার ওপর রেখে মার্টিমার নিয়ে বসেছিল সে। বললাম—'বইটা রেখে দাও।'

—'রেখে দেব? কী করব তা হলে? তোমার সঙ্গে লুডো খেলতে হবে?

এ সময় তো তুমি রোজ ব্রিজের আড্ডায় যাও—আজ কেন মিছিমিছি আমাকে জ্বালাতে এসেছ ?'

'বড়-বড় বইগুলো না পড়ে সুবিধামত নোট পড়লে ভাল হবে—আমি তোমাকে কতকগুলো নোট যোগাড় করে দেব—'

অঞ্জলি—'নোট পড়ে পাশ করতে পারে মানুষ ?'

—'খুব—মার্টিমার এ-সব ত পড়লে কয়েকদিন বসে ; হয় ত পড়তে ভাল লেগেছে—'

—'না, বিশেষ সুবিধা লাগে নি—'

—'কী লিখেছে বুঝতে পারো নি হয় ত—'

—'কেউ না বুঝিয়ে দিলে কী করে বুঝব ?'

—'আচ্ছা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি—'

—'থাক।'

—'বাঃ বাঃ, প্রেসিডেন্সি কলেজের টিউটোরিয়ালে আমি চমৎকার নম্বর পেতাম মেটাফিজিকসে।'

—'হয়েছে ! এখন আমার বইটা ছাড়ো তো—'

—'এই দেখো, ধরো, চার্লসন আমার মুখস্ত—'

বইটা এক ঝটকায় টেনে নিয়ে অঞ্জলি—'আমি মুখস্ত করতে জানি •।'

একটু বিব্রত হয়ে—'এ সব বই তৈরি করতে গিয়ে আমি শক্তির অপব্যয় করেছি শুধু ; সেদিন বুঝি নি—কিন্তু আজ বুঝেছি। তোমাকে কয়েকটা বেশ ভাল দেখে নোট জোগাড় করে দেব। খুব কম সময়ে এমন চমৎকার তৈরি হবে—'

বাধা দিয়ে অঞ্জলি—'ইস, আমি বই পড়ি না বুঝি ?'

—'এই বড়-বড় বইগুলো ?'

চোখ সে কপালে তুললে—'তোমার চেয়ে আমার কম ক্ষমতা ?'

—'কিন্তু তোমার শরীর যে বড্ড অসুস্থ ; সন্তান হবার পর থেকেই—'

বাধা দিয়ে অঞ্জলি—'বেশি কথা বলো না—আমার মাথা ঘোরে।'

হাত-পাখাটা তুলে নিলাম।

—'না বাতাস দিও না—'

—'মাথায় জল দেবে ?'

—'বাতিটা সরিয়ে রাখো তো'

বাতি কমিয়ে ঘরের একপাশে রেখে দিলাম।

অঞ্জলি বিরস চোখে—'আমার ঘরের ভিতর রাখলে কেন ?'

—'একেবারে নিভিয়ে দেব।'

—'কেন ?'

অন্ধকারের মধ্যে জানলার ভিতর দিয়ে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না নেমে এল।

অঞ্জলি ধীরে-ধীরে উঠে গিয়ে কলসীর থেকে দু-তিন গ্লাশ জল গড়িয়ে নিয়ে মাথায় ঢালতে-ঢালতে বললে—'তুমি এখন যাও।'

—'কোথায় যাব ?'

—'আমি একটু নিরিবিলি হয়ে থাকতে চাই।'

—'একটা অ্যাসপিরিন খাবে ?'

—'না।'

—'শোও ; আমি তোমাকে বাতাস দেই।'

অঞ্জলি একটু হেসে—'তোমাকেই-বা কদিন বাতাস দেই আমি ? মাথা কি আমারই ধরে শুধু—তোমার কোনো রোগ হয় না কোনোদিন ? একা পড়ে থাকো—আমাকেও একা পড়ে থাকতে দাও।'

বকতে-বকতে বিছানায় এসে বসল। দেখলাম, সমস্ত মাথার জলে শাড়ি ছব ছব করে ভিজছে।

বললাম—'মুছবে না, অঞ্জলি ?'

—'না বেশ আরাম লাগছে—'

—'গায়ে জল বসে যাবে তো—'

খানিকক্ষণ মাথা চটকায়। চুপ করে শেষে—'হাঁ—বাতিটা জ্বালিয়ে একটু কমিয়ে দিয়ে চলে যাও তুমি। এইবার দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ব।'

—'বাতি জ্বালানোর কী দরকার ?'

—'আচ্ছা বেশ, আমিই না-হয় জ্বালিয়ে নেব—দেশলাইটা—'

—'খেয়েছ ?'

—'না।'

—'খিদে নেই ?'

—'না।'

—'একটু কিছু খেতে হয়'

—'আমার জর্দা ফুরিয়ে গেছে —খানিকটা জর্দা দিতে পার ?'

—'জর্দা খাবে শুধু ?'

—'জর্দা পেলে দুটো পান খেতে পারি —'

—'জর্দা আমি এনে দেব না তোমাকে—'

—'আজ রাতের মতন জর্দা আমার কাছে আছে। কাল সকালে অমলকে দিয়ে আনাব—'

চলে যাচ্ছিলাম—

—'আমাকে একটু জর্দা কিনে এনে দেবে ?'

—'বললে না তোমার কাছে রয়েছে—'

—'কোনো জর্দা নেই।'

—'পয়সা দাও।'

—'পয়সা তো আমার কাছে নেই।'

—'আমার কাছেও তো নেই।'

—'কী করে এনে দেবে তা হলে ? জর্দা না-হলে তো চলবে না আমার।'

ধীরে-ধীরে বিছানার উপর উঠে বসে অঞ্জলি—'সত্যি পয়সা নেই ? না বিড়ি কিনবার জন্য লুকিয়ে রেখেছ ?'

মাথা নেড়ে—'বিড়ি তো না, চুরুট ; তা চুরুটও আমি অনেক দিন হয় ছেড়ে দিয়েছি।'

—'বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে —এম-এ পাশ করেছ একযুগ আগে, তবুও একটা পয়সা যদি সম্বল নেই তোমার—মেয়েমানুষকে জীবনে আকাঙ্ক্ষা করতে গিয়েছিলে কেন ?'

অঞ্জলি —'একটা খাঁচার পাখিকে পুষতে হলেও তো নিঃসম্বল হলে চলে না ! অথচ সৃষ্টির সব চেয়ে বড় জিনিশ নিয়ে খেলা করলে কপর্দকহীন হয়ে —'

নিঃশব্দে বাতাস খেতে-খেতে অঞ্জলি—'পরজন্মে বিশ্বাস আছে ?'

—'কী জানি, বলতে পারি না।'

—'আজকের এই পাপে পথের পাশে কুকুরটি হয়ে যদি জন্মাও ?'

—'তা বলতে পারি, জন্মালে—'

একটু চুপ থেকে অঞ্জলি—'একটা কথা ভেবে বড় সান্ত্বনা পাই। পরস্পরের

কাছে অপরিচিত থেকেই আমরা দু জনে বিয়ে করেছিলাম। আলাপ-পরিচয়ের মধ্যে প্রেমের ভিতর দিয়ে যদি বিয়ে হত আমাদের তা হলে চার বছর পরে প্রেমের এই হার কখনো দেখে কী ভাবতাম বলো তো দেখি—'

নিজেই উত্তর দিল অঞ্জলি, বললে, 'জীবনে অনেক জিনিশকে অবজ্ঞা করতে শিখেছি—কিন্তু তবুও প্রেমের ওপর বিশ্বাস রয়েছে এখনও। যদি কাউকে ভালবেসে জীবনে গ্রহণ করবার সুযোগ পেতাম, তা হলে দু-পয়সার জর্দার জন্য এক বেচারির পরজন্মের অভিশাপের কথা পাড়তে বাস্তবিক বড্ড কষ্ট বোধ করতাম আমি—'

আমার দিকে তাকিয়ে —'আলোটা জ্বালাও—'

—'দেশলাইটা কোথায় ?'

—'দেখো না আমার বালিশের নীচে আছে না কি—'

বালিশের নীচের থেকে নিজেই কী বের করে দিয়ে—'দেখো তো হ্যারিকেনে তেল ভরা আছে না কি !'

দু-একবার ঝাঁকুনি দিয়ে- 'আছে—'

—'কোথায় রাখব ?'

—'যেখানে আছে সেখানেই থাক—'

—'উশকে দেব ?'

—'না, কমানোই থাক—পানের বাটাটা আমাকে দাও তো—'

দিলাম। একটা পান ছিঁড়তে-ছিঁড়তে অঞ্জলি—'না, মানুষের হৃদয়ের স্নেহ-সহানুভূতির বেদনার বন্ধনও হারাই নি আমি।'

—'দু টুকরো শুপুরি দাও দেখি'—জাঁতি দিয়ে একটা শুপুরি চার ভাগ করে কেটে, দু খণ্ড আমার দিকে ছুঁড়ে দিল অঞ্জলি।

বললে—'এই যে তুমি অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছো, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখ করে আমার—এ কোনো বানানো দুঃখ নয়; বুঝবার ভুল নয়; খাঁটি জিনিশ। তুমি মরে গেলে কপালের সিঁদুর মুছবার নিয়ম আমার, বিধবার থান পরতে হবে -তাতে যত না দুঃখ হবে, তুমি বেঁচে থাকতে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে এক-এক সময় তার চেয়ে ঢের বেশি বিচ্ছেদ ও কষ্ট অনুভব করি আমি—ওটা কী ডাকছে গো ?'

—'পেঁচা—'

—'লক্ষ্মী পেঁচা ?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোথায় ?'

—'বোধ করি জাম গাছটায়।'

জানালার ভিতর দিয়ে একবার তাকিয়ে শুধু—'বেশ সুন্দর জ্যোৎস্না, না ?'

—'হ্যাঁ—'

—'আজ সন্ধ্যের সময় বৃষ্টি হয়েছিল বুঝি ? তেলাকুচোর জঙ্গল—আম-কাঠালের ডালপালা সব কেমন ভিজে-ভিজে না ? এই চাবিটা নাও তো।'

—'কেন ?'

—'দেরাজের ভেতর আমার জর্দার কৌটোটা আছে—এনে দাও না লক্ষ্মীটি।'

—'দেরাজে চাবি লাগাবার দরকার হল ?'

—'বিয়ের সময় জেঠামশায় যে হারটা দিয়েছিলেন সেইটে রয়েছে কি না।'

—'কত দাম হবে ? পঞ্চাশ ?'

—'কী জানি—হার তো আমি বিক্রি করব না।'

—'আমি যদি করি ?'

—'কই কৌটো আনলে ?'

—'কৌটোর ভিতর আছে কিছু ?'

—'না-থাকবারই তো কথা। জর্দা নেই-নেই করে দু-তিন দিন জর্দা খেতে পারছি না।'

দেরাজ খুলে কৌটো এনে অঞ্জলিকে দিলাম।

খুলতে-খুলতে—'না যদি থাকে কিছু—তা হলে বাবার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে চার পয়সার জর্দা কিনে এনে দিতে পারবে আমাকে ?'

—'এত রাতে ? বাবা জিজ্ঞেস করবেন, কেন, পয়সা কিসের জন্য ?'

—'তাও জিজ্ঞেস করবেন বুঝি ?'

—'সত্তর টাকা ত মোটে মাইনে—এত বড় সংসার চালাতে হচ্ছে—'

অঞ্জলি একটু থেমে—'যাক পেয়ে গেছি—এই নাও—এইটেই খুঁজছিলাম।'

একটা দোয়ানি সে আমার হাতে তুলে দিল।

দোয়ানিটা নিকেলের নয়—রুপোর।

—'যাও, তুমি চট করে চার পয়সার কিনে এনে দিয়ে ঘুমোও গে—'

—'আমার অবিশ্যি ঘুমোতে দেরি আছে—'

—'তা হলে ব্রিজ খেলো গিয়ে—'

—'ব্রিজ আমি রোজই খেলি তোমাকে কে বললে? মাসের মধ্যে হয় ত বড়-জোর দু-তিন দিন

—'নাঃ—দেরি করো না আর : একটা পান মুখে দিয়েই শুয়ে পড়ব—'

এক-পা দু-পা করে চলে যাচ্ছিলাম—অঞ্জলি পিছন থেকে ডাক দিয়ে—'শোনো,' ফিরে এসে দাঁড়াতে আমার ঘাড়ের উপর একবার ঝাপসা হাত বুলিয়ে নেবার চেষ্টা করে—'তোমার খাট আবার বাইরের ঘরে গেল?'

—'হুঁ।'

—'কেন, বাবার ঘরে পাশে বেশ তো ছিলে—'

—'সেখানে ইন্দিরা থাকবে।'

—'বিছানা পেতেছ তোমার?'

—'পেতে নেব।'

—'মশারি টানিয়েছ?'

—'টানানো যাবে।'

—'দেখো, ভুল করে আবার মশারি না খাটিয়ে শুয়ো না।'

আমি—'এই চৌত্রিশ বছর ধরে মেসে-বোর্ডিঙে থাকা আমাদের অভ্যাস—আমাদের ভুল হয় না।'

অঞ্জলি—'খুকি হবার পর এই আড়াই বছর কেটে গেল। এই আড়াইটা বছর কোন দিন কোথায় শোও, বিছানা কে পাতে না পাতে, কোথা'র কাপড়-চোপড় জামা-জুতো কোনো কিছুরই খোঁজ খবর রাখতে পারি না আমি—আচ্ছা, দু আনার জর্দাই এনো—'

—'দু আনার আনব? বললে না চার পয়সার?'

—'দোয়ানিটা জর্দার জন্যই রেখেছিলাম আমি—'

বলে ধোয়া পানগুলো ছিঁড়তে-ছিঁড়তে অঞ্জলি মাথা হেঁট করে রইল। জর্দার দোকানে গিয়ে বুঝলাম—দোয়ানিটা তেলা, চলবে না।

তিন-চার দিন পর ঘুরে-ফিরে আবার বায়স্কোপ যাবার কথা উঠল।

অঞ্জলি—'আজ আমি যাবই।'

—'সেদিনও তো যেতে চেয়েছিলে।'

—'সেদিন তো জর্দা কিনবার পয়সাও দিতে পার নি তুমি, আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলে—বায়স্কোপ দেখবার পয়সা কোথায় পেতে?'

—'আচ্ছা যেও—নিরঞ্জনকে বলে আমি পাশের জোগাড় করতে পারি।'

—'নিরঞ্জন কে?'

—'এই যে-নিরঞ্জন অরোরা বায়োস্কোপ চালাচ্ছে।'

—'তাকে চেনো তুমি?'

মাথা নেড়ে—'হঁ্যা, একসঙ্গে পড়েছিলাম ইস্কুলে—'

—'তোমাকে পাশ দেবে?'

—'কেন দেবে না?'

—'যদিও-বা দেয়, তুমি চাইবে?'

—'নিজে আমি থিয়েটার বায়স্কোপ বড় একটা দেখি না—দেখার রুচিও নেই, সাধ নেই।'

অঞ্জলি আমাকে বাধা দিয়ে—'থাক্, আমি বায়স্কোপ দেখতে চাই না।'

—'কেন?'

—'তুমি নিজে মনে-মনে ভাবো তোমার রুচি আমার চেয়ে ঢের বেশি উঁচু দরের?'

—'তা না; কথাটা তুমি বুঝলে না অঞ্জলি—শোনো, চলে যাচ্ছ কোথায়?'

ঘরের ভিতর পায়চারি করতে-করতে অঞ্জলি—'যাচ্ছি না—আমার এক জায়গায় বসে থাকতে ভাল লাগে না।'

খানিকটা ঘুরে এসে আঁচল গুটিয়ে এক কোণে বসল।

বললাম—'আমার জীবনের সঙ্গে কেন তোমার নিজের জীবনের তুলনা করো?'

—'কেন? কী হয়েছে তাতে?'

—'অঘ্রান মাসে এক-একটা পরিত্যক্ত পাখির নীড় দেখেছ হিজলগাছের ডাল-পালার ভিতর দিয়ে? কতকগুলো খড়পাতার ছিবড়ে শুধু? আর কিছু না? হেমন্তের কুয়াশা আর শীতবাতাসের অবাধগতি তার ভিতর দিয়ে?'

অঞ্জলি আবার খাট ছেড়ে উঠে চলে গেল।

মাথা হেঁট করে চুপ করে বসেছিলাম।

খানিক ক্ষণ পরে তাকিয়ে দেখলাম অঞ্জলি টেবিলের আরশির কাছে ভিতরে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে পাথরের মত নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

অনেক ক্ষণ বসে রইল।

তারপর এসে বললে—'কী জানি বলছিলে—তোমার জীবনটা যেন কেমনতর ?'

—'নাঃ, কিছু না।'

—'ভাবছিলাম, কপালে একটু সিঁদুর দেব।'

—'তা দিলেই পারো।'

—'দেব-দেব বলেই আরশির সামনে বসেছিলাম।'

একটু চুপ থেকে—'যা বলছিলাম, এই যে বললে পাশ যোগাড় করে আনা যায় ; অরোরা বায়স্কোপের সেই নাকি এখন পুরোপুরি মালিক হয়েছে।'

বললাম—'সে সহৃদয় হুজুগে মানুষ—হয় ত বক্সের পাশ দিয়ে দেবে।'

—'যেতে হলে গাড়িও লাগবে—'

—'তা লাগবে বই-কি।'

—'গাড়িভাড়ার জোগাড় করতে হয় তা হলে ?'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে—'না, আস্তাবলেরও পাশ পাওয়া যাবে ?

একটু হেসে—'গাড়িভাড়ার ব্যবস্থা আমি করব—'

—'কাপড়-চোপড় পরি তা হলে ?'

—'পরো—'

—'না সে-বন্ধুর সঙ্গে আগে কথাবার্তা বলে আসবে ?'

—'কী দরকার ?'

—'শেষ মুহূর্তের জন্য ফেলে রাখবে ? তখন যদি পাশের কোনো ব্যবস্থা না থাকে ?'

—'তা হলে পয়সা দিয়ে যাব।'

অঞ্জলি একটু হেসে আমার হাত চেপে ধরে—'কেন, টাকা কোথায় পেলে বলো তো—'

—'মার সিঁদুরের কৌটোর থেকে।'

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে অঞ্জলি—'ছি, সিঁদুরের কৌটোর টাকা এ-রকম ভাবে খরচ করবে ?'

—'নোয়া-সিঁদুর সম্বন্ধে আমারও কোনো অন্ধ ধারণা নেই অঞ্জলি, তোমারও নেই কিছু।'

অঞ্জলি ভুরু কুঁচকে—'অন্ধ ধারণা কাকে বলো তুমি ?'

—'না হয় বললাম স্বজনশ্রদ্ধা, আছে কি সিঁদুরের প্রতি তোমার ? আমার তো নেই।'

—'তুমি কি মনে করো সিঁদুরকে আমি মনে-মনে উপেক্ষা করি ?'

একটু হেসে—'এই তো আধ ঘণ্টা ধরে আরশির পাশে বসে সিঁদুর পরবে ভাবছিলে।'

—'তা ভাবছিলাম বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরা হল না—'

—'হ্যাঁ, শাদা কপালে উঠে এলে—'

—'তোমার অভিমান হয়েছে ?'

—'ভাল লেগেছে আমার অঞ্জলি।'

—'ভাল লেগেছে ? কেন ?'

—'দেখলাম, আমার মতন তোমারও ফোঁটা-তিলকে বিশ্বাস নেই।'

অঞ্জলি একটু চুপ থেকে—'ছ-সাত দিন ধরে আর সিঁদুর পরা হচ্ছে না আমার। আমার সঙ্গে তুমি যাবে ?'

—'অন্য কাউকে যদি পাও তা হলে আমাকে বাদ দিলেই ভাল হয়।'

—'অমল যেতে পারে।'

—'কোন অমল ? কেদারবাবু মুন্সেফের ছেলে ?'

—'হ্যাঁ, বেচারির বড্ড শখ—কিন্তু ওর বাবা একটা পয়সাও দেয় না।'

—'অমল এখনো আছে এখানে ? কলকাতায় যায় নি ?'

—'নাঃ ; থার্ড এম-বি ফেল করে বেচারার মনে বড্ড কষ্ট—কয়েকদিন পরে কলকাতায় যাবে।'

—'সিনেমা হাউস পর্যন্ত আমি তোমাদের পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে পারি—'

—'কীই-বা দরকার ?'

—'না, ঐ নিরঞ্জনকে বলতাম পাশের জন্য—'

—'থাক, টাকা যখন পেয়েছি তখন পাশের জন্য মিছিমিছি বলতে যাবে কেন

আর ?'

—'তাও তো বটে—'

—'নিরঞ্জন মনে করবে তাকে সুবিধায় পেয়ে তুমি আদায় করে নিচ্ছ—'

—'থাক ; পাশ নিয়ে আর দরকার নেই—'

—'পাশ নিয়ে গেলে অমলের কাছে তো মুখ থাকে না—'

—'ঠিক কথাই তো।'

—'একটা টাকাই দাও। গাড়িভাড়া আসতে-যেতে আট-আনা—অমল আর আমার টিকিট আট আনা-আট আনা এক টাকা। ফার্স্ট ক্লাস, এই দশ দিন, আট আনায় পাওয়া যাবে।'

—'তাই না কি ? কে তোমাকে বললে ?'

—'অমল বলেছে। দেড় টাকা খরচ হবে তোমার—'

পোশাক-আশাক করে বেরুল অঞ্জলি. বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। সিঁদুরহীন চওড়া কপালে রূপসী বিধবার মত। কিংবা কুমারীর মত হয় তো।

সন্ধ্যার অন্ধকারে একা ঘুরতে-ঘুরতে বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম।

ঘরে ফিরে এসে দেখলাম রাজেন এসে বসে রয়েছে।

—'কী, সব কী খবর ?'

—'ব্রিজ খেলতে আপনি আর যান না কেন ?'

—'আর কাহাতক খেলা যায়, অনেক খেলেছি—'

—'সে কী কথা, এ খেলায় আবার ঘেন্না ধরে যায় বলে শুনি নি তো—'

—'না, ঘেন্না আমি করি না ; ব্রিজ একটা চমৎকার খেলা. সুন্দর শিল্প ; সারাটা জীবন এতে উৎসর্গ করলেও সমুদ্রের পারে পাথর মাত্র কুড়ুচ্ছি ভেবে মনে আক্ষেপ থেকে যায়. রাবার করবার সময় মনে হয় স্যার রোলাণ্ড রস-এর চেয়েও বড় একটা কিছু করলাম—'

রাজেন—'চলুন আজ যাই।'

—'ন্-না—'

—'বাঃ, আপনার এমন খেলবার চমৎকার কায়দা—আপনাকে আমরা বড্ড মিস করি।'

—'তুমি খেলতে চলেছ বুঝি ?'

—'হ্যাঁ, যাচ্ছি ; আপনি চলুন না ?'

—'না।'

—'ভেবেছিলাম কিন্তু আপনি যাবেন।'

বলে রাজেন বসল আবার।

জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে—'যা বৃষ্টি আসছে—। চুরুট খাবেন ?'

—'দাও।'

চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে—'বৌদি কোথায় ?'

—'বায়স্কোপ দেখতে গেছে।'

—'এই ঝড়-ঝটকার মধ্যে গেল ?'

—'যখন গিয়েছে তখন আকাশ পরিষ্কার ছিল।'

—'গিয়েছে, ভালই করেছে ; আমিও মাঝে-মাঝে আমার বউকে নিয়ে যাই—ঘণ্টা দু-তিন বেশ রঙে কেটে যায়।'

চুরুট এক টান দিয়ে রাজেন—'আপনার আর-ছেলেপিলে হয় নি ?'

—'না।'

—'সেই একটি মেয়ে, না ?'

—'হ্যাঁ।'

—'মেয়েটি কত বড় হল ?'

—'আড়াই বছর।'

—'আপনাদের বিয়ে হয়েছে ক-বছর ?'

—'বছর চারেক—'

—'আমাদের বিয়ে হল পাঁচ বছর, কিন্তু ছেলেপিলে নেই—ভাববেন হয় তো সে বাঁজা কিংবা আমি কুলধ্বজ। তা নয়।'

—'নয় ?'

রাজেন মাথা নাড়ে—'না।'

—'তবে কী রাজেন ?'

—'বৌয়ের সম্মতি নেই—'

—'কী রকম ?'

—'সে ছেলেপিলে চায় না।'

—'এ-রকম মারী স্টোপসের মত মেয়ে বিয়ে করলে ?'

—'বাঃ। চুরুটটা গেল নিভে, আপনি যে জ্বালালেনই না—'

—'জ্বালাব।'

—'বাস্তবিক, কোনোদিনও সন্তান হবে না—এ বড় বিশ্রী। যখনই গিয়ে বলি হৃদয়েই গিয়ে লাগে বেশি ?'

—'কিন্তু বন্ধ্যাত্ব মায়ের হৃদয়কেই বেশি আঘাত দেয়।'

—'মা বলছেন কাকে ?'

—'তোমার স্ত্রীকে।'

—'সে মা হল কোন হিসেবে ?'

—'সব নারীরই মায়ের মত হৃদয় নেই ! কী বলো রাজেন ?' রাজেন খানিক ক্ষণ নীরবে চুরুট টানল।

বললে—'এখন আমার বয়েস ত্রিশ, এখন যদি একটি ছেলে হত তা হলে পঞ্চান্ন বছরে আমি চাকরি ইস্তফা দিয়ে দু-পা ছড়িয়ে বসতাম।'

—'ওঃ, সেই জন্য ছেলে চাও বুঝি তুমি ?'

—'কে না চায় বলুন ; সেই ছেলে—বুড়ো বয়সে বাপকে খাওয়াবে- সেই জন্যই তো বিয়ে করা।'

—'সেই জন্যই কি শুধু বিয়ে করা রাজেন ? তা বেশ তো। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে পটাতে পারলে না বুঝি ?'

—'না। থাক গে। রিটায়ারমেন্টে পেনশন পাব।'

—'তোমার স্ত্রী কী বলে ?'

রাজেন নিস্তব্ধ ভাবে চুরুট টানতে লাগল।

অনেক ক্ষণ পরে—'স্ত্রীকে তো আমি পরিত্যাগ করতে পারি।'

—'তা পারো বটে।'

—'হিন্দুসমাজে আর-এক বিয়ে করলে তো পারি। কিন্তু কিছুই করলাম না আমি। জীবন বিধাতার বিরুদ্ধে যারা লড়াই করতে পারে, তাকে চক্রান্ত করে সাজা দিতে পারে, তাদের জাত আলাদা। আমি শুধু মনুষ্যত্ব, চরিত্র, দাক্ষিণ্য, শুভবুদ্ধির পুরস্কার মাথায় নিয়ে ফিরছি।'

—'এ পুরস্কারগুলো তো ধুলোর মতন—কী বলো রাজেন ?'

—'অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদি তাই।'

—'কেন ?'

—'কী পেলাম জীবনে ?'

—'তুমি অবিশ্যি কম পাও নি রাজেন, এক শ টাকার চাকরি-- '

বাধা দিয়ে রাজেন—'ঘরের ভিতর যার অন্তঃসারশূন্য, চাকরি দিয়ে সে কী করবে ?'

—'বৌমা তোমাকে ভালবাসে না ?'

—'খুব ।'

—'কোনো রোগ-শোক নেই তো ?'

—'কার ? বৌয়ের ?'

—'হ্যাঁ ।'

—'না, বেশ সুস্থ শরীর ; মনে কোনো বিরসতা নেই ।'

—'বুদ্ধি-বিচার আছে ?'

—'খুব ।'

—'শুধু সন্তানবহন করতে চায় না– এই এক অভাব বুঝি ?'

—'কিন্তু এক জন পুরুষের জীবন এতেই কি পণ্ড হয়ে যায় না ?' চুরুট জ্বালিয়ে মানুষের হৃদয়ের তৃষ্ণার কথা ভাবছিলাম—আমিও মাঝে-মাঝে তৃষ্ণা অনুভব করি ; তৃষ্ণা জাগে—নারী যে তৃষ্ণাহীন সে কথা বুঝতে পেরে বিস্মিত হই, আঘাত পাই, আঘাত পাই, বিস্মিত হই ।

তারপর ধীরে-ধীরে জীবনের অনুকরণ নামে ভয়াবহ দীর্ঘ নদীর পার ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়ি । জ্বলতে হয়---জ্বলে যেতে হয় । কোনো জিনিশ নিয়ে চিন্তিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকলে কী করে চলে মানুষের জীবনে ?

রাজেন—'ভালবাসা হয়েছিল সাজাহানের'

—'কী রকম ?'

—'মমতাজ তাকে ষোলটি সন্তান দিয়েছিল—'

রাজেন এ রকম কথা অনেক ক্ষণ ধরে ভাবে হয় তো ।

বললাম—'টলস্টয়-এর অনেক সন্তান ছিল –'

—'তা ছিল বই কি ।'

—'কিন্তু তাদের দাম্পত্যজীবন বিশেষ সুখের ছিল না তো ।'

—'এনিম্যাল লাইফ তো চমৎকার ছিল ।'

নীরব ছিলাম।

রাজেন—'তবে আর চাই কী? মানুষের জীবন একটা গাছের মত হবে না শচীনদা? একটা মস্ত বড় জাম বা বটগাছের মত, যত ইচ্ছে তত ফল ফলফলিয়ে, আকাশে-বাতাসে ডালপালা বিস্তার করে, দিনরাত পরিতৃপ্তি ও প্রকাশ চলবে না তার?'

—'তুমি না ও-বছর আগে ওয়ালটেয়ার গিয়েছিলে রাজেন?'

'হাঁ।'

—'কিসের জন্য?'

—'থাইসিস হয়েছিল'—

—'বটগাছের মতন জীবন তুমি চালাবে?'

—'না-হয় পেয়ারাগাছের মতই চালাতে দিন না বিধাতা। এ যে একেবারে কাঠফাটা দুপুরে ফোঁপরা বাঁশের মত করে রেখেছে।'

চুরুট টান দিলাম

রাজেন 'এ স্ত্রীকে দিয়ে আমার কিছু হবে না।'

—'এ-রকম স্ত্রী তো তোমার একার না।'

—'আমার জীবনের সবচেয়ে গভীর মুহূর্তে সে আমাকে বাধা দেয়।'

—'গভীর মুহূর্ত তুমি কাকে বলো রাজেন?'

—'আপনি প্রেমিক মানুষ হয়ে তা বোঝেন না? সাজাহান তো কতবার বুঝেছিলেন।'

—'তাজ পরিকল্পনার মুহূর্তই তো তার সবচেয়ে গভীর মুহূর্ত ছিল।'

—'এটা বাজে ইয়ার্কি হল আপনার।'

—'তাই না কি?'

চুরুটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আগুন নিভে গেছে।

রাজেন 'যে-কটি বছর ধরে তার ষোলটি সন্তান জন্মাল গভীরতা ও বিহ্বলতায় সে কয় বছরের তুলনা হয় না আর।'

রাজেন এই রকম স্থূল?

কিন্তু তবুও সে বটগাছের কথা বলেছে। শাখাপ্রশাখাবহুল আম ও বটের সবুজে-সবুজে ও ডালপালার উচ্ছ্বাসের কথা ভাবতে ভাল লাগে না তার—গরমে বৃষ্টির অবিশ্বাস্য ফোঁটা ভাল লাগে হয় তো—সুস্থ নরম মাটির ভিতর থেকে

যে নিরবচ্ছিন্ন সোঁদাগন্ধ বেরোয় নিশ্চয়ই ভাল লাগবে রাজেনের—অফুরন্ত সবুজ ঘাস, অবাধগামিনী পদ্মা ও কর্ণফুলীর গভীর জঘন ও জঙ্ঘা অন্ধকারে ও জ্যোৎস্নায় ; শ্রাবণের রাতে উচ্ছ্রিত কলরব ; জীবনের উদ্দাম বীজ সঞ্চারণের পালা তাদের—এই রকম ভাল লাগে রাজেনের—চারদিককার নদী-সমুদ্র-অরণ্যের প্রাণধারণের আনন্দ ও প্রাণ জননের প্রসারণের তীব্রতা। জীবনের গভীরতা বলতে এই-ই সে বোঝে—

আমিও কতদিন এই রকম বুঝতাম—তারপর বেদনা ও নিষ্ফলতার পথে চলতে-চলতে হৃদয় ভিন্ন মোড় নিল। শীতের রাতে আমহার্স্ট স্ট্রিটে কুকুর ও ঐ ফুটপাথের ভিতর একজন দাড়িঅলা নিষ্পেষিত ভিখারির জীর্ণশীর্ণ মুখ কেমন যেন নিবিড় হয়ে বুকের ভিতর এসে লাগে।

গ্রে স্ট্রিটে অন্ধকারের ভিতর সারি-সারি যে রূপহীনা দাঁড়িয়ে আছে তাদের দেখে কেমন একটা খোঁচা একেবারে এড়িয়ে যেতে পারি না। কলেজ স্ট্রিটে হাঁটতে-হাঁটতে দেখি ফুটপাথে ন্যাকড়া জড়ানো পায়ে পা ছড়িয়ে কুষ্ঠরোগীরা বসে আছে সব। নুলো হাত তুলে অবিশ্রাম সেলাম ঠুকছে, রাস্তার থেকে এদের তাড়িয়ে দেবার জন্য খবরের কাগজে অবিরাম লেখালেখি চলছে। আমার ইচ্ছা করে এদের গুলি করে রাস্তা সাফা করে ফেলি—জীবনের এই সব বীভৎসতা বিকৃতি ও পরাজয়ের মুখোমুখি এসব হৃদয় কোনো পথ খুঁজে পায় না, মেসের শূন্য ঘরে ফিরে এসে অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে থেকে কোনো বিধাতাকে খুঁজে পাই না। আন্তরিকভাবে আত্মদান করে কোনো প্রার্থনা করতে পারি না। দাঁত ব্যথা করে। একটা রেস্টুরেন্ট থেকে মাংস রান্নার গন্ধ ভেসে আসে, রেডিওর দোকানে মজলিশি গান অক্লান্তভাবে ঝঙ্কার দিয়ে চলে, একটা চুরুট মুখে দিতে গিয়ে দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে। —মাড়ি ও দাঁতই জীবনের সবচেয়ে কৃতী জিনিশ হয়ে দাঁড়ায়। গবর্মেণ্টের ডিপার্টমেণ্টে একশ টাকার চাকরি করে রাজেন এ সবের কিছু বুঝবে না। তবুও বললাম—'আমি ঈশোপনিষৎখানা এনে তোমাকে দেখাচ্ছি রাজেন।'

—'কী দেখাবেন ?'

—'কয়েকটা শ্লোক পড়ব তোমার কাছে—'

—'হেঃ হেঃ বিশ্বাস করেন আপনি ?'

—'মাঝে-মাঝে নিজের মনে অন্ধকারের ভিতর ঝঙ্কার দিয়ে পড়তে গেলে খুব

'তৃপ্তি পাওয়া যায়।'

চুরুটটা জ্বালাতে-জ্বালাতে—'অবিশ্যি সে তৃপ্তি খুব ক্ষণিক রাজেন—অধিকাংশ সময়ই মনটা গুহার মত অন্ধকারের ভিতর হাঁ করে থাকে।'

রাজেন পকেটের থেকে একটা চুরুট বের করে—'আপনাকে দেখে বড্ড দুঃখ করে আমার।'

—'কেন ?'

—'বাস্তবিক চাকরি-বাকরি পাচ্ছেন না ; একটা পয়সা নিজের বলে নাড়বার-চাড়বার স্বাধীনতা নেই। বয়স হল ত্রিশ। অথচ আপনি আমাদের চেয়ে কত মেধাবী ছিলেন।'

চুরুট জ্বালাল সে।

বললে 'সেই বাইশ বছর বয়স যদি থাকত তা হলে কম্পিটিটিভ একজাম দিতেন না ?'

—'তা দিতাম বলে তো অবিশ্যি মনে হয় রাজেন।'

—'কিন্তু বয়স যখন ছিল তখন দিলেন না কেন ?'

—'কেউ-কেউ দেয়, কেউ-কেউ দেয় না—সকলের জীবনের পথ তো এক রকম নয় রাজেন।'

—'আমি তো খোঁজাখুঁজি করে কেরানিগিরি পেলাম—আপনারা নিজের শক্তিতে কত হাকিমি নবাবি পেতে পারতেন। কিন্তু এখন হয় তো আমাকেও ঈর্ষা করেন ?'

চুরুটে একটা টান দিল সে, বললে—'দেখুন না আপনার চেহারার দিকেই তাকিয়ে—আরশিতে মাঝে-মাঝে দেখেন ?'

মাথা নেড়ে—'দেখি বই কি—'

—'কেমন হাড়হাভাতের মতন চেহারা হয়ে গেছে আপনার।'

হাসতে-হাসতে—'সমীহ করে কথা বলতে হয় রাজেন, ইস্কুলে যে তোমাকে দু-চার দিন পড়িয়েছিলাম তাও ভুলে গেলে!'

—'চোয়াল বেরিয়ে গেছে—চোখ গেছে আড়াই হাত ডেবে, কয়েক দিন পরে লোকে যদি বলে কোন ঢেঁকির চাল খেয়ে এ ঘাটের মড়ার রূপ হচ্ছে তোমার, তা হলে কী বলবেন ?'

—'রূপ যা-খুশি তাই হোক রাজেন—ফুসফুস তো এখনও যক্ষ্মা প্রচার

করে নি।'

—'করে নি বুঝি?'

—'কই না তো—'

—'সারাদিনের মধ্যে টেম্পারেচার একবারও রাইজ করে না?'

—'বুঝি না তো।'

—'যক্ষ্মা রুগীদের আত্মতৃপ্তি বড় মারাত্মক—ভাবে যে তারা সবচেয়ে নীরোগ।'

—'না, যক্ষ্মা আমার হয় নি।'

—'হতেই বা কতক্ষণ? বার মাস স্ত্রীকে কাছে রাখেন -আপনার শরীরের এ-অবস্থায় এটা ভাল নয়।'

—'ভাল নয়?'

—'বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন।'

—'বাপ নেই যে বেচারির, বাপ-মা ভাই-বোন কিচ্ছু নেই; একজন কাকা আছেন।'

—'তা হলে সেখানে থাক না।'

—'সেখানে যেতে চায় না।'

—'তা হলে আপনিই না হয় সরে পড়ুন।'

—'না, স্ত্রীকে আমি অত ভয় পাচ্ছি না রাজেন।'

—'কী রকম!'

—'সে সারাদিনই নিজের ঘরে দোর দিয়ে থাকে—'

—'কেন?'

আমি থেমে—'পড়ে। জীবনের প্রবঞ্চনার কথা ভাবে; দাম্পত্যকে অন্যায় ভেবে দূরে সরে থাকে! একটি মেয়ে হয়েছিল। আর-কিছু হবে না আমাদের।'

রাজেন অনেক ক্ষণ চুপ করে থেকে—'আচ্ছা উঠি তা হলে—'

—'উঠতে পারো—'

—'আপনার সামনের দাঁতটা পড়ে গেল কি করে?'

—'অনেক দিন থেকেই—দাঁত ব্যথা।'

—'কী দিয়ে দাঁত মাজেন?'

—'উনুনের ছাই দিয়ে।'

—'আপনার উচিত একটা পপলাইলার টুথ ব্রাশ কেনা—'

—'দাম কত?'

—'কলকাতায় চোদ্দ আনা হবে। এখানে এক টাকা পাঁচ সিকা—আর ফরহান্সের টুথপেস্ট কিনবেন—জোনাটইন না লিস্টারাইন দিয়ে মুখ ধোবেন।'

রাজেন অবিশ্যি জানে এ সব ব্যবহার করবার কোনো সঙ্গতি নেই আমার। হয় তো একটা ঠাট্টা করল।

চুরুট টানছিলাম।

দেখলাম পকেটের থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করেছে।

বললে—'ইস্কুলে যখন পড়তাম তখন ত চার দিন পড়িয়েছিলেন—তার গুরু দক্ষিণা নিন।'

'তা তো হেডমাস্টার দিয়েছেন রাজেন।'

—'শুনেছি, হেডমাস্টার কিছু দেন নি।'

—'কে বললে তোমাকে?'

'কলেজের ভাল ছেলেদের বিনে পয়সায় খাটিয়ে নেবার বদভ্যাস ছিল তাঁর।'

খানিকটা সময় কেটে গেল।

আমি—'রাজেন একদিন যখন তোমাদের কাছে ভিক্ষে চাইব তখন কিছু দেবে না জানি; কিন্তু আজও যখন ভিখিরি সাজি নি তখন মিছিমিছি আমাকে দিচ্ছ কেন?'

—'আচ্ছা নোটটা তা হলে আপনার বালিশের নীচেই থাক—যাবার সময় নিয়ে যাব—আর একটা চুরুট নিন বরং; মুখে যেটা সেটার তো বাপান্ত হয়ে গেছে—'

চুরুটটা আমার মুখের থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিল রাজেন।

বললে—'এইটে জ্বালান এবার।'

—'এগুলো কোথাকার চুরুট রাজেন!'

—'অবশ্য বার্মিজ নয়; এগুলো এসেছে জাভার থেকে।'

—'বাঃ দিব্যি তো।'

—'জ্বালিয়ে নিন।'

—'না, এটা এখন খাব না।'

—'খাবার পর খাবেন ? বেশ, সে খুব ভাল কথা।'

আরো দু-চারটা চুরুট আমার বিছানায় গড়িয়ে দিয়ে—'নিন। কলকাতায় গিয়ে মেসে উঠবেন তো ?'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—'একেই বলে ভবিতব্য।'

—'চশমা নেব-নেব করছি।'

—'থাক, আপনার জীবনের নিষ্ফলতা-বেদনার ঢের আলোচনা করা গেল ; এখন আমার কথাটা শুনুন।'

—'বলো।'

—'আপনাদের খিড়কির পুকুরের ওপারে মাধব ভটচাজকে চেনেন ?'

—'চিনি বইকি—'

—'তার মেজ মেয়েটিকে দেখেছেন ?

—'কোনটি বল তো ?'

—'বছর ষোল বয়স হবে ; ছিপছিপে একহারা গড়ন -বেশ ফর্শা চেহারা।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি বই কি, বেশ সুন্দর মেয়েটি—'

—'অসামান্য সুন্দরী—রুক্মিনী নাম—'

রাজেন চুরুটে বড় টান দিয়ে—'এই মেয়েটিকে নিয়ে সাধছে আমাকে—'

—'মাধববাবু ?'

—'হ্যাঁ'

—'তার পর ?'

—'তার পর আমার সচ্চরিত্র হৃদয়, আমার বিবেক, এটা যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে, সারারাত রুক্মিনীর স্বপ্ন দেখি আমি। তার পর সকালবেলা অনেক দেরি করে জেগে উঠে দেখি বৌ ধোপার কাছ থেকে কাপড় বুঝে নিচ্ছে—নিজের সুন্দর ধোপদুরস্ত শাড়ি কটির দিকে তাকিয়ে চোখ তার প্রসন্ন-পরিতৃপ্ত। অন্য একটি নারীকে এনে এই সুন্দর শান্তিকে নষ্ট করে ফেলতে ইচ্ছে করে না।'

বালিশের নীচে হাত গলিয়ে পাঁচ টাকার নোটটা নিয়ে চলে গেল রাজেন।

রাজেন চলে যাবার পর চুপচাপ বসেছিলাম—বাবার ঘর থেকে আস্তে-আস্তে অভয় দত্ত এসে ঢুকল।

নমস্কার তুলে—'ওহো, আপনি কখন এসেছেন?'

একটা চেয়ার টেনে বসে অভয়—'প্রায় আধ-ঘণ্টাটাক।'

—'এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?'

—'আপনার বাবার ঘরে বসেছিলাম।'

—'বাবা আছেন?'

—'না—'

—'কোথায় গিয়েছেন তা হলে?'

—'খেতে গিয়েছেন হয় তো—আপনার কাছে কে-এক ছোকরা বসে ডাঁট মারছিল।'

—'ও—রাজেন—'

—'ভদ্রলোক বিয়ে করেছেন?'

—'হাঁ—সে প্রায় পাঁচ বছর।'

—'ছেলেপিলে হয় নি বুঝি?'

—'না—'

—'কেন হয় নি?'

একটু হেসে—'রাজেন বলে তার বৌ-এর সম্মতি নেই।'

অভয় নাক কুঁচকে—'এই রকম সব জায়গায় বলে বেড়ায় বুঝি?'

'কী জানি—'

—'এ-রকম এক দল লোক আছে। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করলেন ওর কথা?'

চুপ করে ছিলাম—

—'এ কখনও সম্ভবপর কথা? কেউ কোনোদিন শুনেছে এ-রকম? যে লোকটা এক ঘণ্টায় এতগুলো চুরুট টানতে পারে, ব্রিজ খেলবার নেশা যার এত, সে পাঁচ বছর ব্রহ্মচারী হয়ে রয়েছে—'

—'থাক—এ-সব দিয়ে আর কী হবে আমাদের।'

—'আসল কথা কি জানেন? এর স্ত্রীটি বন্ধ্যা।'

—'তা হবে হয় তো—'

—'কিংবা ইনি নিজেই অক্ষম অকৃতী পুরুষ—ইংরেজীতে যাকে বলে—'

—'আপনাদের ইস্কুল কেমন চলছে ?'

—'আর ইস্কুল! সত্তর টাকা করে খাতায় লিখিয়ে নিচ্ছে, দিচ্ছে পঁয়তাল্লিশ—'

—'তাই না কি ?'

—'একটা ফার্স্ট'ক্লাস বি-টি ডিগ্রি মেরে এলাম—তার পরেই এই—'

—'কোনো গবর্নমেণ্ট ইস্কুলে ঢুকতে পারেন না ?'

—'বয়স নেই—'

—'কেন, পঁইত্রিশ বছর বয়স অব্দি তো নেয়—'

—'আমার সাঁইত্রিশ, সংসারে কোনো চাচা সঙ্গে করে আনি নি,...শুনেছি গবর্নমেণ্ট স্কুলগুলো ডিপ্রোইজেশন করবে। একটা এইডেড স্কুলে হেডমাস্টারি পেলে বর্তে যাই—'

—'আমার মনে হয় একটা বি-টি ডিগ্রি যোগাড় করে আনতে পারি যদি '

—'কিচ্ছু লাভ নেই, এই দেখুন না, আমি ফার্স্ট' ডিভিশান ট্রেনিং ডিগ্রি নিয়ে বসে আছি—'

—'বি-এল পাস করলে কেমন হয় ?'

—'ওকালতি করবেন ?'

'—হ্যাঁ।'

—'সে সম্বন্ধে আমরা মতামত দিতে পারছি না—'

একটু হাই তুলে অভয় —'তবে অনেক উকিল আমাদের ইস্কুলে মাস্টারির জন্য দরখাস্ত করছে—'

—'এম-এ, বি-এল সব ?---'

—'ফার্স্ট'ক্লাস এম-এ, ফার্স্ট'ক্লাস বি-এল,'

—'মুন্সেফ তো হতে পারত-'

—'প্রভিনসিয়াল গবর্ণমেণ্টের সিনিয়ার করে দিলেই বা মারে কে ? খুব গুড বয় হয়ে রাজ্যি চালাতে পারত।'

—'বিছানার ওপর আপনার এই চুরুটগুলোর চেহারা তো বেশ ভালো বোধ হচ্ছে—' অভয় দত্ত বললে।

—'হ্যাঁ জাভার চুরুট।'

—'কোথায় পেলেন ?'

—'রাজেন রেখে গেছে।'

—'একটা নেওয়া যায়?'

—'খুব—'

—'চুরুট সিগারেট আমি বড় একটা খাই নে শচীনবাবু, ইস্কুলের মাস্টার—চরিত্রটি হাতে করে নিয়ে বেড়াতে হয়; পৃথিবীর সব ভাল জিনিশই মাস্টার মশায়ের খামা-পেন্নার জিনিশ—'

চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে অভয় 'বাঃ বেশ! বেশ জিনিশ। দেখুন, স্কুল মাস্টারি আমার একদম ভাল লাগে না—'

'লাগে না!'

'না। এর চেয়ে দারোগা হলেও ভাল হত। মানুষের জীবনের স্বাভাবিকতা সহজ আনন্দ-উৎসব যদি কোথাও নষ্ট হয়, বিকৃত হয় তা—আপনার স্কুল আর কলেজ-এর ক্লাস রুমে।'

—'কী রকম?'

—'ক্লাস রুম এই কি শুধু? মাস্টার সেখানেই থাকুক না কেন তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ছেলেদের। সেক্রেটারি, হেডমাস্টার ও স্টাফের মেম্বারদের অদৃশ্য চোখের সামনে একটা অগ্নি পরীক্ষা।'

চুপ করে ছিলাম।

অন্য সাধারণ মানুষের সহজ জীবন চালাবার উপায় তার নেই—সে যেন মঠে প্রবেশ করেছে। কিংবা মাস্টারিতে সেখান থেকে পৃথিবীর নরনারীর দ্বিধাহীন বৈধ জীবনকে অবৈধ মনে করতে হবে তাকে চারিদিককার অন্যের উজ্জ্বল জীবন স্রোতের দিকে বিরস বিকৃত চোখ নিয়ে তাকাতে হবে—অরুচি অক্ষমা অপ্রেম এই-সব তার দেবতা—এই যে আমি চুরুট খাচ্ছি এতেও আমার ভয়'

—'কেন?'

—'যদি কোনো ছেলে দেখে ফেলে

—'এই রাতে এই বাদলার ভিতর কোনো ছেলের এখানে আসবার সম্ভাবনা নেই—'

—'বলতে পারা যায় না—এই তো রাস্তার দিকের দুটো জানলা উদাস খোলা রয়েছে—রাস্তার কেউ আধ মিনিট দাঁড়ায় যদি—'

—'কেই-বা দাঁড়াবে—'

—'ছেলেরা অত্যন্ত ভয়াবহ জিনিশ। চেনেন না আপনি। যদি কাল হেড মাস্টার আমাকে ডেকে বলেন, কাল রাতে তুমি মজলিসে বসে চুরুট খেয়েছিলে কেন? আমি একটুও আশ্চর্য হব না; বুঝব বিধাতা যা দেখেন না, ছেলেরা তা দেখতে পায়—'

—'এই রকম অবস্থা বুঝি?'

অভয় দত্ত মুখ বিকৃত করে বললে—'অখাদ্য!'

—'আপনি চুরুট খেয়েছেন হেডমাস্টারের কাছে সে কথা বলে তাদের কী লাভ?'

—'তারা নিজেদের চরিত্তির জাহির করে—'

—'আপনাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আছে তাদের—?'

—'আমি তাদের মাস্টার এই তো সবচেয়ে বড় অভিযোগ।'

—'বিশ্বাসের জোর আছে তা হলে তাদের?'

—'অন্তত মাস্টারের সম্পর্কে সেটা ব্যবহার করার দরকার বোধ করে তারা—'

কথা বলতে-বলতে চুরুট নিভে গিয়েছিল অভয়ের, সন্তর্পণে জ্বালিয়ে নিয়ে—'সামাজিক ধর্ম ও নীতিতে অচলা বিশ্বাস না নিয়ে কেউ যেন মাস্টারিতে না ঢোকে।'

একটু চুপ থেকে—'জীবনের কোনো সুন্দর প্রয়াসকে শ্রদ্ধা করবার উপায় নেই।'

—'তাই তো দেখছি।'

—'বোদলেয়ারের কবিতার কতকগুলো জায়গা ভাল লেগেছিল আমার। কিন্তু হেডমাস্টার বা স্টাফ-এর কাউকে বললে আর রক্ষে নেই।'

—'বোদলেয়ার, পড়েন?'

—'আছে একখানা—কিন্তু মাস্টাররা কেউ জানেন না।'

—'জানলেই বা কী এসে যাবে অভয়? বোদলেয়ার হাতি না ঘোড়া বুঝবে কি কিছু?'

—'একেবারে যে না-বুঝবে তা নয়; একটা অপরিচিত বই বা অপরিচিত নামে ঢের সন্দেহ জাগে তাদের।'

—'ভাবে হয় তো সেক্স সম্বন্ধে কিছু ?'

—'সেক্স সম্বন্ধে বই—কিংবা ফরাসি উপন্যাস—কিংবা আধুনিক ইংরেজী উপন্যাস পর্যন্ত—ধরুন লরেন্স কিংবা জয়েস-এর বই, অনেক রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর দরজা আটকে সাবধান হয়ে পড়তে হয়—তখন এক-আধটা চুরুটও খুব ভয়ে-ভয়ে টানি—তারপর ঘুমোবার আগে সমস্ত ছাই, দেশলাই কাঠি, ঝেড়ে সাফ করে, চুরুটের টুকরা কলাবাগানের দিকে বুনো ওলের ঝোপের দিকে ফেলে দিয়ে, বইগুলো বাক্সে তালা মেরে এঁটে, তবে এসে বিছানায় শুই। বলুন এ জীবন কী খুব কাম্য ?'

অভয়—'চুরুট কিনি কি করে জানেন ?'

—'কী করে ?'

—'নিজে গিয়ে কোনো দোকান থেকে কিনতে ভরসা পাই না।'

—'তবে ?'

'কাউকে দিয়ে কেনার সে ভরসা নেই—হয় তো গল্প করে বেড়াবে। শনিবার দিন ইস্কুল ভাঙবার পর ট্রেনে চড়ি তাই– প্রায় ষাট মাইল দূরে গিয়ে তবে চুরুট কিনে আনি। চুরুট, নস্যি, সিগারেট, প্রাণ ভরে পান খাই, জ্যোৎস্নায় নদীর পারে বেড়াই। ইস্কুল নেই, দপ্তরি নেই, ছেলেরা নেই, হেডমাস্টার নেই, স্টাফ নেই, গুপ্তচর নেই। সামনে যতদূর চোখ যায় মাঠ আর নদী, ধানের ক্ষেত, বুনো ঝাউ-এর ভিচে-ভিচে জ্যোৎস্না—এমন অপরূপ লাগে আমার—'

—'যাক, তবু পঁয়তাল্লিস টাকা মাইনে আপনার সম্বল ছিল–'

—'হ্যাঁ, এইটুকু আছে।'

—'আর বিয়েও আপনি করেন নি।'

অভয় চুপ করে রইলেন।

—'করবেন না ?'

কোনো উত্তর দিলেন না তিনি।

বেচারির হৃদয়ের আর-এক জায়গায় হয় তো আঘাত দিয়েছি।

বৃষ্টি আরো সর্বগ্রাসী হয়ে উঠল।

অভয়—'রাত কটা বাজে ?'

—'নটা আন্দাজ।'

—'বেশি রাতেও বাড়ি ফিরতে ভয় পাই।'

—'কেন ?'

—'আমার বাসার পাশেই এক জন মাস্টার থাকেন ; একটু রাত করে ফিরলেই তিনি কৈফিয়ত নিতে আসেন।'

—'কেন, কী দরকার তাঁর ?'

—'নিজে তিনি ইস্কুল থেকে এসেই শুয়ে পড়েন। রাত নটার সময় স্ত্রীকে খালাস করে দিয়ে হাতে আর-কোনো কাজ খুঁজে পান না—কাজেই এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরে বেড়ান।'

—'এই কি প্রথম পক্ষ ?'

—'যোগেশদার ? হাঁ, নটা পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে শুয়ে থাকেন ওটা তাঁর অভ্যাস। বার্ধক্যের দোষ নয়। বয়স বেশি নয় তো—উনত্রিশ।'

—'তা হলে সময় আছে।'

—'খুব—'

—'তবে এ-সব লোক তৃতীয় পক্ষের মুনাফা পাওয়া পর্যন্ত বাঁচবে কি না সন্দেহ।'

—'না, চেলাকাঠের মত বেশ শক্ত শরীর—। বাঁচবে।'

—'ছেলেপিলে কটি হয়েছে এ পর্যন্ত ?'

—'হচ্ছে, মরে যাচ্ছে—গুণবার অবকাশ পাই না। একবার যমজও হয়েছিল—'

—'বেঁচে আছে ?'

—'না।'

—'তবুও রক্ষা, না হলে এত ছেলেপিলে নিয়ে কী করত বেচারা ?'

—'লাইন করে তিন-চারটি এখনও মাস্টার বাঁচিয়ে রেখেছেন।'

—'যোগেশবাবুর মাইনে কত ?'

—'ত্রিশ টাকা। ঘরের সামনে লাউ, কুমড়ো, বেগুন, মরিচের ক্ষেত আছে—সকাল বেলা একটা টুইশন করেন—'

দু-জনেই চুপচাপ বসে ছিলাম।

অভয়—'এখানে কিছু দিন আগে একটা থিয়েটার এসেছিল জানেন ?'

—'হাঁ। কলকাতার থেকে। শুনেছি কয়েকজন আর্টিস্ট এসেছিলেন—যোগেশদা আর আরো আট-দশ জন মাস্টার দিনরাত সত্যাগ্রহ করে সেই থিয়েটারের সিটের সামনে চিৎ হয়ে পড়ে থাকতেন—'

—'তাই না কি?'

—'কাজেই সেই কলকাতার দলটাকে ফিরে যেতে হল–'

একটু চুপ থেকে অভয়—'আমাকেও শোবার জন্য বেঁধেছিলেন।'

—'তার পর?'

—'হেডমাস্টারও বলেছিলেন গিয়ে শুয়ে থাকতে।'

—'আপনিও শুয়েছিলেন?'

—'না, থিয়েটার পার্টি আমাকে ভারি সুন্দর নিস্তার দিলেন।'

—'কী রকম?'

—'সে-দিন সকাল থেকে আমার শোবার কথা, শুনলাম তার আগের দিন রাত্তিরেই নট-নটীরা চলে গেছেন।'

খানিকটা চুপচাপ।

অভয়—'বছর তিনেক আগে কলকাতায় একবার গিয়েছিলাম থিয়েটার দেখবার জন্যই।'

—'তার পর?'

—'কিন্তু এমনই দুর্দৈব যে সঙ্গে দু-জন মাস্টারও গেলেন।'

—'থিয়েটার দেখবার উদ্দেশ্যে?'

—'উদ্দেশ্য কিছু ভেঙে বলেন নি তাঁরা। কয়েকদিন চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গঙ্গার ঘাট, ইডেন-গার্ডেন ঘুরে বেড়ানো গেল। কার্নিভালেও গেলেন তাঁরা—গ্যাম্বলিং অবিশ্যি খেলেন নি, জয়রাইড-এও চড়েন নি। বায়স্কোপে এডুকেশনাল ফিল্ম কিছু হচ্ছে না কি জানবার জন্য গভীর ঔৎসুক্য দেখলাম তাঁদের, দেখা গেল এডুকেশনাল ফিল্ম কিছু নেই। কাজেই বায়স্কোপও দেখা হল না। থিয়েটার দেখবার প্রত্যেকেরই ইচ্ছা ছিল আমাদের, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কাউকে কিছু বলতে পারলাম না।'

—'থিয়েটারে যাবার কথা পাড়লেও সেটা অথরিটির কাছে যাবে, এই ভয়?'

—'হ্যাঁ। চাকরিও যাবে।'

—'পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আপনাদের দেখছি খুব গভীর।'

—'এক দিন এদের কাউকে না বলে-কয়েই নাট্যমন্দিরের দিকে গেলাম। কিন্তু গিয়ে দেখলাম দ্বিজেন মাস্টার বুকিং অফিসের থেকে হাত দশ-বার

দূরে অত্যন্ত পীড়িত সঙ্কুচিত হয়ে পায়চারি করছেন।'

—'টিকিট কেনেন নি?'

—'শুনুন। আমি পালিয়ে যাবার পথ খুঁজছি, দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল; নিস্তার নেই; দু-জনেই খানিকটা থতমত খেলাম—খানিকটা হি-হি করে হাসলাম, পাঞ্জা লড়লাম, দ্বিজেনবাবু আমাকে চা খাওয়াবেন বলে সাধলেন, আমি তাঁকে পান খাওয়াব বলে পয়সা বের করলাম, কাছেই একটা পানের দোকানে গিয়ে আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। তার পর ট্রামে চড়ে সটান মেসের দিকে যাত্রা!'

—'থিয়েটার আপনি দেখেন নি কোনোদিন?'

—'না। যখন কলেজে পড়তাম, টাকা-পয়সার অভাবে দেখতে পারি নি, ভাবতাম চাকরি করবার সময় দেখব।'

—'চাকরি তো থিয়েটারের দরজায় সত্যাগ্রহ করতে বলছে।'

অভয় খানিক ক্ষণ চুরুট টেনে—'এখানে একটা সিনেমা আছে জানেন?'

—'জানি বইকি—'

—'মাসে-মাসে বেশ ভাল ফিল্ম আসে শুনেছি—'

—'এডুকেশনাল?'

—'না-না নন-এডুকেশনাল—কিন্তু দেখবার জো নেই—'

—'ছেলেরা মাস্টারমশাইকে বায়স্কোপে যেতে দেখলে আর আস্ত রাখবে না।'

—'নাঃ! নিজে আমি যা নই ছেলেদের কাছে, টিচারদের কাছে নিজেকে সেই অস্বাভাবিক বিড়াল সাধক বলে যে দিনের চব্বিশ ঘণ্টা প্রমাণ করতে হয় এর চেয়ে কঠিন বিড়ম্বনা আর কি কিছু আছে শচীনবাবু?'

অভয় একটু চুপ থেকে—'সিনেমায় তো যেতেই পারি না—কোনো ছেলে যদি গিয়েছে এ অভিযোগ কানে আসে তা হলে তাকে দস্তুরমত শাস্তি দিতে হয়।'

—'ওঃ।'

—'নিজের বিশ্বাস ও বিবেককে এ-রকম উল্টো গাধার পিঠে চড়িয়ে পদে-পদে এ-রকম অসত্যের খেলা খেলে কতদিন কাটাতে পারা যায়, বলুন।'

—'বিনে পয়সায় তো খেলছেন না, পঁয়তাল্লিশ টাকা করে পুরস্কার পাচ্ছেন

মাসে।'

—'বাস্তবিক। টাকার যে এত দাম কলেজে পড়বার সময় তা একেবারেই বুঝি নি।'

—'ক-বছর মাস্টারি করছেন?'

—'ছ-বছর। হেডমাস্টারের তোশামুদি করি। গভর্নিং বডির তোশামুদি করি। তাঁরা যাদের ঘৃণা করেন তাদের পোঁদে পিচকারি কাটি। জীবনে যা পাই নি, কিন্তু চেয়েছি, সত্য ও সুন্দর, পদে-পদে তার অপমান করি—'

—'আপনি নিজে একটা ইস্কুল খুললে পারেন?'

—'কী হবে তাতে?'

—'নতুন নিয়ম করবেন—'

—'নতুন নীতি তৈরি করতে বলেন?'

—'এই ধরুন—থিয়েটারের দরজায় আপনাদের ইস্কুলের মাস্টারদের সত্যাগ্রহ করে পড়ে থাকবার কোনো আবশ্যক হবে না।'

'এক-আধদিন তারা থিয়েটারে গেলেও পারে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিংবা সিনেমায়?'

—'সেটুকু স্বাধীনতা তাদের থাকবে। কারু বিরুদ্ধে কোনো তরফ থেকে কোনো নালিশ শুনতে যাবেন না; যে-যার ক্লাশে ঠিক মতন কাজ করছে কি না—ইস্কুলে কাজ সন্তোষজনক কি না এইটুকু নিজের বুদ্ধি বিচার দিয়ে দেখে নেবেন।'

—'তারপর?'

—'তারপর ঘরে বসে কেউ যদি চুরুট টানে, কিংবা বোদলেয়ার পড়ে, অথবা যোগেশবাবুর মতন প্রথম রাতটা স্ত্রীকে নিয়ে কাটিয়ে দেয়—তা দিক। এ-সব ব্যাপার নিয়ে তাদের নিন্দে করবার কোনো দরকার নেই। মানুষ পৃথিবীতে কতটুকুই-বা চায়? পায়-বা কতটুকু? কতক্ষণের জন্যই-বা পায়?'

—'কিন্তু এ-রকম ইস্কুল দু দিনও টিকবে না।'

—'তা টিকবে না জানি।'

—'কোনো টিচারই সিনেমায় যেতে চাইবে না। বোদলেয়ার বা ভিলোঁর নামও তারা শোনে নি। কর্তৃপক্ষের কাছে কার নামে কেউ কোনোদিন নালিশ

করতে পারবে না—এ-কথা শুনলে তাদের পেট ফুলে উঠবে। পঁয়তাল্লিশ টাকার বিনিময়ে যে কাজগুলোকে আমি অত্যন্ত অখাদ্য বলে বোধ করি—সেই মত কাজই তাদের অত্যন্ত প্রিয়—তারা ভালবেসে সে সব সম্পূর্ণ করে।'

—'আর ছেলেরাও এই জন্যই তাদের ভালবাসে বোধ করি!'

—'হাঁ—ছেলেদের না দিন-রাত ভয়ে-ভয়ে···। অনেক কথা বললাম আপনাকে; কাউকে বলবেন না। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু কোনো বিশ্বাস নেই—'

—'কী রকম?'

—'চাকরি তো কোনোদিন করেন নি—বুঝবেন না। কিন্তু ছ-বছর চাকরি করে বড্ড অমানুষ হয়ে গেছি—'

চুপ করে ছিলাম।

অভয়—'পোর্টের পাকা চাকরি থাকলে আমার রমেনের মত হত। কিন্তু দেশী লোকের কাছে চাকরি করতে-করতে মানুষ দাক্ষিণ্য, বিশ্বাস, প্রেম সমস্ত হারিয়ে বসে।'

মাথা হেঁট করে কুণ্ঠিত হয়ে হাসতে লাগল অভয়।

অভয়—'হৃদয় বলে কোনো জিনিশ নেই আমাদের।'

একটু গলা খাঁকরে—'সাহস বলেও কোনো জিনিশ নেই। বললামই তো অমানুষ আমরা—সব সময়ই ভয়, কে চাকরি খোয়ায় কী করে চাকরি বজায় থাকে।'

—'আমাকেও ভয় পাচ্ছেন-তাই?'

—'একেবারে যে নির্ভয় পাচ্ছি তাও তো বলতে পারি না। দেখলাম অন্ধকারের মধ্যে জানালার দিকে তাকিয়ে—এই তো আপনি অনেক দিন চাকরি না পেয়ে বসে আছেন। আমি সব কথা বলে ফেললাম আপনাদের কাছে—আপনি হয় তো হেডমাস্টারের কাছে লাগাবেন—'

—'হেডমাস্টার আমার কথা বিশ্বাস করবেন কেন?'

—'রং লাগিয়ে বললে বিশ্বাস করবেন বই কি। এক-এক জনের এমন আন্তরিকভাবে বলবার ক্ষমতা থাকে যে মানুষকে বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করতে হয়।'

—'তাকে বিশ্বাস করিয়ে আমার লাভ কী?'

—'আমার কাজ যাবে—'

—'এত সহজেই ?'

—'যখন যায় তখন কাছা খুলবার আগেই যায়—'

—'আপনার কাজ খেয়ে আমার কী সুবিধা ?'

—'আমার জায়গায় আপনি বহাল হলেই বুঝতে পারবেন—'

অভয় এই সব মনে করেন।

বললাম—'অনেক রাত হয়েছে, ভাত খাবেন আসুন—'

মাথা নেড়ে অভয়—'না, যোগেশদা একটা নাইটমেয়ারের মত বসে রয়েছে—যত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা যায় তত ভাল—'

—'তাড়াতাড়িই খাইয়ে দিচ্ছি—'

—'না, আর দেরি করব না। আমাকে ক্লাস টেনের ইংরেজি পড়াতে দিয়েছে। আপনাদের কাছে এসেছিলাম একখানা বইয়ের জন্য। আছে কি ?'

—'কী বই ?'

—'আমাকে পড়াতে দিয়েছে ল্যাম্ব—আমাদের স্কুল লাইব্রেরিতে তো ল্যাম্বের কিছুই নেই—'

—'ল্যাম্ব-এর 'এসেজ' এবার ম্যাট্রিকে পড়াতে দিয়েছে ? সে তো বড্ড শক্ত, ক্লাস টেনের পক্ষে।'

—'না 'এসে' নয়।'

—'তবে ?'

—'রোজামুণ্ড গ্রে।'

—'ওঃ—সেই ছোট্ট একটা নভেলের মত—'

—'এই বইটার সম্বন্ধে কোনো ক্রিটিসিজম কিংবা ল্যাম্ব-এর সম্বন্ধে কোনো বইটই আছে আপনার কাছে ?'

'একখানা 'এসে' অব্দি নেই ; কী বলব আপনাকে অভয়বাবু !'

—'যাক চললাম—কাউকে বলবেন না কিন্তু কিছু—'

—'আমার ডায়েরিতে লিখে রাখব শুধু ?'

—'না তাও লিখে রাখতে যাবেন না—কেন মিছেমিছি গরিবকে—'

—'অন্তত আপনার সম্বন্ধে একটা গল্প লিখব—'

—'আপনি ক্ষেপেছেন ? এদের কারো হাতে যদি পড়ে তা হলে আমার মাথা

আস্ত থাকবে না—'

—'এদের কারো হাতে পড়বে না—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে—'

অভয় হাতজোড় করে আমার কাছে এগিয়ে এসে—'আপনার পায়ে গড় হব ?'

—'কেন ?'

—'কেন মিছিমিছি আমার পিছনে লেগেছেন ?'

—'বসুন—'

—'না বসব না···আচ্ছা, বসছি—'

চোখাচোখি তাকিয়ে অভয়—'ঐ যে শনিবার দিন চুরুট কিনতে যাই সে কথা কাউকে বলবেন না—'

মাথা নেড়ে—'না, বলব না।'

—'আর ঐ থিয়েটার-সিনেমা সম্পর্কে কথাগুলো—ওগুলোও—'

—'বলব না কাউকে—'

—'ইস্কুলের কি'বা—সামাজিক নীতিধর্মের মতবিরুদ্ধ যে-কথাগুলো বলেছি, সে-সব নিয়েও লোকের কাছে গল্প করতে যাবেন না।'

মাথা নেড়ে—'না—'

—'রোজামুণ্ড গ্রে সম্বন্ধে কোনো বই আপনার কাছে নেই তা হলে ?'

—'না। কলকাতায় লিখে দিন না।'

—'বইয়ের দোকানে ?'

—'হ্যাঁ।'

—'পয়সা দিয়ে কিনবার মত সঙ্গতি আমার নেই—'

—'হেডমাস্টারকে বলুন না কেন স্কুল লাইব্রেরির জন্য কিনতে—'

—'তিনি বিরক্ত হবেন। অনধিকার চর্চা ভালবাসেন না তিনি। নিজে ভাল বুঝে একটা করবেনই। আমাদের চাইতে বিদ্যা তো তাঁর ঢের বেশি!'

—'শুনেছি অত্যন্ত সাধারণ বি-এ পাশ—তাও তিন বারে—'

জিভ কেটে অভয়—'ছি, আমাকে জড়াবেন না! একটা চুরুট দিন তো, চুরুটগুলো বেশ। অপ্রাসঙ্গিকতা ঢের হল। এর শাস্তি যদি পেতে হয় তা হলে সে আমারই পাপের শাস্তি—'

বিছানার থেকে একটা চুরুট কুড়িয়ে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে গেলেন অভয়।

খানিক গিয়ে ফিরে এসে—'থাক চুরুটটা নিন আপনি, হয় তো যোগেশবাবু আমার বাসায় এসে বসে রয়েছেন ; চুরুটটা তাঁর কাছ থেকে সরাতে গিয়ে জঙ্গলে ফেলে দিতে হবে। আপনার জিনিশ আপনার কাছেই থাক—'
চুরুটটা বিছানার উপর রেখে দিয়ে অভয়—'আপনার এমন একটা ভাল জিনিশ নিয়ে যাচ্ছিলাম আপনার মনেও তো গুমর থাকতে পারে। মিছেমিছি আপনার অপ্রীতিভাজন হয়েই বা কী লাভ ?'
—'রোজামুণ্ড গ্রে সম্বন্ধে কোনো বই নেই তা হলে ? আচ্ছা চললাম। আমার বাসায় দু-এক দিন গিয়ে চা খাবেন ; কী বলেন ? চা আর বিস্কুট।'

খাওয়া-দাওয়ার পর মশারি ফেলে ঘুমিয়ে ছিলাম—মনে হল অনেক দূরে মিশরের কোন এক প্রান্তরে চলে গেছি—সেখানে বড়-বড় দুটো প্রাসাদ—একটা প্রাসাদ আমার ; অন্ধকারে অপরূপ নীল বাতাস ভেসে আসছে, একসারি খেজুর গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঠেছে, বালির উপর দিয়ে এক পাল উট ধীরে-ধীরে চলে যাচ্ছে।
হঠাৎ অঞ্জলি এসে আমার সামনে দাঁড়াল, কোনো এক বিগত যুগের রানীর বেশে, বললাম—'বোস—'
—'না বসব না —'
—'কোথায় ছিলে এত ক্ষণ ?'
—'আমার যেখানে খুশি ছিলাম—'
—'কেন রাগ করেছ আমার উপর ?'
কোনো উত্তর দিল না
—'কী অপরাধ করেছি বলো ?'
নিস্তব্ধ।
পাথরের প্রাসাদ অন্ধকারের ভিতর থম-থম করছে, একটু চুপ থেকে, 'আমি মামলুকের কাছে যাই—'
—'মামলুক কে ?'
—'চেনো না ?'
—'কই না নাম তো শুনি নি—'

—'শোনো নি আবার? কতবার দেখেছ তাকে!'

—'দেখেছি? কোথায়? আমার তো মনে পড়ছে না—'

—'যাও যাও—আমার পোষা সিংহটা কোথায়?'

—'কী দরকার সেটাকে দিয়ে তোমার?'

—'বলো, সেটা কোথায়?'

দেখতে-দেখতে সিংহ এসে হাজির হল। কেমন বিভ্রান্ত হয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেলাম—তাকিয়ে দেখলাম, অন্ধকারে জ্যোৎস্নায় বাতাসে ডালপালার ভিতর দু-জনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—নারী আর তার অনুরক্ত সিংহ; বাদামি শরীর, কেশর ফুলে-ফুলে উঠছে। ডান দিকে তাকিয়ে দেখলাম, জানালার ভিতর দিয়ে সেই অবিরল খেজুরের সারি—তাদের দীর্ঘ নীলাভ ছড়ির ফাঁকের ভিতর থেকে চাঁদ এক-এক বার উঁকি দিচ্ছে। চাঁদ, হাতির দাঁতের ধূসর মূর্তির মত জ্যোৎস্না কেমন নীল, অনেক দূরে একটা পিরামিড, মর্মস্পর্শী অপরূপ বাতাস।

ধীরে-ধীরে একটা বর্শা তুলে নিলাম। সিঁড়ি বেয়ে আস্তে-আস্তে প্রাসাদ থেকে নেমে গেলাম। বালির উপর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে জ্যোৎস্নায় অন্ধকারে মামলুকের প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলাম।

কক্ষের থেকে কক্ষে ঘুরে কোথাও কাউকে দেখলাম না।

কোথাও কেউ নেই। না, নেই কোথাও কেউ। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড সবুজ মখমলের পর্দা সরে গেল; দেখলাম মেহগিনি কাঠের একটা টেবিলে খানিকটা ধূসর মেঘে ম্লান ও নরম পূর্ণিমার চাঁদের মতন একটা বাতি জ্বলছে—পাশেই মামলুক বসে আর তার স্ত্রী।

এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'অঞ্জলি কোথায়?'

—'জানি না—'

—'সে-সিংহটাই বা কোথায় গেল?'

—'সে-সব খবর রাখি না আমরা কিছু।'

একটু চুপ থেকে—'মামলুকের স্ত্রী সেজে বসেছ কেন তুমি অঞ্জলি?'

অঞ্জলি হো-হো করে হেসে উঠল।

রুপার পিলসুজ যেন শ্বেতপাথরের বুকে ভেঙে পড়ে—বুকের সোনালি রঙের বাতিটা যায় নিভে, তাই এমনি আওয়াজ হয় তখন।

—'উঠে এসো অঞ্জলি!'

—'আমাকে তুমি অঞ্জলি মনে করো? তোমার?'

—'কী মামলুক—আমি কোনো ভুল করি নি তো; আমার স্ত্রী এখানে এসে বসেছে কেন?'

—'যাও যাও; আমরা এখন ঘুমোতে যাই; বিদায় নেবে?'

একটা গভীর ঠাণ্ডা বাতাসে সমস্ত অন্ধকার হয়ে গেল।

জেগে উঠে দেখলাম স্বপ্ন দেখছিলাম, সমস্ত গভীরে কেমন বিচিত্র আস্বাদ; এমন বিচিত্র স্বপ্ন বড় একটা দেখি নি তো।

এ স্বপ্নের মানেই বা কী?

কাকে জিজ্ঞেস করব?

এ স্বপ্ন নিয়ে অঞ্জলির সঙ্গে আলোচনা করব?

থাক।

একটা গাড়ির শব্দ—আস্তে-আস্তে সদর রাস্তায় সজনে গাছটার কাছে এসে থামল।

অঞ্জলি বায়স্কোপ থেকে ফিরে এল বুঝি?

আস্তে মশারির এক কিনার তুলে আকাশের দিকে তাকালাম: ছেঁড়া-ছেঁড়া শাদা-কালো মেঘ ইতস্তত উড়ছে, বৃষ্টি অনেক ক্ষণ হয় থেমে গেছে, একাদশীর চাঁদ আকাশে অনেকখানি উঠে গেছে. চাঁদের মুখ ঘিরে পাতলা ধূসর মেঘের একখানা ঢাকনি, সেই মামলুকের টেবিলের সবুজ বাতিটার মত···

মশারিটা ফেলে দিলাম।

বালিশে ধীরে-ধীরে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম।

খানিকটা সিগারেটের গন্ধ। অমল খাচ্ছে বোধ হয়—চারজোড়া লপেটার শব্দ—জামগাছের ঝুঁটি ধরে বাতাস চিড়-চিড় করে খানিকটা আনমনা বক-বক উড়ে চলে যাচ্ছে—তাদের করুণ অস্পষ্ট আওয়াজ—ঝিঁ-ঝিঁ-র ডাক—বৃষ্টির অভাবে আখখুটে ব্যাঙের চিৎকার, ঘরের ভিতর বাতাসে ভেসে আসা কয়েকটা জোনাকি।

—'আঃ টর্চটা নিভিয়ে ফেললে যে অমল ?'

—'কেন, বেশ জোৎস্নাই তো রয়েছে—'

—'না, এই জায়গাটা বড্ড অন্ধকার।'

—'আমি যদি টর্চ না আনতাম।'

—'আঃ জ্বালো না—'

—'অন্ধকারে কিসের এমন ভয়—আমি তো দিব্যি চোখ বুজে হেঁটে চলে যেতে পারি।'

—'এ-সব পথে বড় সাপখোপ থাকে।'

—'কামড়াবে ?'

—'কামড় দিয়ে ফেললে আর কী করব ? আবার নিভিয়ে ফেললে ?'

—'মরবার খুব ভয় বুঝি ?'

—'মরবার কী দরকার ভাই ?'

—'সিগারেটটা ফেলে দেই ; শচীনবাবু কী মনে করবেন ?'

—'আঃ। প্যাচ করে খানিকটা কাদা ছিটকে গেল যে ?'

—'কোথায় ? দেখি—'

—'থাক দেখতে হবে না তোমার—'

—'শাড়িটা নষ্ট হয় নি তো ?'

—'সে ঘরে গিয়ে বুঝব।'

—'আহা, আমার অপরাধে হল কি বৌদি ?'

—'না তোমার আর দোষ কী ঠাকুরপো—'

—'ঠাকুরপো আমাকে বোলো না।'

—'তবে ?'

—'অমল বললেই কাজ চলে যায়।'

—'আস্তে ; বাড়িসুদ্ধ মানুষ আছে, [কাণ্ডজ্ঞান] নেই বুঝি তোমার ?'

—'সকলেই তো —'

—'কই, অমল চলে যাচ্ছ না কি ?'

—'নাঃ, এই তেঁতুলের গাছের ছায়ায় একটু দাঁড়াই।'

—'এসো এ-দিকে—'

—'আমি আসব, না আমার [কাছে তুমি] আসবে ?'

—'তুমিই এসো—'

—'কতদূর যেতে হবে ?'

—'ঘরেই এসো না—'

—'ভেতরে ?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

দু জনেই অঞ্জলির ঘরের ভিতর ঢুকল।

অঞ্জলি—'এখন এক কাপ চা পেলে তোমার খুব ভাল লাগত, কী বলো অমল ?'

—'উপায় থাকলে তো আপনি দিতেনই ; সেই জেনেই তৃপ্তি।'

—'তুমি বসো, যদি আমি করে দিতে পারি—'

—'বসতে পারি কিন্তু চা খাবার জন্য নয়—'

—'তবে ?'

—'এমনিই—'

—'আহা গাড়ি ভাড়াটা তো দেওয়া হয় নি।'

—'গাড়োয়ান তাই বলে রাস্তায় বসে ঝিমুচ্ছে না।'

—'চলে গেছে ?'

—'এতক্ষণে মাটির সরায় আগুন নিয়ে বসেছে।'

—'আমার মাকড়িটা একটু খুলে দেবে অমল ?'

—'স্বচ্ছন্দে—'

—'অত আস্তে নয় ; আর একটু জোর দাও।'

খানিকটা নিস্তব্ধতা।

অঞ্জলি আস্তে হেসে—'হ্যাঁ হয়েছে—'

—'এই কানেরটাও ?'

—'নিশ্চয়ই ; তবে, এক কানের মাকড়ি খুলবে না কি শুধু ?'

—'মাকড়ি বলেন ? আমরা বলি দুল—'

—'যখন যা মুখে আসে ; আমরাও কি দুল বলি না অমল ?'

—'এই মকরমুখো দুল আপনাকে কে দিল ?'

—'মকরের মুখ দেখলে কোথায় তুমি ? আংটির মত তো—'

—'না, ঝুমকোর মত—'

—'যাই বল ; আমাকে মানায় নি ?'

—'খুব। আমার ইচ্ছে করে কি জানেন আপনার ঐ কানে দুটো অপরাজিতা ঝুলিয়ে দি—'

—'অপরাজিতা ?'

—'চমৎকার দেখাবে আপনাকে—'

—'কিন্তু অপরাজিতা তো দু মুহূর্তেই শুকিয়ে যাবে অমল।'

—'যাক, সে তার কাজ করে যাবে : মানুষের রূপকে তো দুই মুহূর্তের জন্য উপলব্ধি করতে হয় শুধু—'

—'মোটে দুই মুহূর্তের জন্য ?'

—'তা ছাড়া আর কী ; যারা চব্বিশ ঘণ্টা রূপের দিকে তাকিয়ে থাকতে চায় তারা বড্ড স্থূল—'

—'শুধু দু-মুহূর্তের জনা আমাদের রূপ ?'

—'রূপ নিয়ে আপনারা অনন্ত মুহূর্তই থাকুন না কেন ; আমরা দু মুহূর্তের জন্য শুধু দেখে চোখ বুজে চলে যাব।—তারপর আমাদের ধ্যানের সময়—'

—'ওঃ, সেই কথা !'

—'বাসি অপরাজিতা ফেলে দিয়ে তাজা দুটো অপরাজিতা তুলে পরবেন। কিংবা কুরচি, ছোট্ট দুটো তোড়া দু-কানে দোলাবেন—কিংবা জাপানি চেরি যদি ভাল লাগে—কিংবা দালিয়া, ক্রিসেনথিমাম, যা খুশি পরুন গিয়ে। আমাদের কাজ অনেক আগে হয়ে গেছে ; যত আভরণে নিজেকে আজন্ম সাজাতে পারেন, দু-মুহূর্তেই আমরা সাজিয়ে শেষ করেছি ; তারপর নিরাভরণ স্বপ্ন নিয়ে আমাদের পুরুষদের নিস্তব্ধ রহস্যের দিনগুলো চলে—'

—'খুব আনন্দে ? আমার মাকড়ি দুটো রাখলে কোথায় ?'

—'এই তো বিছানার উপর—'

—'আচ্ছা বেশ, আমি ভাবলাম মাটিতে পড়ে গেল না কি কোথাও।'

অমল কোনো জবাব দিল না।

—'বললে মকরমুখো ?'

—'কিচ্ছু বলি নি—'

—'মাকড়ি দুটো জেঠিমা আমাকে দিয়েছিলেন—' অঞ্জলি বললে—'আমার বিয়ের সময়। ক ভরি সোনা এর ভেতর আছে বলতে পারো?'

—'আমার কোনো আন্দাজ নেই।'

—'বাঃ, হাতে তুলেই দেখ না—'

—'তুলে কী হবে—আমি বুঝতে পারব না—'

—'এই তোমার ডাক্তারি?'

—'আমাদের সোনা-রুপো নিয়ে কারবার নয় তো—'

—'বড় লোকের ছেলে, সোনা-রুপোর কোনো খবর রাখো না?'

—'এখানে দেখলাম পুকুরের কোল ঘেঁষে একেবারে জলের কাছাকাছি দলঘাসের ভিতর এক রকম নীল ফুল ফোটে।'

—'ফুল নিয়েই আছ তুমি শুধু।'

'সেগুলোকে কী ফুল বলে অঞ্জলি বৌদি?'

—'জানি না।'

—'খুব ছোট্ট—খুব নীল—বলতে পারো না?'

—'না।'

—'আচ্ছা টেনিসনের 'ব্রুক' কবিতাটা পড়েছেন?'

—'পড়েছি—'

—'ফরগেট মি নট'-এর উল্লেখ আছে মনে পড়ে? আচ্ছা ওগুলোই কি 'ফরগেট মি নট'?'

—'আমি বুঝেছি তুমি থার্ড এম-বি কী করে ফেল করলে—'

—'না। শুনুন ওগুলো 'ফরগেট মি নট' কি না—'

—'পাগল, সেগুলো হল বিলেতের ফুল—'

—'আমাদের বাংলাদেশে হয় না?'

—'কী করে হবে?'

—'পুকুরের কোণে দলঘাসের ভিতর এ-ফুলগুলো তা হলে কী?'

—'কোনো আগাছার ফুল হবে নিশ্চয়ই—'

—'যাই হোক বড্ড সুন্দর, আপনি দেখেন নি?'

—'কে দেখতে যায় অত সব—'

—'গোটা দশেক সেই ফুল কুড়িয়ে পাঁচটা-পাঁচটা করে তোড়া বেঁধে আপনার কানে দুলিয়ে রাখলে বেশ হয় কিন্তু।'

—'এই মাকড়ি দুটো গড়তে পঁচিশ টাকা লেগেছিল', একটু চুপ থেকে অঞ্জলি, 'শুনলাম সোনার দাম এখন বেড়েছে—'

—'জানি না।'

—'আচ্ছা তা হলে এই গয়না দুটোর দাম ত্রিশ টাকা হয় না?'

—'হতে পারে—তিন শ টাকা দিয়েও তো কেউ কিনে নিতে পারে—'

—'কেন?'

—'হয় তো মনে ধরে গেল; আপনার কানে দুলছে—হয় তো মনে ধরে গেল তার—আমাকে একটু জল দেবেন?'

—'এমনি জল খাবে—না মিষ্টি দিয়ে দেব?'

—'না, শুধু এক গ্লাস জল—'

—'কয়েকটা লেবুপাতা কচলে দেব?'

—'কী যে আজগুবি আপনার—'

—'জলের ভিতর সুন্দর গন্ধ হত—'

—'তেষ্টার সময় মানুষ সুন্দর গন্ধ চায়?'

—'চায় না? তা হলে সুগন্ধি সিরাপ খায় কেন?'

—'কিন্তু রকমফের জানে না যে-হাত সেই নারীহাতের সাধারণ খাঁটি জলের চেয়ে গভীর জিনিশ পৃথিবীতে আর কিছু নেই অঞ্জলি বৌদি।'

—'কল্পনা তোমার অনেক দিকেই খেলে দেখছি অমল—'

—'হ্যাঁ, কল্পনা মাত্র; জীবনের অভিজ্ঞতা আমার বড্ড কম।'

—'কম? তাই না কি?'

—'সেই জন্যই যেমন অবসাদ তেমনি আকাঙ্ক্ষা, তেমনি পরিতৃপ্তি, সবই চূড়ান্তে চলে যায় আমার—'

—'এ ঘরে কিন্তু একটা পাথরের গেলাস আছে শুধু অমল; তাতে জল দিলে হবে?'

—'কাঁসার গ্লাসের চেয়ে সে ঢের ভাল জিনিশ হবে অঞ্জলি, পাথরের গ্লাসটা কি শাদা?'

—'কালো'

অমল প্রীত হয়ে—'ঠিক এমন জিনিশটিই এই সময়ে চেয়েছিলাম অঞ্জলি বৌদি।'

—'গেলাসটা কিন্তু নোংরা হয়ে আছে।'

—'এঁটো? ধুয়ে নিন।'

জল গড়িয়ে এনে অঞ্জলি—'কয়েকটা নেবুপাতা কচলে দেই?'

—'আবার নেবুপাতা আনতে যাবেন বাইরে? আনুন। নারীত্বের পূর্ণ পরিচয়ে জিনিশটা নরম হয়ে উঠুক—'

—'বাইরে যাবার কোনো দরকার হবে না অমল—এই তো জানালা দিয়ে হাত বাড়ালেই নেবু পাতা পাওয়া যায়।'

—'যায় না কি?'

—'হ্যাঁ এখানে একটা দিব্যি গাছ রয়েছে—লেবুও ফলেছে ঢের—'

—'বেশ, তা হলে একটা লেবুই কেটে দিন—'

অঞ্জলি একটু চুপ থেকে—'দিতে তো আমার খুবই ভাল লাগে অমল—কিন্তু এ আমার শাশুড়ির গোনা লেবু—বুঝলে না—? একটা সামান্য লেবুর জন্য কেন তার মুখ ঝামটা সইতে যাব?'

—'ঠিক কথাই তো।'

—'আ হরি! লেবুপাতাগুলো না ধুয়েই কচলে ফেললাম।'

—'বেশ করেছেন; বৃষ্টির জলে যথেষ্ট স্টেরিলাইজড হয়ে আছে।'

—'আমার হাতও তো ধুই নি।'

—'চাইও না যে আপনি ধোন!'

—'আর এক খুরি দেব?'

—'দিন।'

—'লেবুপাতা কচলে?'

—'তা আর বলতে?'

—'একটু মিষ্টি পেলে হত?'

—'হাতের থেকেই যথেষ্ট মিষ্টি ঝরছে।'

তিন-চার খুরি খেল অমল।

—'আমার কপাল বড্ড ঘামে ভিজে গেছে।'

—'নিঃসঙ্কোচে আঁচল দিয়ে সমস্ত কপালটা মুছে নিন, শুভ্র ললাটে কোথাও

সিঁদুরের বাধাবিঘ্ন নেই—সিঁদুর নেই তো।'

—'আজ আর সিঁদুর পরি নি—'

—'আজকাল এ-জিনিশ কুমারীরা পরে; কয়েকদিন পরে বিধবারাও পরবে। আপনাদের না পরলেই ভাল।'

—'না সেজন্য নয়।'

একটু নিস্তব্ধতার পর অঞ্জলি—'আমার শাড়িতে কাদা লাগল কি না বুঝতে পারলাম না তো।'

—'আমি ভেবেছিলাম আমার ধুতি সাফ আছে কি না সেই কথা আগে জিজ্ঞাসা করবেন।'

অঞ্জলি একটু হেসে—'জিজ্ঞেস করি নি বুঝি? এখন অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাববে নারী কী রকম স্বার্থপর!'

—'কাল সকালে হয় তো ধুতিটা কেচে দেবার জন্য চেয়ে পাঠাবেন এই কথা ভাবতে-ভাবতে নারীর ক্ষমা ও প্রেমের মূর্তি হৃদয়ে নিয়ে ঘুমোব।'

—'যা হোক, নির্বিঘ্নে ঘুম হলেই ভাল।'

—'আশীর্বাদ করুন যেন ঘুমের ভিতর কোনো স্বপ্ন না দেখি।'

—'কেন, স্বপ্নের কী অপরাধ? সুন্দর স্বপ্নও তো আছে—'

—'কিন্তু তবুও স্বপ্ন তো বাস্তব নয়—'

—'যতক্ষণ দেখবে ততক্ষণ তো বাস্তব। ঘুম ভেঙে গেলে সংসারের পথে চলতে-চলতে লাখ টাকার বিনিময়েও এমন সুন্দর রূপান্তর খুঁজে পাবে না তো আর—'

অমল—'আশীর্বাদ করুন যেন আপনার শ্বশুরের মত সাদাসিধে ঘুমে সারাটা রাত কাটিয়ে দিতে পারি।'

—'ঠাট্টা কোরো না অমল—তাঁর ঘুমের মধ্যে ঢের বেদনা ও অভাবের জটিলতা রয়েছে। তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না।'

—'যাক্—আমার বাবা যে-রকম নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমান—সে রকম ঘুমোতে পারি যেন!'

—'তা ঘুমিও—'

—'হ্যাঁ, এই আশীর্বাদই করবেন।'

—'আশীর্বাদ শব্দটা খুব ভাল খুঁজে বের করেছ অমল—'

—'কেন, খাপ খায় না ?'

—'ভেবে দেখ তুমি—'

—'তা হলে—আকাঙ্ক্ষা করুন—'

—'তোমার টর্চটা একটু রেখে যাবে ?'

—'বিছানার উপর অনেক আগেই তো রেখে দিয়েছি।'

—'কারবাইডে আলো আছে তো ?'

—'তিন ঘণ্টার মত আছে।'

—'আমার শাড়িতে কোথায়-কোথায় কাদা লাগল তাই দেখব।'

—'দেখতে কতক্ষণ লাগবে আপনার ?'

—'তুমি বাড়ি চলে গেলে তবে তো দেখব।'

—'টর্চ আপনার কাছে রেখে চলে যেতে হবে ?'

—'হ্যাঁ, টর্চের আলোয় বেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়।'

—'আর অন্ধকারে আমাকে সাপ কামড়ালে আমিও অপরিষ্কার করে বুঝব না অঞ্জলি বৌদি।'

অঞ্জলি—'কাকে ?'

—'আপনাকে নয়—জীবনটাকেই।'

—'মিছেমিছি অভিমান করো কেন অমল ? জীবনটাকে যখন বুঝতে আরম্ভ করবে তখন আমার কথা মনেও থাকবে না তোমার।'

তেঁতুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে দেশলাই জ্বালাল, খানিকটা সিগারেটের গন্ধ, আস্তে-আস্তে চলে গেল।

দুপুরবেলা ঘুম আসছিল না—ঘুমোতে চেষ্টা করি, কিন্তু কী জানি কেন কোনোদিনও পারি না। শ্রাবণের আকাশ, তবুও বৃষ্টি ছিল না, বেশ খটখটে রোদ খানিকটা দূরে শুকনো অশ্বত্থের পাতা কদমের কেশর আর বেলের কুঁড়িতে ঘাস রয়েছে ছেয়ে। অনেক দিন পরে ফড়িং আর প্রজাপতি নেমে পড়েছে ; ঝি-ঝি প্রাণ খুলে ডাকছে ; কয়েকটা শালিখ আর দাঁড়কাক—একটি আগন্তুক বৌ-কথা-কও অশ্বত্থের নিবিড় ডালপালার ভিতর নিস্তব্ধে খুনসুটি করে ফিরছে : আবার যেন জ্যৈষ্ঠের দুপুর ফিরে এল।

তাকিয়ে দেখলাম একটা মোটর এসে থেমেছে; গাড়িটা হিলম্যান উইজার্ড বোধ করি; বেশ নতুন—বোধ হয় দু-তিন মাস হল কেনা হয়েছে—আমাদের এখানে থামল যে ?

এ কার মোটর ? খানিকটা পেট্রোলের ধোঁয়া উড়ল; গন্ধ পেলাম, এক হলকা গরম বাতাস প্রান্তরের থেকে বয়ে এল।

মোটর কার এখানে এসে থেমেছে; হয় তো পুলিশের নজর পড়েছে এ বাড়িটার ওপর; সুপারইনটেনডেন্ট এখনই হয় তো গাড়ি থেকে নামবেন; সার্চ করবেন ? না গ্রেপ্তার করবেন ? কাকে !

দেখলাম একজন বাঙালি বাবু নামলেন।

হয় তো পুলিশের কোনো কর্মচারী; কিংবা কনফিডেনশিয়াল অফিসার, হৃদয়টা কেমন বিরস হয়ে ওঠে, প্রজাপতি, ফড়িং অশ্বত্থের শুকনো পাতা—সমস্ত দুপুর নিরাসক্ত নারীর মত নিজের মনে খেলা করতে-করতে দূরের রৌদ্র কলরবের ভিতর মিলিয়ে যায়—আমাকে দিয়ে তাদের দরকার নেই যেন আর।

গরদের চাদর, গরদের পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম, হাতে ছড়ি, মুখে সিগারেট, পায়ে কেডস—ভদ্রলোকটি আমারই দিকে এগিয়ে এলেন।

দূর থেকে হাসিমুখে নমস্কারও জানালেন—প্রতিনমস্কার দিয়ে মৃদু হেসে বললাম—'আসুন'—ছাতিম গাছ অব্দি পৌঁছে—'কী হে, চুপচাপ বসে আছো যে—'

—'না ঘুমোবার জো নেই—'

—'কেন, ছারপোকায় কামড়ায় ?'

—'কে, চন্দ্রনাথ না কি ? তুমি এ সময় কোত্থেকে ভাই ?'

—'সত্যিই কি আমি চন্দ্রনাথ ?

—'সেই রকমই তো মনে হয়'

—'কত বছর পরে দেখা হল তোমার সঙ্গে ?'

—'আট বছর, না বেশি ?'

—'আচ্ছা এই ডেক চেয়ারটায় আমি বসি।'

—'বোসো, আমি বিছানায় উঠে বসছি।'

—'তোমার সঙ্গে যখন শেষ দেখা হয়েছিল তখন কি একটা খবরের কাগজের

স্টাফ ছিলে, না?'

—'হাঁ সে আজ—আট বছর তো নয়—দশ বছরের কথা হবে চন্দ্রনাথ—তার পর আর তোমায় দেখি নি বুঝি?'

—'না। ১৯২৫-এ কলকাতার ধর্মতলার মোড়ে তোমার সঙ্গে শেষ দেখা। মনে পড়েছে?'

—'হাঁ'

—'তুমি একটা বর্মা চুরুট ফুঁকছিলে—'

—'কী জানি'

—'বললে চুরুট ফুঁকতে-ফুঁকতে দাঁত টন-টন করে, রক্ত পড়ে, তবুও বদ-অভ্যাস ছাড়তে পারি না—'

—'হয় বলে থাকব; মনে নেই আমার; তবে দাঁতের জন্য চুরুট ছেড়ে দিতে হয়েছে আমাকে'

—'বলেছিলে বাংলার পলিটিকসে এ-বড় এক আশার জিনিশ এসেছে—দেশবন্ধু, দেখো, বছর তিন-চারের মধ্যে আমাদের নেশনের কত প্রেস্টিজ বেড়ে যাবে। জাপানের মত, টার্কির মত—'

—'হাঁ। সেই রকম সব ভাবতাম তখন; বড্ড ছেলেমানুষ ছিলাম—'

—'চায়ের দোকানে গেলে আমাকে নিয়ে—'

—'তা মনে আছে—'

—'ধর্মতলার মোড়ে একটা দোকান ছিল—'

—'হাঁ'

—'দোকানে ঢুকে কেবল দেশবন্ধু—আর অবিশ্রাম চুরুট আর চা।'

—'হাঁ, সে এক রকম দিন ছিল বটে।'

—'খবরের কাগজে লিডার লিখতে; হাঁ, কী লিডার লিখেছিলে সেদিন—দাঁড়াও আমি মনে করছি।'

—'সে বছর দশেক আগে কী লিখেছিলাম না-লিখেছিলাম আজ সেই কথা দিয়ে কী হবে চন্দ্রনাথ?'

—'হাঁ মনে পড়েছে; বালগঙ্গাধরের সম্বন্ধে লিখেছিলে—তাঁর মৃত্যুর তারিখ ছিল সেদিন। সে-লেখা তোমার আমি পড়েছিলাম—ইংরাজির ভুল ছিল না—কিন্তু বিচারের চেয়ে কল্পনার চাতুরি ছিল ঢের বেশি; নিজেকে ঢের

আত্মপ্রতারিত করেছিলে—'

—'সেই ১৯২৫-এই এ-সব বুঝেছিলে তুমি ?'

—'হ্যাঁ'

—'তা হলে তোমার মাথা বরাবরই বেশ ঠাণ্ডা চন্দ্রনাথ-'

—'আর একটা আর্টিকেল লিখেছিলে ভারতবর্ষের সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্যারালেলিজমকে নিয়ে--'

পকেটের থেকে সোনার সিগারেট কেস বের করে চন্দ্রনাথ -'লেখো নি ?'

—'লিখেছিলাম তো অনেক কিছুই।'

—'তার পর আজকাল ?'

—'সে খবরের কাগজ তো অনেক দিন হয় উঠে গেছে—'

—'চিত্তরঞ্জন মারা যাবার আগে ?'

—'না, মারা যাবার আগে নয়, কিন্তু আমি ১৯২৩-এই ছেড়ে দিয়ে এসেছি—'

—'কেন ছেড়ে দিলে ? টাকা দিত না ?'

—'টাকা না-দিত এমন নয়--'

—'তবে ?'

—'ভাল লাগছিল না আর; রাত্তির জেগে-জেগে, মেসে থেকে-থেকে শরীরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল -'

—'যা লিখতে বা প্রচার করতে সেই সব জিনিসে সম্পূর্ণ বিশ্বাসও ছিল না বোধ করি ?'

একটু হেসে--'সে-সব কথা এখন জিজ্ঞেস করছ কেন চন্দ্রনাথ ?'

—'ছিল বিশ্বাস ?'

—'আমরা যা ভালবাসি, বিশ্বাস করি, সে পথে চলবার অধিকার আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই আছে—'

—'অধিকার বোলো না—বলো শক্তি।'

—'শক্তিই তো অধিকার সৃষ্টি করে—'

—'একটা সিগারেট খাবে ?,

—'তোমার এই গোল্ডকেসটা তো ভারি সুন্দর—'

—'মন্ত্রীর মহারানী আমাকে দিয়েছিলেন—'

—'মন্ত্রীর মহারানী— ?'

—'হ্যাঁ, রাজপুতানা স্টেটের।'

—'ওঃ।'

—'দেখো নি ছবি তার ?'

—'মন্ত্রীর রানীর ? না তো।'

—'ইলাসট্রেটেড উইকলি রাখো না বুঝি ?'

—'নাঃ।'

—'স্টেটসম্যানও না ?'

—'নাঃ।'

—'বেশ সুন্দর দেখতে তিনি।'

—'রাজপুতনারী, দেখতে সুন্দর হবেই তো।'

—'আমাদের একজন বাঙালি আর্টিস্ট রানী ভানুমতীর ছবি এঁকেছে, দেখেছ ?'

—'ছাপিয়েছে ?'

'না, ছাপাবার জন্য তো নয়।'

—'তবে ?'

—'বিলেতে ইণ্ডিয়া-হাউসে পরিশোভন করছেন।'

—'ওয়াল পেইনটিং ?'

—'হাঁা, ফ্রেস্কো; বেশ চমৎকার ফ্রেস্কো; বাংলাদেশে এ-রকম রূপসী দেখা যায় না এপকার যদিও দেখা যায় ঢের; কই, সিগারেট নিলে না তো ?'

একটা তুলে নিলাম।

—'ফিটজেরাল্ডের কথা মনে পড়ে।'

—'কী কথা ?'

—'পটার্স আর ক্লে, পটুয়া আর তার কাদা; শেষ পর্যন্ত পটুয়াই বড় কাদা, কাদা মাত্র, কী বল শচীন ? সিগারেটটা জ্বালালে না ? দাঁড়াও আমি জ্বালিয়ে দিচ্ছি —'

লাইটার বার করল সে।

—'থাক পরে জ্বালানো যাবে।'

—'আচ্ছা, আমারটা আমি জ্বালিয়ে নি।'

লাইটারের আগুনে সিগারেটটা তার জ্বালিয়ে নিল চন্দ্রনাথ।

—'ফিটজেরাল্ডের বইখানা খুব ভাল, না ?'

—'রুবাইয়াতের কথা বলছ ?'

—'হ্যাঁ ; আমার মনে হয় ওমর নিজে যা লিখেছিলেন তার চেয়ে ঢের বেশি সুপার্ব ; আর দেশ-বিদেশে যে-সব অনুবাদ বেরিয়েছে, সে সবের চেয়ে অনেক বেশি মর্মান্তিক !'

চুপ করে ছিলাম—

—'ভিকটোরিয়ান যুগে এই একখানা বই, আর কোনো বই নেই।'

—'নেই ?'

—'ব্রাউনিং আগাগোড়া যা লিখেছেন সমস্ত ফাঁকি ; একদিন চোরাই চামড়া খসে যাবে, তার ভিতরের থেকে গাধা বেরিয়ে পড়বে।'

—'তোমার সিগারেটটা জ্বলে যাচ্ছে চন্দ্রনাথ ?'

—'প্রথম সিগারেটটা আমি আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেই, টানি না।'

—'কেন ?'

—'শখ।'

—'তার পর, সেই যে বিদায় নিলে এদ্দিন দেখা হল না যে ?'

—'ঠিক করেছিলাম ছেঁড়া চটিজুতো পায় দিয়ে আর-কারো সঙ্গে দেখা করব না—'

—'এই মোটরটা কার ?'

—'আমারই।'

—'হিলম্যান উইজার্ড ?'

—'না, হিলম্যান মিনস্ক।'

—'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিনেছ ?'

—'বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে আনিয়েছি।'

—'ছ-সাত হাজার খরচ লেগেছে বুঝি ?'

—'না, চোদ্দ-পনের হাজার—'

—'মোটর-এর ভেতর কে আছে ?'

—'সোফার।'

—'দেশের বাড়িতেই এই দশ বছর পরে এলে ?'

—'না, বছর পাঁচেক আগে একবার এসেছিলাম।'

—'কই দেখি নি তো।'

—'তোমাকেও আমি দেখি নি।'

—'হয় তো কলকাতায় ছিলাম আমি।'

—'কোথায় ছিলে, না-ছিলে, ইহলোকে না পরকালে, এক মুহূর্তের জন্যও মনে পড়ে নি আমার।'

—'কেন হুইস্কিতে অভিভূত হয়ে ছিলে ?'

—'চায়ের কোটেশান নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।'

একটু চুপ থেকে—'হিলম্যান মিনস্ক; তা তোমাদের সেই খড়ের ঘরেই আছো ?'

—'সেটা অনেক দিন হয় আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছি।'

—'এখন কোথায় থাকো ?'

—'রবার্টসন সাহেবের বাংলোতে।'

—'ওঃ, সেই বাড়িটায়; সাহেবের সঙ্গে ?'

—'রবার্টসন অনেক দিন হয় সেটা আমার কাছে বিক্রি করে বিলেতে চলে গেছেন।'

বিছানার থেকে দেশলাই কুড়িয়ে সিগারেটটা জ্বালিয়ে—'তা হলে দেশেও বাড়ি করলে একখানা ?'

—'হ্যাঁ, নৈনিতালে বাড়ি করার চেয়ে এ ঢের ভাল জিনিশ!'

—'কী রকম ?'

—'এখানে পথে-ঘাটে গোখরো ঘুরে বেড়াচ্ছে, খানিকট. দূরে বনের ভিতরে বাঘ, সন্ধ্যার সময় ভাটিয়াল গান শুনতে পাই, ম্যালেরিয়ায় দেশ গ্রাম উচ্ছন্ন যাচ্ছে দেখি, জে. এম. সেনগুপ্ত আর সুভাষ বোসের সুখের বাংলা কথা শুনে প্রাণ তৃপ্ত হয়, বাপ-মা ভাই-বোন রয়েছে সব। অন্ধকারে কদম গাছের ভিতর থেকে প্যাঁচা ডাকে, সারা রাত মাঠে-মাঠে শ্রাবনের জল আর ব্যাঙের কলরব; ঢের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় আমার। ভারী ভাল লাগে, নৈনিতালে আছে কয়েকটা হোটেল, ইডিয়েট পাহাড়ি আর ফেরিয়ালা, সে সবের ঢের হয়ে গেছে আমার।'

—'পথে-ঘাটের গোখরো সাপ ভাল লাগে কোন হিশেবে ?'

—'বেশ থ্রিল।'

—'মোটরে তো বেড়াও, থ্রিল উপভোগ করবার সুবিধে কোথায় তোমার চন্দ্রনাথ ?'

—'সেই পলাশগঞ্জের রাস্তা মনে আছে ?'

—'খুব'

—'এখান থেকে প্রায় ক্রোশ তিনেক, না শচীন ?'

—'ইস্কুলে পড়বার সময় কত দিন সেই রাস্তা দিয়ে বেড়াতাম আমরা দুজনে, তুমি গিয়েছ শিগগির সেখানে ?'

—'না'

—'আমি এখানে এসে অব্দি রোজ সন্ধ্যার সময় সেদিকে মোটর চালিয়ে নেই।'

—'একা-একা ?'

—'হ্যাঁ, একাই ভাল লাগে, ওধারে অশ্বত্থ, জাম, তেঁতুল, পলাশ কতগুলি আমের বন, বাবলা-শ্যাওড়ার জঙ্গল, ধানের ক্ষেত, পাটের ক্ষেত, মানুষ নেই, গরু নেই, গাছের পাতা খসে, বনমোরগ ডাকে, নদীর দিকে বুনো হাঁসের সাড়া পাওয়া যায়, ধানক্ষেতের এদিকে-সেদিকে কয়েকটা স্পাইগেট, গায়ে রেনকোট, হাতে বন্দুক, মোটরটা থামিয়ে নেমে পড়ি, কাঁচা রাস্তায় হাঁটতে থাকি।'

—'শিকার করবার জন্য ?'

—'না, এমনিই।'

ভস্মীভূত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে চন্দ্রনাথ—'রোজই হাঁটি, সেই স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে; জীবনে পরাজয় তত হয় নি, আত্মবিক্রয়ও তত করি নি, কিন্তু তবুও এমন দুঃখ পাই কেন ? আমাদের সেই ইস্কুলের আটচালাটা কোথায় গেল ? মাস্টারমশাইদের কাউকেও দেখি না। সে দিন দেখলাম নির্মলাদের ভিটের ওপর একটা কুকুর মরে আছে, রাজ্যের শকুন এসে পড়েছে; ভিটে উজাড় করে ঘাস, ভেরেণ্ডা, লজ্জাবতী লতা, তেলাকুচা আর ফণীমনসার জঙ্গল—। নির্মলার কোথায় বিয়ে হয়েছিল শচীন ?'

—'ক-দিন হল এখানে এসেছ ?'

—'দিন দশেক—'

—'নৈনিতাল থেকে ?'

—'না, নৈনিতাল অনেক দিন হয় ছেড়েছি। কলকাতায় ছিলাম।'

—'ব্যবসা করে অনেক টাকা করলে ?'

—'না। ব্যবসা আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

—'কেন ?'

—'খাঁটি দোকানদার আমি নই।'

—ব্যবসায় টাকা জমিয়েছ মন্দ না।'

—'সে আমার সৌভাগ্য।'

—'এখন কী করছ ?'

—'রেওয়া স্টেটে চাকরি করেছিলাম কিছু দিন।'

—'তার পর ?'

—'রাজপুতনায় একটা প্রফেসারি নিয়েছি।'

—'এখন তা হলে প্রফেসারি করবে ?'

—'বলতে পারি না. তোমার মা কোথায় ?'

—'ঘুমিয়েয়েছেন হয় তো।'

—'তাই ; না হলে আমাদের গলার আঁচ পেলে নিশ্চয়ই চলে আসতেন। সেই ইস্কুল ছুটির পর, মনে নেই শচীন ?—কতদিন তিনি আমাদের মোহনভোগ রেঁধে খাওয়াতেন, মোহনভোগ, লাল আটার রুটি, চিঁড়ে নারকোল আর গুড়, মাঝে-মাঝে দুধভাত আর চাঁপাকলা।—তুমি বিয়ে করেছ ?'

—'হ্যাঁ, তুমি কোথায়, তোমাকে নেমন্তন চিঠি দিতে পারি নি।'

—'স্ত্রীর শরীর ভালো ?'

—'আছে একরকম।'

—'ছেলেপিলে হয় নি ?'

—'একটি মেয়ে হয়েছিল।'

—'হয়েছিল, এখন আর নেই ?'

—'না ; দেড় বছর বয়সে মারা যায়।'

—'কিসে গেল ?'

—'শিশুরা অনেক অজুহাতেই এ পৃথিবী থেকে সরে যায় চন্দ্রনাথ।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

—'তোমার স্ত্রী হয় তো এ শোক উত্তরে উঠতে পারে নি, কী করেই-বা পারবেন? শেষ দিন পর্যন্ত রূপান্তরিত জীবন এ অনুভূতি নিয়ে ফিরতে হবে নারীদের। এই রকমই হয়। অনেক সময়ই হয় তো বিছানায় পড়ে থাকেন?'

আস্তে মাথা নাড়লাম। হ্যাঁ কি না বুঝে নিক যা হয় একটা চন্দ্রনাথ

—'একটা উপায় করলে হয় তো এ-বেদনা কমে।'

চন্দ্রনাথের দিকে তাকালাম।

—'তোমাদের দু-জনের মধ্যে আর-একটি সন্তান জন্ম নিক।'

একটু হেসে—'না।'

—'কেন?'

—'আমাদের কারুরই ইচ্ছে নেই।'

—'তোমার স্ত্রীরও না?'

—'না।'

খানিকটা চুপ থেকে চন্দ্রনাথ সিগারেট জ্বালাল, বললে—'নির্মলার ভালো বিয়ে হয়েছিল শচীন?'

—'কী জানি, আমি তখন এখানে ছিলাম না।'

—'তার পর আর-কোনো খোঁজ খবর পাও নি?'

—'না।'

—'তাই তো। সেদিন দেখলাম একটা কুকুর মরে আছে আর শকুন চরছে নির্মলাদের ভিটেতে।—আর তিনবছর আগে?'

সিগারেটে এক টান দিয়ে অনেক ক্ষণ মাথা হেঁট করে নিস্তব্ধ হয়ে রইল চন্দ্রনাথ। তার পর ধীরে-ধীরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, 'এক নিশ্বাসেই তিনটে বছর কেটে গেল না?'

—'এই রকমই তো যায়।'

—'সেই রকমই তো মনে হয়।'

—'এখন বিধাতাকে যদি বলি আর একটা নিশ্বাস ফেলব তুমি আমাকে তিন বছরের পৃথিবীতে নিয়ে যাও?'

অনেক ক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম আমরা।

ধীরে-ধীরে হিলম্যান উইজার্ড চলে গেল।

দু-তিন দিন পরে একদিন চন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনি সে মীরাট চলে গেছে।

শ্রাবণ মাস। অসংখ্য স্কুল-কলেজের গরমের ছুটি চলছে এখন, তাই ছেলেবেলার সকল বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, দেশের পথেই। কেউ গবমেণ্ট স্কুলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার, কেউ নেপালে প্রাইভেট টিউর, কেউ মফস্বল কলেজের সিনিয়র প্রফেসর অব ইকনমিক্স. কেউ লখনৌ ইউনিভার্সিটির হিস্ট্রির লেকচারার, এলাহাবাদেও ম্যাথমেটিকসের প্রফেসর। শ্রীবিলাস নাগপুরের একটা কলেজের লেকচারার।

বললাম—'লেকচারার ?'

—'বাতিটা একটু কমিয়ে দেবে শচীন।'

—'চোখে লাগে বুঝি ?'

—'হ্যাঁ, তা ছাড়া এই হ্যারিকেনের ম্যাড়মেড়ে আলো দেখলে আমার একদম মন খারাপ হয়ে যায়।'

—'বাতিটা একেবারে নিবিয়ে দেব ?'

—'তাই দাও, এবং একটা মোমবাতি কাছে রাখো, আছে মোম ?'

—'বাবার কাছে একটা আছে বোধ করি ; আমি নিয়ে আসছি।'

—'থাক, আনবার দরকার নেই এখন ; জানালা দিয়ে বেশ জ্যোৎস্না আসছে। যদি মেঘ করে, অন্ধকার হয়, আলোর দরকার বোধ করি, তখন না হয় নিয়েসো।'

—'আচ্ছা।'

বাতিটা আমি নিবিয়ে ফেললাম।

—'না, না, এই টেবিলে রেখো না শচীন—কেরোসিনের গ্যাসে সমস্ত ঘর ভরে যাবে। শিগগির বাইরে রেখে এসো।'

লণ্ঠনটা বারান্দায় রেখে এলাম।

শ্রীবিলাস—'তোমার এই ডেকচেয়ারে বড্ড ছারপোকা হে !'

—'তুমি এই বিছানায় বোসো না।'

—'চুরুটের ছাই আর দেশলায়ের কাঠিতে বিছানা যা ভরে রেখেছ।'

—'বেশ বিছানা গুটিয়ে দিচ্ছি, মাত্নরে বসবে ?'

—'আর চেয়ার নেই ?'

—'ছারপোকা সব চেয়ারেই।'

—'এই ডেকচেয়ারটা রিমডেল করো।'

—'ওটাকে একেবারে বিদায় দেব ভাবছি।'

—'দু টাকার ক্যানভাস কিনে এনে একটা মিস্ত্রি ডেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঠিক করতে পারবে।'

শ্রীবিলাস—'এসব হ্যারিকেনের দস্তুর অনেক দিন হয় আমি উঠিয়ে দিয়েছি।'

—'তোমার ওখানে ইলেকট্রিক আলো বুঝি ?'

—'নাঃ, ড্রয়িংরুমে একটা বেবি পেট্রোম্যাক্স থাকে, ডাইনিং রুমে আর একটা ; শোবার ঘরে গ্যাস ; পড়বার ঘরে ফিলিন্টেস।'

—'আচ্ছা দেখব।'

—'বেশ নীল রঙের কিনতে পাওয়া যায় বাজারে।'

—'হ্যাঁ।'

—'আমাদের নাগপুরের কথা বলছি, এখানে কী পাওয়া যায় আমি জানি না, ক্যানভ্যাস পাওয়া যায় ?'

—'যেতে পারে—'

—'আর এই কাঠের বার্নিশ ?'

—'রঙ লাগিয়ে নেওয়া যাবে।'

—'বার্নিশ নেই বুঝি ?'

—'এখানকার বাজারে, কী জানি দেখি নি তো কোনোদিন।'

—'আমি সব সময়ই বার্নিশ লাগাই এ-সব জিনিশে।'

—'ছারপোকা কামড়াচ্ছে না তো আর ?'

—'কামড়ালে নাচার : উপায় কিছু আছে ?'

—'একটা খবরের কাগজ পেতে বসতে পারো'

—'ভেলভেট দিয়ে মুড়ে দিলেও ছারপোকা মানবে ?'

—'তবুও খানিকটা রক্ষা পাওয়া যাবে ; দেব খবরের কাগজের দু-খানা শিট ?'

—'দাও।'

ভাল করে পেতে বসে শ্রীবিলাস—'প্রায় বছর দশেক পরে ক্যানভ্যাসের ডেক চেয়ারে বসলাম।'

—'তোমার ওখানে বেতের আর্মচেয়ার বুঝি?'

—'প্রায় পনের-ষোলটা মেহগিনির চেয়ার রয়েছে; কুড়ি-পঁচিশটে সোফা, ইজি-চেয়ারগুলো বেতেরই প্রায় সব—এর চেয়ার নেই যে তা নয়—তবে তাতে বসা হয়ে ওঠে না আমার; বসলেও ছারপোকার অস্তিত্ব অনুভব করি না।'

—'বেশ ঝরঝরে তো তোমার আসবাবপত্র।'

—'আমার স্ত্রীর সতর্কতায়ই এই রকম; অরুন্ধতী।'

—'স্ত্রীর নাম অরুন্ধতী বুঝি?'

—'আমি বদলে অরুণা করে নিয়েছি।'

—'বেশ।'

—'সুন্দর নয়? একেবারে ও. কে।'

—'নাগপুরে কাজ নিয়ে গেলে কবে?'

—'সে তো প্রায় ছ-সাত বছর হয়ে গেল। ছুটিতে এদিকে আসতাম না।'

—'তোমাকে তো দেখি না অনেকদিন শ্রীবিলাস?'

—'দেশে আমার আসা পড়ে না; মাঝে-মাঝে কলকাতা অব্দি আসি।'

—'কলকাতায় তো তোমাকে আমি দেখি না।'

—'কী করে দেখবে? আমি ফুটপাথে হেঁটে বেড়াই না তো।'

—'কোথাও যাও না বুঝি?'

—'যখন বেরোই মোটরেই যাই—'

—'ট্যাক্সিতে?'

—'প্রাইভেট কার আছে।'

—'তোমার নিজের?'

—'হ্যাঁ।'

—'ফোর্ড কিনেছ বুঝি একটা?'

শ্রীবিলাস মাথা নেড়ে—'না, অস্টিন।'

—'কলকাতাতে কোথায় থাকো?'

—'ঠিক নেই : ব্রিস্টল হোটেলে মাঝে-মাঝে গিয়ে থাকি, মাঝে মাঝে বালিগঞ্জে শ্বশুর মশায়ের সংসারে।'

—'আচ্ছা তুমি কি বিলেত গিয়েছিলে শ্রীবিলাস ?'

—'না তো।'

—'এখানকার পি-এইচ-ডি ডিগ্রি নিয়েছিলে ?'

শ্রীবিলাস মাথা নাড়ে—'না।'

—'নাগপুরে ছ-সাত বছর ধরে লেকচারার ?'

শ্রীবিলাস বাধা দিয়ে—

—'লেকচারার বলা উচিত নয় ; আমি সিনিয়ার গ্রেডে। আমাদের গ্রেড হচ্ছে ২৫০ টাকা থেকে ৭৫০ টাকা, তার পর এফিসিয়েন্সি বার, তার পর বার শ।'

—'বাঃ দিব্যি মাইনে তো।'

—'অনার্স পড়াই, এম-এ ক্লাসও পড়াই।'

—'ফার্স্ট ইয়ার পড়াও না ?'

শ্রীবিলাস একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে—'তাও পড়াতে হয়। মোটের মাথায় আমার স্ট্যাটাস লেকচারের নয়, প্রফেসরের।'

—'হয়তো চেয়ার শিগগিরই পাবে ?'

—'নাগপুর ইউনিভার্সিটির ?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী লাভ তাতে ?'

—'লাভ না হোক ; সম্মান আছে—'

—'এখন কী কম মর্যাদা আমার ? ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেটের মতন স্ট্যাটাস, ওখানে সকলেই আমাকে তেমনি খাতির করে।'

—'ডেপুটির মতন ?'

শ্রীবিলাস আত্মতৃপ্তির সঙ্গে মাথা নাড়ে।

বললাম—'একজন ডেপুটির আর কী গৌরব ; শেষ পর্যন্ত দেখতে গেলে সামান্য জিনিশ ; তার চেয়ে তুমি আছ ঢের ভাল ; শিক্ষাদীক্ষা ইউনিভার্সিটির সম্পর্কে ; বাঃ, বেশ জীবন তো তোমার !'

—'না পড়াশোনা অনেক দিন হয় ছেড়ে দিয়েছি—'

—'ছেড়ে দিয়েছ, তা হলে এত সব ক্লাস পড়াও কী করে?'

—'হ্যাট কোট টাই ঝুলিয়ে সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে ক্লাসে যাই, পিতৃপুরুষের কৃপায় লম্বা-চওড়া চেহারা ও ভাল গলায় চমকে দেবার মত কথা বলবার এলেম আছে; ছেলেরা ভাবে তাদের অর্ধেক কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমি ক্লাসে বসে-বসে সিগারেট ফুঁকলেই তারা খুশি।'

—'পড়াও না কিছু?'

—'হ্যাঁ, একটা এটাচি কেসে করে কয়েকখানা বই আর নোটের খাতা নিয়ে যাই; কোনো ক্লাসে গিয়ে গল্প করি শুধু; কোনো ক্লাসে মান্ধাতার আমলের লেখা নোট ডিকটেট করি; কোনো ক্লাসেই বা বই নেড়ে চেড়ে রিডিং পড়ে যাই—কিংবা হুমকি দিয়ে দু-চারটে বক্তৃতা দিয়ে আসি।'

—'ছেলেদের কাজ এগোয়?'

—'নিশ্চয়ই, আমাকে তারা বড় ভালোবাসে।'

আমার দিকে তাকিয়ে শ্রীবিলাস—'প্রফেসরের পড়ানোর ওপর নির্ভর করে পরীক্ষায় পাশ করব, এরকম আহাম্মক ছেলে কোনো ইউনিভার্সিটিতেই দুটি-চারটির বেশি নেই। তারা হয় তো আমার কুৎসা কাটে; কিন্তু অধিকাংশ ছেলেই আমার চেহারা, আমার বোলচাল, আমার কথাবার্তাকে ফার্স্ট ক্লাস কোচিং মনে করে আবিষ্ট হয়ে আছে।'

—'বিলেত যাবে?

—'কে, আমি? কী দরকার?'

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে শ্রীবিলাস, 'গেলেও ডিগ্রি আনতে যাব না অবিশ্যি, বেড়াতে যেতে পারি; ব্রাসেলস, প্যারিস, মন্টিকার্লো সমস্ত ফ্রেঞ্চ আর ইংলিশ রিভিয়েরা, লেক ডিস্ট্রিক্ট, সুইজারল্যাণ্ড আলপস, ভেনিশ ফ্লোরেন্স রোম।'

—'দেশে ফিরলে ক-বছর পরে?'

—'এই বছর পাঁচেক।'

—'ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন সবই তো এইখানে?'

—'এদের সঙ্গে আমার খাপ খায় না।'

—'খাওয়া-দাওয়ার সুবিধে হয় না?'

—'শুধু তাই নয়; এদের জীবন-ধারণ মতামত যুক্তি বিচার সমস্তই কেমন

যেন আণ্ডারডগিশ, বুঝলে শচীন, একেবারে নিরেট কোম্পানি। এমন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থেকে সাফার করছে এরা।'

—'ছুটি তোমার কত দিন?'

—'সাড়ে তিন মাস—দু-মাস তো নাগপুরেই কাটিয়ে এলাম।'

—ওঃ, ছুটির সময়টা ইউনিভার্সিটিতে বসে নিরিবিলি পড়াশোনা করলে বুঝি? কোনো থিসিস দেবে?'

—'ক্ষেপেছ বুঝি? ব্রিজ খেললাম, ক্লাব, ডিনার, টেনিস, বন্ধুবান্ধব মাঝে-মাঝে দু-চারটা সেক্স নভেল। তার পর আমার স্ত্রীটি। কয়েকটি পরকীয়া হল্লায় হুল্লোড়ে দুটো মাস যেন এক নিশ্বাসে কেটে গেল। কুলকার্নী বলে একজন ব্যারিস্টারের স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যখন খুব জমে উঠেছে আমার বৈধ পত্নী আমাকে দেশের কথা মনে করিয়ে দিলেন। এলাম ভাই তাই তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে।'

একটু চুপ করে থেকে শ্রীবিলাস—'কই, সিগারেট দেওয়া হল না তো তোমাকে।'

কেস বের করে নাক কুঁচকে হাসতে-হাসতে—'তুমি খাও তো? না?'

—'সিগারেট? দাও তো।'

—'বেশ, নাও তা হলে; একটা নিলে শুধু? আচ্ছা কেস বন্ধ করি এখন?'

—'করো।'

—'কতকগুলো টিনের মাংস এনেছিলাম; এরা কেউ খেল না, আমাকেও খেতে দিল না, পড়ে আছে; নিয়ে আসবে?'

—'আমি? কার জন্য আনব?'

—'তুমি নিজে খেতে পারো; তোমার বউ অবিশ্যি খাবে না?'

মাথা নেড়ে—'এই বর্ষায় কোনো জিনিশই পেটে সইছে না শ্রীবিলাস; বাজারের একটা সিঙ্গাড়া খেলেই অম্বল হয়; টিনের মাংস খাব কী করে।'

—'মিল্ক অফ মেগনেসিয়া খেয়ে দেখতে পারো।'

—'দেখা যাবে।'

—'এখানে থিয়েটার নেই?'

—'না। একটা সিনেমা হাউস আছে।'

—'দেখেছি। সেই নিরঞ্জন পাগলাটা চালাচ্ছে। একদিন আমাকে আর

গিন্নিকে সেধে নিয়ে বক্স-এর পাশ দিয়ে এল, সন্ধ্যার সময় নিজে এসে নিয়ে গেল, গেলাম, পাঁচ মিনিট বায়স্কোপ দেখিয়েই রিল ছিঁড়ে লোপাট, অবিশ্যি ছ-মিনিটের মধ্যেই মেরামত করে নিল আবার, কিন্তু আমরা রইলাম না আর—ইডিয়ট !'

শ্রীবিলাস জানলার দিকে তাকিয়ে—'এখানে কোনো ক্লাব টলাব নেই ?'

—'কী রকম ক্লাব চাও শ্রীবিলাস ?'

—'দু-একটা নমুনা বলো তো।'

—'কংগ্রেসের একটা ক্লাব আছে।'

—'ঠাট্টা ? ওসব কংগ্রেসের ক্লাবের খবর শুনতে চাই না আমি।'

—'শ্রীবিলাস, কী এক কোম্পানি, কোথায়, তা বলতে পারি না। তবে তাদের একটা ক্লাব আছে, মাস ছয়েক আগে জে. এম. সেনগুপ্ত এসেছিলেন।'

—'বেশ করেছিলেন।'

—'এই ক্লাবেই তাঁর আড্ডা ছিল।'

—'চুলোয় যাক, আর কী রকম ক্লাব আছে ?'

—'সাহিত্য পরিষদের একটা শাখা আছে।'

—'অবনক্সাস ! আর ?'

—'আর-একটা আছে কয়েকজন সাহিত্যিক মিলে।'

—'সাহিত্যিক তুমি কাদের বল ?'

—'অবিশ্যি বিশেষ কিছু সৃষ্টি করে নি এঁরা ; তবু দু-তিন খানা বই লিখেছে।'

—'কী বই ?'

—'কবিতার ; একজনে দু-খানা উপন্যাসও লিখেছে।'

—'তুমি মনে করো এই সব কবিতা [......] এর মতন ?'

—'না, তত উচ্চদরের হতে পারে নি।'

—'হিলডা ডুলিটল কিংবা সিটওয়েল যে-রকম কবিতা লিখেছে তা এরা কল্পনাও করতে পারে ?'

—'হয় তো নামও শোনে নি—'

—'আর উপন্যাস ? জয়েসের ইউলিসিস-এর মতন হবে ?'

—'দূর !'

—'কিংবা জয়েসের কোনো একখানা উপন্যাসের মতন ?'

—'না, না তা কী করে হয়।'

শ্রীবিলাস ভুরু কুঁচকে হাসতে-হাসতে—'রবিবাবু যখন নাগপুরে গিয়েছিলেন—'

—'[ ] তিনি নাগপুরেও গিয়েছিলেন নাকি ?'

—'তখনও আমি তাঁর বক্তৃতা শুনতে যাই নি।'

—'কেন ?'

—'অরুণা আমার পিঠের ঘামাচি মেরে দিচ্ছিল; এই জিনিশটাকেই বেশি মূল্যবান মনে হল তখন।'

—'কুলকার্নীর স্ত্রীটি তখনও বুঝি তোমার জীবনে আসে নি শ্রীবিলাস ?'

—'তারপর যখন টেনিস খেলবার জন্য নামলাম, শুনলাম রবিবাবুর বক্তৃতা তখনও শুরু হয় নি। আর রবিবাবুর বক্তৃতা! শরীর ঠিক রাখতে হবে তো ? টেনিস গ্রাউণ্ডে চলে গেলাম।'

আমার হাতের সিগারেটটা জ্বাললাম।

শ্রীবিলাস—'তবুও রবিবাবু সাহিত্যিক, কিন্তু তুমি যে জীবকটির কথা বলছ এরা হয় সোস্যালিস্ট না হয় অ্যানার্কিস্ট।'

—'কেন, এ রকম কথা তোমার মনে হয় কেন শ্রীবিলাস ?'

—'নইলে মফস্বলে থেকে কেউ কবিতা ছাপায়, উপন্যাস লেখে ?'

—'কেন টমাস হার্ডি তো লিখেছিলেন।'

—'কিন্তু টমাস হার্ডি মফস্বলে কোনো ক্লাব তৈরি করতে যান নি।'

—'ক্লাব সংঘ সমিতি এ-সব আধুনিক পৃথিবীর লক্ষণ।'

—'যাক, এ সব বাছুরের সমিতিতে গিয়ে আমার কোনো লাভ নেই! এদের আদর্শ হচ্ছে মম কিংবা শরৎ চাটুজ্যে। ক্যাসানোভার নামও শোনে নি—ইডিয়টস!'

আমার দিকে তাকিয়ে—'এখানে ঘোড়দৌড় হয় ?'

—'না।'

—'সময়টা কলকাতায় কাটালেই পারতাম।'

—'বেশ, মনশুনের রেস বলতে তো কলকাতায়।'

—'খবরের কাগজে দেখি চমৎকার অ্যাকসেপটান্স সব। আমি

যে-ঘোড়াটা ধরেছিলাম কাল, গিন্নিকেও বলেছি, আজকের কাগজে দেখলাম সেই ঘোড়া যারা ধরেছে দশ টাকার টোটে নশ পঁচাত্তর টাকা পেয়েছে।'

—'বাঃ বেশ তো।'

—'চমৎকার সারপ্রাইজ ; এবার ইচ্ছে ছিল ছুটিতে পুনায় যাই।'

—'পুনায় তো খুব রেস খেলা হয় ?'

—'গিন্নিকে কাল রাতেও বলেছিলাম এবার এথিকস একটা কিছু করবে।'

—'এথিকস ?'

'মার্টিমারের এথিকস নয়—স্যাণ্ডহার্স্ট প্লেটের এথিকস—একটা ঘোড়া—একটা বোমা।'

—'ঘোড়ার নামও এথিকস রাখে নাকি ?'

—'চায়নিজ সেইন্ট রাখে, নাইটিংগেল রাখে, মাই মিসটেক, রেয়ার ওয়াইন, লিসিডাস'

শ্রীবিলাস অনেকখানি ধোঁয়া ছেড়ে—'স্যাণ্ডহার্স্টের খেলায় হাজার-হাজার পান্টারের দফা ঠাণ্ডা হয়েছে কাল।'

—'পান্টার কাকে বলে ?'

জবাব না দিয়ে শ্রীবিলাস —'আবু হোসেনের অস্ট্রেলিয়ান ওয়েলার জিতল শেষে! অরুণাকে আমি দু-চারবার বলেছিলাম এথিকস কিন্তু আপসেট করতে পারবে।'

—'এখানে বসে বললে আর কী হবে ? পুনার মাঠে গিয়ে যদি এথিকসকে ব্যাক করতে শ্রীবিলাস।'

'—আজ না হয় কাল করব ; বুকমেকারদের ভারী ফুর্তি হয়েছে কাল।'

—'কেন ?'

—'দু-দুটো ফেভারিটকে কড়কে দিয়েছে এথিকস', নীরবে সিগারেট টানতে লাগলে শ্রীবিলাস।

আমিও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে—'এথিকস এই শব্দটা বললে দর্শন বিজ্ঞান মানুষের বোধ বিচার অনুশীলন সম্পর্কে কোনো কথাই মনে আসে না তোমার এখন আর ?'

শ্রীবিলাস মাথা নেড়ে—'না'

—'একটা ঘোড়াকে মনে হয় শুধু ?'

—'হ্যাঁ।'

—'এ ঘোড়াটাকে দেখেছিলে তুমি ?'

শ্রীবিলাস উত্তর দিলনা—

অবাক হয়ে ভাবছিলাম চাইনিজ সেইন্ট বলতে কনফুসিয়াসের কথা মনে হয় কি ওর ? কিংবা লিসিডাস বলতে মিলটনের কবিতার কথা ?'

শ্রীবিলাস—'কলকাতায় টার্ফ ক্লাবের মেম্বার হয়েছি আমি।'

—'নাগপুরে ঘোড়দৌড় হয় কেমন ?'

—'বিশেষ না। সেই একটা অভাব রয়ে গেছে। তুমি ডার্বির টিকেট কিনেছিলে ?'

—'না।'

—'ট্রান্সন্যাশন্যাল আইরিশ সুইপের টিকিট কিনছ না ? আমি তো বরাবর কিনে আসছি, এ গুলো আমার কমিটমেন্ট—পার্সেন্টেজ বা ইনকাম ট্যাক্স-এর মত। কিংবা লাইফ ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ামের মত। ভাগ্যবিধাতা, তার মানে দুর্ভাগ্যবিধাতাকে যেমন মাথা পেতে নিতে হয়, এ গুলোকেও তেমনি নিয়েছি—হয় তো একদিন দেখব দু-তিন লাখ পেয়ে গেছি।'

—'হ্যাঁ, ও দেশের অনেক জুতাবুরুশ মেথর ধাঙরড়াও পায় ; তুমি পাবে না কেন ?'

—'এখানে অফিসারদের ক্লাব নেই ?'

—'আছে, কেরানিদের একটা আছে।'

—'কী রকম কেরানি ?'

—'গবমেন্টের। পঁয়ত্রিশ থেকে একশ পঞ্চাশ অবদি।'

—'সেখানে তো যাওয়া চলে না।'

—'তবে ম্যাজিস্টেট, ডিস্ট্রিক্ট জাজ যে-ক্লাবে যান, সেখানে যাও না।'

—'যেতে হবে একদিন ; ব্রিজ খেলা হয় বুঝি ? স্টেক থাকে ?'

—'গিয়ে দেখলেই পারো।'

—'তুমি এখানে চুপচাপ বসে আছ, একটা ক্লাবের স্টুয়ার্ডও তো হলে পারতে।'

—'স্ট্যার্ড অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।'

—'বাঙালিকে করে না?'

—'আমার মত বাঙালিকে না।'

—'বড্ড ঠাণ্ডা বাতাস আসছে।'

—'একটা কম্বল দেই?'

—'আমার ওভারকোটটা, এই পাশের কোঠায় তোমার বাবার ঘর বুঝি—সেখানে ফেলে এসেছি। নিয়ে এস তো।'

আনলাম।

ওভারকোট আমার হাতের থেকে জড়িয়ে নিয়ে শ্রীবিলাস—'ঠাণ্ডা লেগে আমার সে-বার নিমোনিয়া হয়েছিল।'

—'নাগপুরে?'

'হঁ্যা, তারপর কানে কেমন পুঁজ জমল; নাকে-কানে কেমন সুড়-সুড় করে মাঝে-মাঝে বাগায়। আপাতত সেটা সেরে গেছে; কিন্তু চুলকুনিটা যায় না।'

—'ওঃ, নাক কান এমনিই চুলকায়—ময়লা জমলে।'

—'না হে না, কানে কম শুনতে আরম্ভ করেছি।'

—'ডাক্তার দেখিয়েছিলে?'

—'হঁ্যা, নাগপুরে আমার এক ফ্রেণ্ড আছে খাম্বারকার। লণ্ডনের এম-আর-সি-পি, ঢের দেখল টেখল তো, অনেক অষুধ-ফষুদ দিল, কলকাতায় এসেও স্পেশালিস্টদের দেখালাম, এই তো এ-বারও হাজারটি টাকা গসল, কিন্তু ডায়গোনোসিস কেউ করতে পারে না, অবশেষে এখন বললে যে এমনিই সেরে যাবে, আমি একবার বিলেতে গিয়ে দেখিয়ে আসব।'

—'নাক-কান সুড়-সুড় করে, এই তো শুধু?'

—'নাঃ, লণ্ডনের ডাক্তারদের দেখিয়ে আসা ভাল।'

—'তোমার স্ত্রীরও বুঝি এই মত?'

—'হঁ্যা দিদি আবার আমাকে একা ছেড়ে দিতে চান না, নিজেও সঙ্গে যাবেন।'

—'তোমার স্ত্রীকে তো আমি দেখলাম না শ্রীবিলাস।'

—'একদিনও দেখো নি?'

—'না।'

—'বেশ লম্বা চওড়া। মোটা, মোটা বলে কোনো লজ্জা নেই তার ; আমিও ডিসকারেজ করি না, দিনরাত কফি-চকোলেট-হর্লিক্স-ওভালটিন খাচ্ছে, এক-একটা টিন একদিনেই ফুরিয়ে যায়—ওমলেট, লুচি, কাটলেট নিজেই ভাজে নিজেই খায়, নানা রকম ফ্যাট খায়। টিনের মাংস খায়, কলা যা খেতে পারে তা তুমি যদি দেখতে! ফাউল রোস্ট দু-বেলায় তার জন্য দুটো চাই, দুটো আস্ত। তা ছাড়া মাটন আর বেকনের কাটলেট তো আছেই। খাচ্ছে, হজম করছে, মোটা হচ্ছে, হোক না, আমি ডিসকারেজ করি না, আই নেভার ড্যাশ এন ওল্ড ... '

—'তুমিও তো কম মোটা হও নি?'

—'ছ-বছর আগে আমাকে যারা দেখেছিল তারা তো চিনতেই পারে না'।

—'স্ত্রীটি তাহলে তোমার বেশ।'

—'প্লাম্প অ্যাণ্ড প্লেজাণ্ট।'

—'হ্যাঁ বেশ স্থূল!'

—'স্থূল মানে কী? কোর্স? নারীর পক্ষে কোর্স হওয়া তো চমৎকার। শরীরের এক-একটা জায়গা পিন কুশনের মত। চামড়া পালিশ নিচ? রক্ত-মাংসের কোথাও কোনো নোংরামি নেই—হাত-পায়ের বগলের নীচের লোমগুলো ভিট দিয়ে সাফ করে ফেলেছে, সমস্ত গায়ে ক্যালিফোর্নিয়ান পাপির গন্ধ, সমস্ত শরীরটা যেন মিশরের একটা মাঠের মত কোনো ফারাও পাট্টা নিয়েছিল, উর্বর শস্য সেখানে জন্মাতে পারে, কিন্তু'

সিগারেটটা মুখে তুলে নিল শ্রীবিলাস।

—'তোমার ছেলেপিলে নেই?'

—'না, কমপ্যাসনেট ম্যারেজ। কনট্রাসেপশনের পদ্ধতি আমাদের দুজনেরই খুব ভাল লাগে।'

—'গিন্নি এখানে এসেছেন—'

—'হ্যাঁ, এখানে এলে তার বড্ড বিপদ—একটা তো ভয়াবহ।'

—'কী রকম?'

—'সাইকেল নিয়ে এসেছেন ; কিন্তু এ যেমন আকাট দেশ—চাঁড়াল চোয়াড় সব চারদিকে—মেয়েদের সাইকেল চড়বার জো নেই।'

—'পলাশগঞ্জের দিকে গিয়ে চড়লে পারে।'

—'নাঃ, এ ঘেন্না ধরে গেছে!'

—'আর কটা দিন-বা ; এর পরে তো নাগপুরে চলে যাবে।'

—'হ্যাঁ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচব—'

—'পনর দিনের জন্য এত লটবহর এখানে আনলে, মোটর অব্দি?'

—'মোটরটাই তো কাজে লাগল শুধু ; সাইকেল, ক্যামেরা, টেনিসের সরঞ্জাম সমস্ত পচছে বসে-বসে।'

একটা সিগারেট বার করে শ্রীবিলাস—'নাগপুরে প্রফেসারদের সঙ্গে মিশে চমৎকার টেনিস খেলে অরুণা।'

—'বাঃ, টেনিসও খেলে বুঝি?'

—'মিক্সড ডাবলসে ওকে নেবার জন্য লোফালুফি।'

—'তা তোমার সঙ্গেই মিশে যায় বুঝি শেষ পর্যন্ত মিকসড ডাবলসে?'

—'আই ডোণ্ট কেয়ার। নাগপুরে কেউ-বা ওকে বেটি নাটহল বলে, কেউ বা কেউ-বা উইলস মুডি।'

'আর তোমাকে বুঝি বোরোট্রা বলে শ্রীবিলাস?'

ধীরে ধীরে মা এসে 'শ্রীবিলাস এসেছ বুঝি? থাক থাক, প্রণাম করতে হবে না, বসো।'

—'আপনিই-বা দাঁড়িয়ে থাকেন কেন?'

—'তাই তো, কিছু ক্ষণ ধরে যেন চেনা-চেনা গলা শুনছিলাম, ভাবলাম কে এল? তা তুমি শ্রীবিলাস! বাঃ, দিব্যি শরীর সেরেছে তো তোমার ; কোথায় আছ এখন?'

'নাগপুরে—'

—'নাগপুরে? সে তো অনেক দূর!'

—'[ ] সেই আমার ঘরবাড়ি এখন ; আপনাদের এ সব দেশকেই বিদেশ মনে হয়।'

—'অনেক দিন পরে তোমাকে দেখলাম শ্রীবিলাস।'

—'আর হয় তো জীবনে দেখবেন না।'

—'কেন শ্রীবিলাস?'

—'এমন হতচ্ছাড়া জায়গায় কেউ আসে ; গিন্নি আমার সাইকেল নিয়ে

এসেছে ; এখানকার এসব [ ] লোকদের জ্বালায় চড়বার জো নেই।'
—'তোমার বৌও এসেছে বুঝি ?'
—'হ্যাঁ।'
—'দেখি নি তো তাকে কোনো দিন।'
—'আমার চেয়ে মাথায় চার ইঞ্চি বেশি লম্বা হবে, একটু বেধড়ক মোটা, ওজন সাড়ে তিনশ পাউণ্ড প্রায়, গায়ের চামড়া কালই ছিল, পিয়ার্স ঘসে-ঘসে এখন চাইনিজ রেশমের মত হয়েছে—বাদামিও না, বেগুনিও না, তবে রেশমের মতই নরম, তেমনি পালিশ।'
—'একদিন গিয়ে দেখে আসব।'
—'তা যেতে পারেন ; কিন্তু প্রণাম না করলে অভিমান করে ফিরে আসবেন না, হয় তো প্রণাম করবে না আপনাকে ; হয় তো চিনতেই চাইবে না।'
মা একটু হেসে—'অসাক্ষাতে ঢের নিন্দা করছ তো তার।'
—'নিন্দে নয়, এগুলো তার গুণ।'
—'যাক্, একদিন গিয়ে আশীর্বাদ করে আসব।'
—'আশীর্বাদ তো করবেন ; মাথায় হাত দেবেন কী করে শুনি ?'
—'কেন ?'
—'ঘাড় টান করে দাঁড়ালে নাগাল পাবেন না, আপনি তো কোমরের নীচে পড়ে থাকবেন।'
মা চুপ করে রইলেন।'
—'আপনাকে দেখতে পেলেই সে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে।'
—'কেন ?'
—'ধান-দূর্বা নিয়ে যাবেন তো ?'
—'একটা কিছু নিয়েই যাব।'
—'মনসার কাছে ধুনোর গন্ধ যা আপনাদের, আমার তার কাছে ঠিক তেমনি।'
—'শুনলাম সাইকেলে চড়তে পারেন।'
—'টেনিসও খেলতে পারেন বটে।'
—'নাচ শিখিয়েছ ?'
—'বায়না ধরে উদয়শঙ্করকে দিয়ে শেখাতে ; কিন্তু আমার মত মানুষের

সাধ্যি কি তা ? নইলে পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স করি ? ছেলে নেই পিলে নেই, ওর মুখের দিকে তাকিয়েই তো, যাই বলুন মা, ভালোবাসার শেষ মাপকাঠি টাকা নয় কি ?'

—'শচীনের স্ত্রীকে নিয়ে আসি।'

—'কেন ?'

—'তুমি দেখবে।'

—'মাপ করবেন মা।'

—'কেন শ্রীবিলাস ? দেখবে না ?'

—'আমার স্ত্রীর নিষেধ আছে—'

—'কী রকম ?'

—'নাগপুরের কুলকার্নী বলে একজন ব্যারিস্টারের স্ত্রীর সঙ্গে খানিকটা মিশেছিলাম।'

আমি —'থাক শ্রীবিলাস।'

শ্রীবিলাস—'ঘনিষ্ঠতা যখন পাকাপাকি হল, আমার গিন্নি বললেন অবৈধ প্রণয় করছি, মিথ্যা বলে নি, সেই থেকে তার কাছে প্রতিজ্ঞা করে নিতে হয়েছে পরের স্ত্রীর মুখও দেখব না আর কোনোদিন।'

অন্ধকারের মধ্যে মাকে আর দেখা গেল না।

শ্রীবিলাস ওয়াটার-প্রুফ আঁটতে-আঁটতে বললে—'বাস্তবিক, এ আমার খুব আন্তরিক ক্ষোভ শচীন। নিজের ঘর ভাঙলে মানুষের কেমন লাগে! তবে, সে পরের ঘর ভাঙতে যায় কেন ? ওর স্ত্রীর পেটে যে-সন্তান এসেছে, তার মুখের দিকেই-বা বেচারা কুলকার্নী কী করে তাকাবে ? হয় তো ভ্রূণেই নষ্ট করে ফেলবে! না হয় আঁতুড়ে গলা টিপে মেরে ফেলবে! কী বলো ? পৃথিবীটা বাস্তবিকই বড় ভয়াবহ। জীবনের বিধাতা একজন নির্বোধ চামারের চেয়েও অক্ষম—অমানুষ।'

চলে গেল।

পরদিন দুপুরবেলা অঞ্জলি—'কাল তোমার কাছে কে এসেছিল ?'

—'কাল সন্ধ্যার সময় ? শ্রীবিলাস।'

—'কই, একে তো আর-কোনোদিন দেখি নি।'

—'এই পাঁচ বছর পরে দেশে ফিরেছে।'

—'কেন, এতদিন কোথায় ছিল ?'

—'নাগপুরে কাজ করে।'

—'কী করে ?'

—'প্রফেসার।'

—'প্রফেসার ? এ-রকম হ্যাট, টাই, ওভারকোট কি প্রফেসাররা পরে ?'

—'পরে না ? কটা প্রফেসার দেখেছ তুমি অঞ্জলি ?'

—'কেন, আমি তো বরাবর জানি তারা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর সিল্কের চাদর গায়ে দিয়ে ক্লাসে যান।'

—'নাঃ, শ্রীবিলাস খুব উঁচুদরের প্রফেসার।'

—'মাইনে কত ?'

—'এখন পাঁচশ পঞ্চাশ পাচ্ছে।'

—'তবে তো বেশ।'

—'বেশ বই কি—বললে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মত সম্মান পায়, আমি বললাম একটা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আর কতদূর কী মর্যাদা, তার চেয়ে তুমি ঢের ভাল আছ শ্রীবিলাস—শিক্ষাদীক্ষা ইউনিভার্সিটি কালচারের সম্পর্কে। যে কোনো ইনস্টিটিউশনে তোমার জীবন প্রণালীকে ঈর্ষা করতে পারবে।'

—'এর সঙ্গে তোমার আলাপ হল কোথায় ?'

—'আমরা একসঙ্গে যে পড়েছিলাম অঞ্জলি।'

—'কলেজে ?'

—'ইস্কুলেও, সে আজ প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের কথা। এখন যেখানে টেলিগ্রাফ অফিস পোস্ট অফিসের দালান কোঠা, সেখানে ভারি সুন্দর একটা খোলা মাঠ ছিল—আর তারই এক কিনারে এক সারি খড়ের ঘর। সেই ঘরগুলো কবে ভেঙে গেছে সব! সেই আমাদের ইস্কুল ছিল। সে সব কথা মনে হলে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে।'

—'কেন ?'

—'এই সেদিন চন্দ্রকান্ত বলেছিল, এক নিশ্বাসে কুড়িটা বছর কেটে গেল যেন; আবার একটা যদি নিশ্বাস ফেলি—তাহলে সেই বিশ বছর আগের পৃথিবীতে

চলে যাওয়া যাবে ? এই বলছিল সে। চোখ বুজে আমিও অনেক সময় এই কথাই ভাবি। হৃদয়ের এই অনুসন্ধান নিয়েই জীবনের যা একটু আনন্দ জমে ওঠে--জমে ওঠে যা একটু ঐকান্তিক বেদনা।

অঞ্জলি একটু চুপ থেকে—'এক সাথে ইস্কুলে পড়েছিলে, তিনি এত বড় হয়ে গেলেন ?'

—'কে শ্রীবিলাস ? হ্যাঁ খুব পয়মন্ত ছেলে।'

—'শুধু পরের দোষ দিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না ?'

—'আমারও শ্রীবিলাসের মত হতে হবে ?'

—'ইচ্ছা করলেই কি আর হতে পারবে ? পাঁচশ পঞ্চাশ টাকা মাইনে পান ; এতগুলো টাকা একসঙ্গে কোনোদিন চোখেও দেখেছ ?'

—'না-তা দেখি নি।'

—'উনি তো একমাসেই করেন, কিন্তু এক বছর বসেও এত কটি টাকা অর্জন করবার ক্ষমতা তোমার হবে কোনোদিন ?'

—'দেখি হয়তো ভবিষ্যতে।'

— থাক্, চুপ করো, যা পারবে না, মিছেমিছি সে-কথা বলে মন ফেনাবার মিথ্যা চেষ্টা করো কেন ? এতে নিজের হৃদয়ও আত্মগ্লানিতে ভরে উঠবে তোমার। অঞ্জলি চেয়ারে বসবে ভাবছিল, কিন্তু চেয়ারের হাতলের ওপর বসে রইল। বসলও না ঠিক, কেমন আন্তরিক ভাবে ঠেস দিয়ে রইল।

—'উনি কি বিলেত গিয়েছিলেন ?'

—'না।'

—'তোমার মতন এম এ পাশ শুধু ?'

—'হ্যাঁ।'

—'তবে ওর হল, তোমার হল না কেন ?'

— শ্রীবিলাস এম-এ-তে ফার্স্ট'ক্লাস পেয়েছিল।'

'তুমি ফার্স্ট'ক্লাস পেলে না কেন ?'

—'আমি তো এম-এ দেবই না ভেবেছিলাম বন্ধু-বান্ধবেরা ধরে বেঁধে—'

--'এ-রকম রুচিবিকার হল কেন তোমার ? ইস, নিজের জীবনটাকে এ-রকম করে নষ্ট করে দিতে হয়।'

—'কয়েক নম্বরের জন্য ফার্স্ট'ক্লাস পাই নি বোধ হয় দশ কি বার—'

—'ছি, মোটে! এই দশটা নম্বরের জন্য তোমাতে আর ওতে এতখানি তফাৎ?'

—'কিন্তু ফার্স্ট'ক্লাস পেলেও শ্রীবিলাসের মত সুস্বাস্থ্য আমার কোনো-দিনই হত না।'

—'কি করে বলো তুমি তা?'

—'শ্রীবিলাসের জলজ্যান্ত চেহারা, সে আত্মতৃপ্তিতে কথা বলে, জীবনের প্রতি অগাধ বিশ্বাস তার; আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকলের চেয়ে ঢের বেশি, কায়ক্লেশে যারা পথে-পথে ঘুরছে তাদের মাড়িয়ে চলতে শ্রীবিলাস খুব ভালবাসে, জীবনটাকে যারা মাংলার হাটে কিনে চেৎতলার হাটে চড়িয়ে বিকোতে পারে দিনে দু শ বার করে, তাদের সঙ্গে শ্রীবিলাসের খুব বন্ধুত্ব—বরাবরই এই রকম।'

—'এ-রকম মানুষ না হলে বেঁচে থেকে লাভই-বা কি! নিজের ভালই যদি মানুষ না বুঝল! একটা ছাগলও গেরস্তের ঘরে ঢুকে ধান-যব খেয়ে যাবার বুদ্ধি রাখে। কিন্তু এক-একজন মানুষ হয় ছাগলের চেয়েও অধম!'

একটা ভারী নিশ্বাস ফেলে জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে রইল অঞ্জলি। খানিকক্ষণ পরে আমার দিকে ফিরে—'দশটা নম্বর কম কী করে পেলেই-বা শুনি?'

—চসারের পেপার খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

—'এ-রকম হয় কেন? শ্রীবিলাসের তো হয় নি।'

—'সে তো বার বছর আগের কথা।'

—'হলই-বা! এ বার বছর সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো করলে, কিন্তু ভেবেছ ফুরিয়ে গেল! তা ফুরোয় না, কিন্তু সঙ্গে আর-একজন মানুষকে জোয়াল বইতে ডাকলে কোন হিসেবে, আমি অবাক হয়ে তাই ভাবছি।'

একটু চুপ থেকে—'কিন্তু তুমি তো বি-এ পড়ছ। পাশ করে।'

—'পড়বার জন্যই কি তোমার এখানে এসেছিলাম?'

—'কিন্তু পড়বার জন্য তোমার আগ্রহের তো কোনো অভাব নেই'

—'কুকুরের সাথে এঁটোচাটা যে ভিখিরির আর-কোনো উপায় নেই জেলে যাবার জন্যও তার আমার চেয়ে একটুও কম আগ্রহ? জেলে তবুও তার খানিকটা নিশ্চিন্ততা তৃপ্তি।'

—'মশারিকে তুমি যদি জেলের মত মনে করো।'

বাধা দিয়ে অঞ্জলি —'সংসারের লোক মনে করে ভালবেসে আমি তোমার কাছে এসেছি'—মাথানেড়ে একটু হেসে—'যা খুশি ভাবুক গিয়ে সত্য যা তা তো আমরা জানি। মনে করো বিয়ে করেছি, বৈধ পত্নী হয়েছি, সমস্ত বেদনার অন্তরালে প্রেম তো রয়েছে হৃদয়ে।'

—'কেই বা এ সব কথা মনে করতে যায় ?'

—প্রেম যদি থাকত তাহলে অনেক অভাব-বেদনাকে অন্যথা করতে পারতাম বটে, কিন্তু সংসারের লোকের চোখ তো আর বিধাতার মত অন্তর্যামী নয়, আমার এই নির্বিবাদ কায়ক্লেশকে তারা মনে করে ভালবাসার ঐকান্তিকতা, আমার এই সহিষ্ণুতাকে তারা প্রেম বলে ভুল করে।'

একটু হেসে -'তোমার হৃদয়ে প্রেমের ক্ষমতা আছে একথা যদি তারা ভাবে তাহলে তো তোমার গৌরব নষ্ট হয় না।'

—'কিন্তু তারা যা ভাবে তা ভুল।'

—'গৌরব বরং বাড়ে।'

—'কিন্তু তারা মিথ্যা কথা ভাবে।'

—'কেন, প্রেমের শক্তি তোমার নেই ?'

ধীরে-ধীরে আঁচল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে একটু চুপ করে থেকে অঞ্জলি —'হৃদয়ে প্রেমের ক্ষমতা সব মেয়েদেরই আছে, কিন্তু আমাদের মত কয়েকটি দুর্ভাগা নারীই পথ খুঁজে পায় না', এক-আধ মিনিট চুপ থেকে, 'কেনই-বা এমন জিজ্ঞেস করো তুমি ? তোমার চেয়ে কেউ কি বেশি ভাল করে জানে এ চারটা বছর সংসারের পথে কী রকম অন্ধের মত ঘুরছি আমি'

একটু চুপ থেকে হেসে—'আচ্ছা, আমি যদি বার নম্বর বেশি পেতাম !'

অঞ্জলি পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল, কোনো জবাব মিলল না।

—'ধরো শ্রীবিলাসের মত ডিগ্রি নিয়ে শ্রীবিলাসের মত চাকরি করতাম যদি ?'

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম।

অঞ্জলি ধীরে-ধীরে মুখ তুলে—'তা তো হয় নি; তোমার জীবনে সে-সব হবার নয় কোনদিন।'

—'কিন্তু হতেও তো পারত; যদি হত ?'

—'আমারও এমন ভবিতব্যতা যে যেখানে জীবনের দুঃখ ও আক্ষেপের শূন্যতা শুধু সেখানে আঁজলা হাতে করে এসে মাথা গুঁজবার জন্য হাজির

হলাম।'

জানালার দিকে তাকিয়ে বট অশ্বত্থের জঙ্গলের ওপারে অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চালিয়ে নিয়ে অঞ্জলি—'কেন, পথ কি আর ছিল না?'

আমি—'হয়তো ভবিষ্যতে শ্রীবিলাসের মতন আমারও কপাল খুলতে পারে।'

—'থাক্।'

—'খুলে যেতে পারে; বলতে পারা যায় না ভবিষ্যতে কার কখন কী হয়—'

আশা-হতাশায় মেশানো এক নিশ্বাস ফেললে নারীটি।

বললে—'ছি, আর দশটা নম্বর যদি বেশি পেতে!'

চুপ করে ছিলাম।

—'শ্রীবিলাসের মতন চাকরিও কি না পেতে পারতে তাহলে?'

—'হ্যাঁ, সৌভাগ্যের জোরে পেতেও পারতাম হয়তো!'

—'নিজেকে যতই অবিশ্বাস কর তুমি—আমি কি জানি না তোমার শক্তি রয়েছে?'

—'তোমার মুখে এ-রকম কথা শুনলে বড় আশ্বাস পাই অঞ্জলি' কেমন ছেঁদো কথার মত শোনালো আমার মুখের কথা। প্রাণের থেকে তো বলি নি। কিন্তু নারীটি অভিনয় করল না।

বললে—'তাহলে আমাদের সংসার কত সুখের হত বলো, তো দেখি?'

—'তা তো ঠিকই।'

—'জীবনকে অন্ধ বলে অশ্রদ্ধা করবার কোনো প্রয়োজনও হত কি?'

—'না, তা কী করে হত?'

ধীরে-ধীরে আমার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে অঞ্জলি—'এই যে অনেক সময় তোমাকে ব্যথা দিয়ে কথা বলি, সেই সবেরও কোনো দরকার হত না।'

একটা নিশ্বাস ফেলে সে বললে—'নারীত্ব প্রেম (জীবনের) সমস্ত (গভীর) জিনিশই যেন টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলতে পারা যায় এমনই একটা দীনতা থাকে মনের ভেতর; আমার মনে হয় নিঃসম্বল সংসারের প্রত্যেক বধূর জীবনেই এরকম জীর্ণতা থেকে থেকে উঁকি দিয়ে যায়। যায় না?' এই রকম বর্ণবিচিত্র পুতুলের মত কথা বলে যেতে লাগল সে। কিন্তু একটা কথাও কলের মত নয়, নারীর সার্বভৌম আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার ঐকান্তিক উক্তি।

প্রেম তার খাদ্য নয়, ঘৃণাও নয়; খাদ্য তার সুব্যবস্থিত সুন্দর সংসার; এই সোনার সিঁড়িতে সে অনন্ত কাল হাঁটতে পারে—একটি অজ্ঞান নির্বোধ পুরুষকে সঙ্গী করেও।

—'শ্রীবিলাসকে দেখলাম কাল।'

—'দেখেছিলে বুঝি!'

—'হ্যাঁ।'

—'কী করে?'

—'বেড়ার ফাঁক দিয়ে।'

—'ওঃ, তুমি বেড়ার পেছনে দাঁড়িয়েছিলে?'

—'মানুষের মতন দেখতে বটে।'

—'কে? শ্রীবিলাস? বাংলার বাইরে বাঙালির চেহারার গর্ব বজায় রেখেছে। এদের প্রতিনিধিত্বে আমাদের গৌরব মারা যাবে না।'

—'দেখলাম সাহেবি পোশাক পরে এসেছেন।'

—'হ্যাঁ, তসরের স্যুট পরে এসেছেন।'

—'বেশ মানাচ্ছিল।'

—'সব স্যুটেই ওকে মানায়।'

—'মানাবে না—পুরুষমানুষ বটে তো।'

—'হ্যাঁ, প্রায় সাড়ে চার হাত লম্বা, শরীরও আজকাল আগের চেয়ে ঢের সেরেছে।'

—'মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে ভাবি একটা টাইও কি তুমি বাঁধতে পার?'

—'কে আমি? বাঁধি নি অবিশ্যি কোনোদিন।'

—'কোনোদিনই না?'

—'না।'

—'যখন সেই নিউজ পেপারে কাজ করতে?'

—'ধুতি-চাদর পরে যেতাম।'

—সাহেবি পোশাক পরবে ইচ্ছা হয় নি কোনোদিন?'

—'সে ইচ্ছে যে কত হাস্যাস্পদ নিজেই স্থির ভাবে চিন্তা করে অনেকবার বুঝেছি তা।'

—'কেন স্যুট কিনবার পয়সা কুলোয় নি?'

—'না, তাই শুধু নয়।'

—'তবে?'

—'সাহেবি পোশাকে আমাকে একেবারেই মানায় না অঞ্জলি—' একটু চুপ থেকে—'হয় তো ফ্লোরিডার নিগ্রোদের মত দেখাবে।'

বলেছিলাম একটু মজা করে, কিন্তু শুনে আঘাত পেল; দেখলাম মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে অঞ্জলির।

একটা ঢোক গিলে—'কেন রং তো তোমার কালো নয়।'

—'না, কালো বিশেষ নয়।'

—'তবে, নিগ্রোদের সঙ্গে নিজের তুলনা দাও কেন?'

—'না তুলনা নয়, একটু আমোদ করে বলেছিলাম।'

—'এ-রকম আমোদ করতে যেও না, নিজেকে নিগ্রো-কান্তি বললে আমার কী রকম খারাপ লাগে বোঝ না কি তুমি?'

মুখের মৃদু হাসি ধীরে-ধীরে গুটিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইলাম।

অঞ্জলি—'স্যুট কিনবার পয়সা যদি থাকত, তা হলে স্যুটের মত স্যুট পরলে তোমাকেও খাপছাড়া দেখাত না; ঠিকই মানাত।'

খানিক ক্ষণ পরে আমার দিকে তাকিয়ে—'চুপ করে রইলে যে!'

—'আসল কথা, ইচ্ছে করে না আমার এই সব পরতে।'

—'সে হলে আলাদা কথা।'

একটু চুপ থেকে বললে—'কিন্তু দরকার হলে পরতে হবে তো!'

—'তা তখন পরব বই-কি।'

—'টাই বাঁধা শিখে নিও।'

—'আচ্ছা।'

—'একটা তসরের স্যুট কেনো, বেশ দেখাবে।'

মাথা নেড়ে—'কিনব।'

—'আর কী ভালো স্যুট আছে?'

—'পামবিচের আছে—পপলিনের আছে—'

—'এই সবের থেকে বেছে-বেছে একটা কেনো, সোলার টুপি মাথায় দিও না, শ্রীবিলাস যে-রকম টুপি পরে এসেছিলেন সেই রকম টুপি পরো—'

—'ফেল্ট হ্যাট?'

—'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা!'

—'আমিও অনেক সময় ভাবি আমাদের বাঙালিদের পক্ষে ধুতি-চাদর ভাল—হ্যাঁ খালি গায়ে কাঁধে একটা চাদর ফেলে চলতে আমার সবচেয়ে পরিতৃপ্তি লাগে অঞ্জলি।'

অঞ্জলি চুপ করে ছিল।

বললাম—'চাদরটা না হয় সিল্কেরই হল; আমার বেশ ভাল লাগে কিন্তু অঞ্জলি।'

অঞ্জলি একটু হেসে—'হাতে একটা বাঁশের লাঠি থাকবে।'

—'মন্দ কি?'

—'বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভটচার্যির মত মন্ত্র আওড়ে বেড়াবে।'

—'না, ততটা দূর নয়।'

—'কেন?'

—'জীবনটাকে একেবারে জলে ফেলে দেই নি তো!'

—'এ কি জলে ফেলে দেওয়া হল নাকি?'

—'আমি তো তাই বলে মনে করি।'

শুনে ভরসা পেল অঞ্জলি।

বললে—'দেখ, খবরের কাগজে আবার কোনো চাকরি পাও না কি?'

—'তাই দেখব।'

—'গতবার কত মাইনে ছিল?'

—'পঞ্চাশ!'

—'এবার চল্লিশ পেলেও নিও।'

—'আচ্ছা।'

—'মোট কথা নিতেই হবে; এরকম লাঞ্ছনা নিয়ে আর আর-বেশিদিন চলে না।'

—'সবই তো বুঝি, আমি সব বুঝি।'

অঞ্জলির আঁচল খসে পড়ে ছিল, উঠিয়ে নিতে-নিতে বললে—'এমন কি পঁয়ত্রিশ টাকা—'

—'হ্যাঁ, তা পেলেও নেব।'

—'বাংলা কাগজে পেলেও ভাল হয়—তাই নিও।'

—'নিশ্চয়ই।'

—'বাংলা আর্টিকেল লিখতে আর কী?'

—'অবিশ্যি ইংরেজি আর্টিকেল লিখতেই সুবিধা পেতাম আমি।'

—'কিন্তু বাঙালির ছেলে বাংলা লিখতে কষ্ট হবে না তো কিছু।'

—'না, কষ্ট আর-কী হবে অঞ্জলি।'

—'নিও।'

—'কেউ যদি দয়া করে সে-কাজ দেয়, নেওয়ার জন্য আমি সব সময়ই প্রস্তুত।'

—'পঁয়ত্রিশের কম দেবে না?'

—'সেই রকমই তো মনে হয়।'

আমি—'কালীঘাটের দিকে একটা ঘরের আর কত ভাড়া হবে—সাত-আট টাকা?'

—'হ্যাঁ—ছ-সাত টাকায়ও পাওয়া যেতে পারে।'

—'বাস্, আর বাকি আটাশ-উনত্রিশ টাকা রইল; আমাদের দু-জনের বেশ চলে যাবে না তাতে?'

—'সে-রকম গিন্নির মতো চালালে কিছু বাঁচাতে পারবে হয় তো।'

—'আমার গিন্নিপনায় তোমার অবিশ্বাস আছে না কি আবার?'

দেখলাম অভিমান ভরে আমার দিকে তাকিয়েছে।

ধীরে-ধীরে অঞ্জলির মাথায় চুলে হাত বুলতে-বুলতে—'একবার চাকরি পেলে তুমি আমাকে অনেক পরিপূর্ণতা দেবে; সে কি জানি না আমি?' আঁচলের খুঁট দিয়ে ধীরে-ধীরে চোখদুটো মুছে নিয়ে আমার মুখের দিখে তাকিয়ে অঞ্জলি ইঙ্গিতপূর্ণভাবে একটু হাসল।

কীসের ইঙ্গিত?

অনেক কিছুরই হতে পারে। ঘাড় হেঁট করে ভাবছিলাম।

অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে দেখলাম শাড়ির কমলা পাড় তর্জনীতে জড়িয়ে-জড়িয়ে কী যেন ভাবছে, মুখের ভিতর অভিযোগ নেই আর, বেদনা নেই, কেমন একটা বিষণ্ণতা ফুটে বেরচ্ছে যেন, একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে—'শ্রীবিলাসের স্ত্রী টেনিশ খেলেন বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাই বলছিলেন শুনছিলাম।'

—'খেলবে তুমি ?'

—'কে আমি!'

—'র‍্যাকেট কিনে দিতে পারি।'

—'বড় দায় পড়ে গেছে আমার।'

—'কেন, মেয়েরা তো আজকাল অনেকেই খেলে।'

—'খেলুক গিয়ে ; কিন্তু আমার খেলতে গেলে জন্মান্তর নিতে হবে।'

—'না, এমন কিছু শক্ত জিনিশ নয়, একটা র‍্যাকেট হাতে নিয়ে।'

—'তুমি নিজেই (কি) খেলতে জান ?'

—'অভ্যাস করলে পারি।'

অঞ্জলি হো হো করে হেসে উঠল।

—'যখন কলেজে পড়তাম—'

—'একদিনও খেলো নি!'

—'খেলা দেখেছি অবিশ্যি ঢের ; মার্কাস স্কোয়ারে, উডবার্ন পার্কে।'

—'দেখেছ তো : কিন্তু নিজের হাতে একখানা র‍্যাকেট তুলে ধরেছ ?'

—'বেশ ভারী ; খেললে যে দস্তুর মতন একসারসাইজ হয় তা বেশ বোঝা যায়।'

অঞ্জলি একটু মুখ টিপে হেসে—'চিরকাল বই পড়েই গেলে—'

বলে একটু গম্ভীর হয়ে জানালার ভিতর দিয়ে দূর অস্পষ্টতার দিকে তাকাল।

আমার মুখের দিকে আবার তাকিয়ে—'দেখো তো একজন মেয়েমানুষ কেমন সুন্দর টেনিস খেলতে পারে। ভাল টেনিস খেলার জন্য সবাই নাকি তাকে নিয়ে লোফালুফি করে ?'

—'হ্যাঁ, মিক্সড ডাবলসে ?'

—'মিক্সড ডাবলস কাকে বলে ?'

—'একদিকে একজন পুরুষ ও একটি মহিলা, বিপক্ষে আর-একটি পুরুষ ও আর-একজন মহিলা।'

উপলব্ধি করে নিয়ে অঞ্জলি—'নাগপুরে শ্রীবিলাসের স্ত্রীকে কার সঙ্গে তুলনা

দেওয়া হয় যেন বললেন উনি ?'

—'বেটি নাটহল এর সঙ্গে !'

—'সে কে !'

—'একজন ইংরেজ নারী, বেশ ভালো টেনিস খেলতে পারে ।'

—'শ্রীবিলাসের স্ত্রী সাইকেলও চড়তে পারে, না ?'

—'হঁ্যা ।'

—'বাবা, আমি তো কল্পনাও করতে পারি না ।'

—'তুমিই যদি শ্রীবিলাসের স্ত্রী হতে তোমার আজকের এ অভাব দুরবস্থার কথা ধারণাও করতে পারতে না ।'

অঞ্জলি শিহরিত হয়ে উঠে আমার দিকে তাকাল ।

—'টেনিস খেলতে পারতে, সাইকেল চড়তে পারতে, কাটলেট-চকোলেট রাঁধতে পারতে, ফ্যাট খেতে পেতে, টিনের মাংস খেতে ।

—'টিনের মাংস কী ?'

'—গোরু শূয়োর মুর্গি পাখির মাংস ।'

দেখলাম দুটো হাত কাঁটা দিয়ে উঠেছে, জানালার কাছে থুতু ফেলে এল ।

—'এই মোটা মেয়েটিকে শ্রীবিলাস ভালবাসেন ?'

বললাম—'সে রকম জীবন পেলে এ রকম ডাঁটিভাঙা শুকনো রজনীগন্ধার মত হয়ে পড়ে থাকতে না তো, বর্ষাকালের কলার ঝাড়ের মত অনন্তে পরমায়ুতে জীবনকে আদায় করে ছাড়তে—শ্রীবিলাস বললে নারীর পক্ষে স্থূল হওয়া ভারী চমৎকার ।'

—'শ্রীবিলাস তো বললে —কিন্তু তুমিও কি তাই বলো ?'

—'করবীর করুণ একখানা শাখার পুষ্পিত রূপ ; তা নিয়ে কবিতা লেখা যায়, ছবি আঁকা যায়, কিন্তু আটপৌরে জীবন চলে কি না—আচ্ছা তোমার কি মনে হয় ?'

করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, বললে—'আমাকে ব্যথা দিতে তোমার ভাল লাগে ?'

—'জীবনের কবিত্ব ও শিল্পের দিক দিয়ে ঠাট্টার জিনিশ তুমি নও তো অঞ্জলি ।'

—'যাক, জানি আমার রোগা শরীর তোমার ভালো লাগে না । —আচ্ছা

একটা কথা আমাকে বলবে ? শ্রীবিলাস আমাকে দেখতে চাইল না কেন ?'

—'থাক—সে কথা শুনে তোমার কাজ নেই—'

—'বলবে না ?'

—'শুনলে তোমার কোনো লাভ হবে না।'

অঞ্জলি একটু হেসে—'কিন্তু না বলে চেপে রাখলে আমিও তো একটা অভাব বোধ করব ; সে অভাবের ব্যথা তো কম নয়।'

—'দেখা করে নি ; শ্রীবিলাস মর্জির মানুষ—নিজের মর্জি মত চলে।'

—'এই শুধু ? আর কিছু নয় ?'

—'আবার কী থাকবে !'

—'ঐ যে যাবার সময় কী বলে গেল !'

—'তাও শুনেছ নাকি ?'

—'একটু-একটু শুনেছি !'

—'ও-সব সত্যি নয়—বানিয়ে বলেছে।'

—'বানিয়ে বলে কী লাভ ?'

—'ঐ একরকম লোক আছে এই ধরনের গল্প বানিয়ে আসর জমাতে খুব ভালবাসে।'

—'কিন্তু তোমার মা তো সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন—'

—'কই শেষ পর্যন্ত ছিলেন না তো—'

—'কিন্তু গোড়ার দিকে ছিলেন তো—তার সামনেও এমনি সব কুৎসিত ইঙ্গিত করতে দ্বিধা করল না ?'

—'শ্রীবিলাস আলাদা জগতের মানুষ ; বুঝবে না তাকে তোমরা—'

—'কিন্তু যা বললে বাস্তবিক যদি সত্যি হয় !'

—'না। সত্যি নয়।'

জানালার ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইল অঞ্জলি—তার পর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে —'শ্রীবিলাস সত্যি বলেছে কি মিথ্যা বলেছে তা জানি না—কিন্তু সংসারে এ-রকম অনেক হয়—' একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে —'আমি এখন ঘুমোব—তুমি যাও—।'

বিরস মুখে চোখ বুজে রইল।

নিজের জীবনের সবটুকু কথা সে আমাকে কোনোদিনও বলে না।

দু-তিন-দিন পরে—আমাদের বাসার থেকে দু-তিন খানা বাড়ির পর, রামতারণ ঠাকুরের বাড়িতে, একটা শ্রাদ্ধের আয়োজন চলছিল। বেলা দশটা সাড়ে দশটা হবে। আমাদের বাড়ির সব লোক, অঞ্জলি, এমন কি বাবা পর্যন্ত, সেখানে চলে গেছেন।

শ্রীবিলাসের কাছ থেকে ? তিন খানা বই নিয়ে এসেছিলাম একখানা কবিতার বই, বাকি দুটো সমালোচনার। বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসে কবিতার বইটা পড়ছিলাম।

পড়তে-পড়তে চোখে পড়ল—

Have I a wife ? Be damn I have,
But we were badly mated ;
I hit her a great dart (?) one night,
And now we are separated.
And mornings going to work
I meet her on a quay :
"Good morning to ye, ma'am", says I,
"To hell with ye" ! says she.

পড়ে ভারি আমেজ লেগে গেল।

বইটা বন্ধ করা যাক আর পড়বার দরকার কী? চুরুটটা জ্বালিয়ে বহুদূরের অশ্বত্থ, আম, বাঁশ, বেতের নীলাভ সবুজের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম—মিনিট পনের পরে চেয়ে দেখি, খাকির প্যাণ্ট কোট পরা পোস্ট-আফিসের পিয়ন আমারই দিকে এগিয়ে আসছে।

চিঠি এল হয়তো। কার?

কাছে এসে দাঁড়িয়ে—'আপনার নামই তো শচীনবাবু -'

—'হ্যাঁ, চেনই তো।'

—'তবুও—একটু সাবধান হতে হয়—'

—'কেন, বলো তো ?'

—'আপনার নামে একটা ইনসিওরেন্স আছে—'

—'আমার নামে ? না বাবার ?'

—'আপনার নামেই।'

থামখানা হাতে তুলে দেখলাম—আমারই নাম, আমারই ঠিকানা বটে।

—'ইনসিওর কে করল আবার ?'

—'তা আমি কী করে বলব ? পাঁচ টাকার এম-ও-ওতো আসে নি কোনো-দিন আপনার নামে।'

—'এর ভিতর টাকা ? না ইনসিওর করে যামিনী রায়ের ছবি পাঠিয়েছে ?'

—'খুলে দেখুন।'

সাইন করে পিয়নকে বিদায় দিলাম।

দশটাকার দশখানা নোট। সঙ্গে একখানা চিঠি।

রাঁচি

স্নেহাস্পদেষু

আমি কয়েকদিন যাবৎ দরকারি হিসাবপত্র মিলাইতেছি। যাহার-যাহা পাওনা চুকাইয়া দিতেছি। খুচরা কাগজপত্র নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলাম কতকগুলি ছোটখাট খুচরা ঋণ মিটাইয়া দেওয়া হয় নাই। লাক্ষার (কিংবা চায়ের) ব্যবসা সম্পর্কে কলকাতায় তোমার নিকট হইতে একবার একশত টাকা নিয়াছিলাম ; দেখিতেছি সে টাকাটা তোমাকে এখনও ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। মূল টাকাটা তোমাকে আজ ইনসিওর করিয়া পাঠাইয়া দিলাম। তোমার নিকট হইতে যখন টাকাটা লইয়াছিলাম—সুদ দিবার কোনো কড়ার ছিল না। তবুও, টাকাটা এতদিন ফেলিয়া রাখিব তাহাও তুমি ধারণা করিতে পার নাই। এক্ষেত্রে কিছু সুদ যদি তুমি প্রত্যাশা কর, অন্যায় নয়। লাক্ষার ব্যবসায় আমার লাভ কিছু হয় নাই ; বরং লোকসানই গিয়াছে। তবুও, বিচার-বিবেচনা করিয়া তোমার এ টাকার বাবদ বৎসরে শতকরা সাড়ে চার টাকা হিসাবে সুদ ধার্য করিলাম। চক্রবৃদ্ধি সুদের কথা যদি উল্লেখ করো, তাহা হইলে আমি এই বলিব যে এক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দেওয়া চলে না। তুমি যে আমাকে টাকা দিয়াছিলে তাহার কোনো দলিলপত্রও নাই ; আমার বেশ মনে আছে স্ট্যাম্পে সই করিয়া টাকাটা নেওয়া হয় নাই। যাক, সে সব কথার উল্লেখ করিতে চাই না আমি। টাকাটা আট বছর আগে নেওয়া হইয়াছিল ; সুদ বাবদ তোমার নিট্ প্রাপ্য একশত ছত্রিশ টাকা। একশত তোমাকে আজ পাঠাইলাম ; আর কয়েকদিন পরে ছত্রিশ টাকা পাঠাইয়া দিব।

আশা করি কুশলে আছ।

ডাক্তাররা বলেন আমার গলস্টোন হইয়াছে। একবার কলিকাতায় গিয়া উত্তমরূপে চিকিৎসা করাইতে হইবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

ইতি তোমাদের রজনীকান্ত খাসনবীশ

'ওঃ রজনীবাবু !—'

লাক্ষা চা—অনেক কিছুর ব্যবসাই করতেন বটে; ব্যবসা করে টাকাও জমিয়েছেন যথেষ্ট; আট দশবছর আগে কলকাতায় মাঝে-মাঝে তার সঙ্গে দেখা হত বটে আমার। কিন্তু তাকে কোনোদিন দশ টাকা দিয়েছি বলে তো মনে পড়ল না।

ডেক চেয়ারে বসে আট বছর আগের কলকাতায় দৈনন্দিন জীবনটাকে খুব পুঙ্খানুপঙ্খ ভাবে খতিয়ে-খতিয়ে দেখলাম, অনেকবার দেখলাম, ঘন্টা দুই কেটে গেল কিন্তু রজনীকান্ত খাসনবীসের এ-চিঠির কোনো ভাবার্থই আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।

বাস্তবিক, একশ টাকা তিনি কোনোদিনও আমার কাছ থেকে নেন নি; রজনীর ব্যবসার সঙ্গে কোনোভাবেই আমি কোনো দিনও লিপ্ত ছিলাম না। দু-চার টাকা মানুষকে মাঝে-মাঝে ধার দিয়েছি-নিয়েছি বটে, কিন্তু আমার দেনাপাওনা এ সংখ্যার উপরে যায় নি কোনো দিন।

চিঠিটা বারবার পড়ে হাসি পেতে লাগল আমার।

এ মানুষটির উদ্দেশ্য কী? তিনি আমাকে এমনিই একশ টাকা দিতে চান? যদি তা আমি না গ্রহণ করি সেই জন্যই এই চিঠির সৃষ্টি? কিন্তু রজনী সে রকম জাতের লোক নন তো। তিনি হিশাবি মানুষ, বিষয়ী। কল্পনা বা হৃদয় নিয়ে খেলা করবার দোষ তার কোনোদিনই নেই। ভুল করেছেন! হয়তো অন্য কারো প্রাপ্য ভুলে আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। তাই হবে হয় তো। কিন্তু খামখানার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—নাম-ঠিকানা সমস্তই অকাট্য, জেলা, পোস্ট অফিস, বাবার নাম—কোথাও একটুও খুঁত নেই। সমস্তই পরিষ্কার, নিরেট।

কিন্তু তবুও এ-টাকাটা আমার নিজের অর্জিত জিনিশ বা প্রাপ্য সম্পত্তি নয়। টাকাটা ফিরিয়ে দেব?

বাবার কাছে সমস্ত খুলে বলব ?

মার কাছে ?

অঞ্জলির কাছে ?

রজনীকে একখানা চিঠি লিখে জানাব যে তিনি সম্পূর্ণ ভুল করেছেন, আমার কাছ থেকে কোনো টাকা কোনোদিন তিনি নেন নি—এ টাকাটা আমি তার কাছ থেকে পাই না ?

অবিশ্যি একটা কথা ঠিক। এ টাকাটা যদি আমি রেখে দেই, তাহলে ব্যবহার করতে পারি। আইনে কোথাও বাধে না।

অবিশ্যি নীতিতে বাধতে পারে। কিন্তু নীতির মানেও তো বিচিত্র।

রজনীর অজস্র টাকা আছে, এ কটি টাকা তার কাছে নদীর জলে শিশিরের ফোঁটার মত। আমার এক পয়সাও নেই, অঞ্জলি চার পয়সার জর্দা কিনতে চেয়েছিল, দিতে পারিনি। বায়স্কোপ দেখতে চেয়েছিল—তার সিঁদুরের কৌটোর টাকা দুটো নিয়ে নিতে হয়েছে। এ একশ টাকার মূল্য আমার কাছে অপরিসীম: এ টাকা দিয়ে আমি বিচার-কল্পনার অনুশীলন করতে পারব কয়েকখানা বই কিনে, আমার নিজের কঠিন জীবনের জীর্ণতাকে খানিকটা সুস্থ ও সুন্দর করে তুলতে পারব দু-এক জোড়া কাপড়-জামা ও জুতো কিনে, মাকে ও বাবাকে কয়েকখানা নতুন কাপড় কিনে দিলে নিরপরাধ পরিতৃপ্তির কল্যাণ আস্বাদ করতে পারা যাবে। অঞ্জলিকে সেই বুটিদার শাড়িটা কিনে দেওয়া যাবে। কয়েক শিশি জর্দা কিনে দিতে পারব, এক জোড়া [......]-র জন্য প্রায় বার বছর ধরে বলে আসছে, কিনে দেওয়া যাবে—তার মলিন নিরস [জীবন দেখবার] অভ্যাস, ও অন্ধকারে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা, কয়েকদিনের জন্য প্রসন্ন জীবনের নীচে ধুলো হয়ে ছাই হয়ে থাকবে।

পৃথিবীতে চৌত্রিশটা বছর কাটালাম। অনেক বই পড়েছি, অনেক মতামত বুদ্ধি বিচারের সংঘর্ষে এসেছি, অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে—তারপর দেখলাম সাধারণের পক্ষে আমি কোনো দিক দিয়েই চলি না। সকলে বিধাতাকে বিশ্বাস করে, অন্তত তাকে মঙ্গলময় বলে, আমি সৃষ্টির সম্পর্কে আমার ব্যথিত সমস্যা নিয়ে দিন কাটাই। সকলের জন্য সম্পদ রয়েছে, সমাজের নীতি ও ধর্ম রয়েছে অচলপ্রতিম শামুকটির মত। সে অচলতা আমার চোখে পড়ে না। নিষিদ্ধ পথে ফিরি, নিষিদ্ধ কথা ভাবি, অবৈধ প্রশ্ন তুলে

বেড়াই !

রজনীর এ টাকা আমার জীবনের সম্পর্কে আমার কাছে বৈধ বলে মনে হল। যেদিন থেকে মানুষ আনন্দ, দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি, মমতা, প্রেম, কল্যাণ সমস্তই টাকার বিনিময়ে কিনতে শিখল, বিক্রি করতে শিখল সেদিন থেকেই নারীর হৃদয়ের ঐকান্তিক শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে গেছে! কবি নষ্ট হয়ে গেছে, প্রেমিক নষ্ট হয়ে গেছে—প্রশ্নহীন দ্বিধাহীন ভালবাসা পেতে হলে তাই সভ্যতার বাইরে বহুদূরে গিয়ে কোনো বনের বালিকাকে খুঁজে পেতে নিতে হয় কিংবা চিতা বাঘিনীকে ; কিংবা সভ্যতার ভিতরে একটা কুকুরকে —কিংবা— ।

এরা টাকার মানে জানে না, ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি ও মঙ্গলকে অকল্পিত-ভাবে নিঃসঙ্কোচ সম্পূর্ণতায় জীবনের পথে বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতা এদের আছে তাই। এরা টাকার মানে জানে না। আমাদের অভিসারিকারা, নারীরা, কবিরা, প্রেমিকরা সকলেই জানে। জানতে আমারও বাধা কী ?

কাউকে কিছু বলতে গেলাম না আমি। একশ টাকা নিজের কাছে রেখে দিলাম। পিয়ন যখন এসেছিল তখন বাবা বা অঞ্জলি ছিল না যে এ বেশ ভরসার কথা। অঞ্জলিকে তবুও একটু বুঝিয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু বাবা থাকলে—এড়াবার কোনো দ্বিতীয় পথ ছিল না। তাকে চিঠি দেখাতে হত, সমস্ত ব্যাখ্যা করতে হত। পরিষ্কার ঝর-ঝরে শাদা ব্যাখ্যা -এক জায়গায় একটুও খুঁত থাকলে চলত না, ঘটনার যথার্থতা বাস্তবিক কী একবার জেনে নিয়ে তিনি অমনি কাজ করে ফেলতেন ; আজই মনি অর্ডারে টাকাগুলো রজনীকে পাঠিয়ে দিতে হত। সোস্যালিজম বা কমিউনিজম এর কোনো কথাই তিনি শুনতে যেতেন না। আধুনিক জীবনের দোহাই পেড়ে একচুলও নড়াতে পারতাম না। তিনি সাবেক কালের লোকই শুধু নন—সেকালের যুক্তিনিষ্ঠ সাধু লোক ।

সন্ধ্যার সময় অঞ্জলি নিজেই আমার কোঠায় এল।

বললে—'আজ তো তোমার বড়-বড় বন্ধুরা কেউ আসবেন না—?'

—'কী জানি, তাদের মর্জি।'

—'না, আসবেন না—রোজই কি আসে ?'

তাকিয়ে দেখলাম বৌভাতের সময় কেনা সেই হেলিট্রেপ শাড়িটা পরেছে, চু-

কানে দুল ঝক-ঝক করছে, বিকেলে সাবান দিয়ে গা ধুয়েছিল টের পেলাম। শরীরের থেকে, নিঃশ্বাসের থেকে, স্নিগ্ধ গন্ধ বেরুচ্ছে, চওড়া কপাল, মুখ ঝর ঝরে, অন্ধকারে হাতির দাঁতের গড়া রূপসী মূর্তির সঙ্গে আচমকা কেমন সাদৃশ্য বেরিয়ে পড়ে, সাদৃশ্য হারিয়ে যায়। সিঁথায়, কপালে, সিঁদুর; পান খায় নি—ঠোঁট পরিষ্কার। কথা বললেই দাঁত ঝিকমিক করে ওঠে, মুখের থেকে লবঙ্গের গন্ধ বেরয়।

—'বসো অঞ্জলি।'

বিছানার পাশেই বসল।

—'এখন যদি ওঁরা কেউ এসে পড়েন?'

—'কে? শ্রীবিলাস?'

—'কিংবা চন্দ্রকান্তবাবু—'

—'বাঃ চন্দ্রকান্তর নাম তুমি কী করে জানলে?'

—'তিনি এসেছিলেন একদিন দুপুরবেলা।'

—'তুমি তো তখন এ ঘরে ছিলে না—'

—'ছিলাম না বটে কিন্তু গলার আওয়াজ পেয়ে এসেছিলাম।'

—'চেনা গলা বলে মনে হয়েছিল বুঝি?'

—'দূর! অত চাপা গলায় কে কথা বলে শুনতে এসেছিলাম।'

—'চন্দ্রকান্ত শ্রীবিলাসের মত চেঁচায় না।'

—'কোন্ এক মেয়ের কথা বললে না?'

—'কে? চন্দ্রকান্ত?'

—'হ্যাঁ। কে সেই মেয়ে?'

—'ও, সে একটি মেয়ে ছিল—বছর পনের বয়স।'

—'পনের বছর মোটে।'

—'কুড়ি বছর আগে তার তের বছর ছিল।'

—'তাহলে এখন তেত্রিশ হয়েছে।'

—'না, তা হয় নি।'

—'হওয়াই সম্ভব। চন্দ্রকান্ত তার সম্বন্ধে যেমন করে বললেন বাস্তবিক বড় ভাল লাগল আমার।'

—'চন্দ্রকান্ত প্রেমিক মানুষ।'

—'ভারি কৌতূহল হয় মেয়েটিকে দেখবার জন্য।'

—'এখন দেখলে বীতশ্রদ্ধ হতে হবে।'

—'কেন, তুমি দেখেছ নাকি শিগগির ?'

—'না দেখতে চাইও না। কুড়ি বছর আগের স্কুল-পলাতক মাস্টার-ছেলে-মেয়েদের দল এমন হৃদয়ের জিনিস ; বাইরের সংসারে তাদের খুঁজতে গেলে একটা কদর্য ধাক্কা খেতে হবে। জীবনের যা কিছু গোপন সৌন্দর্য আছে তা আছে। কিন্তু তাই বলে বাজারে গিয়ে তার লোম ও লেজ দেখে আসবার কৌতূহল নিতান্তই অসঙ্গত!'

অঞ্জলি খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে—'আমি তোমার এ কথায় বিশ্বাস করি না—'

—'করো না ?'

—'চন্দ্রকান্ত করবেন না। আমি অবাক হয়ে ভাবি তাকে যেমন করে খুঁজছেন চন্দ্রকান্ত আমাকেও কেউ তেমন করে খোঁজে নাকি ?'

চুপচাপ। অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করে রইল সে।

পরে চোখ তুলে—'কথা বলছ না যে ?'

আস্তে আস্তে আমার হাতখানা তুলে নিয়ে—'সে সৌভাগ্য সকলের জীবনে হয় না—কী বলো ?'

—'কোন সৌভাগ্যের কথা বলছ ?'

আন্দাজ করে নিয়ে—'আমার তো হয় নি—'

—'বড় তো জবাব দিলে, কোন সৌভাগ্যের কথা বলছি বল দেখি ?'

—'কিশোর জীবনের চন্দ্রকান্তর মতন একটি প্রেমিক হৃদয়কে অধিকার করার সৌভাগ্য।'

—'হ্যাঁ, সে কথাই বলতে চাচ্ছিলাম ; এ সকলের জীবনে হয় না, কী বলো ?'

—'বলা বড্ড দুষ্কর ; জীবনের রহস্য অনেকখানি ?'

—'কিন্তু হলেও-বা কী লাভ ? কী লাভ হল ? এদিন পরে এসে তিনি দেখলেন তার বাড়ি-ভিটে জঙ্গলে ভরে গেছে, একটা কুকুর মরে আছে তার ওপর ; কতকগুলো শকুন চরে বেড়াচ্ছে।'

—'তার হৃদয়ের লাভালাভের আমরা কী বুঝি ? প্রেম শুধু মিলন নিয়ে নয় তো ; দীর্ঘ বিচ্ছেদ-ব্যথা শূন্যতা, সৃষ্টির অবিচার অন্ধতা নক্ষত্রের থেকে

নক্ষত্রে, নক্ষত্রের থেকে নক্ষত্রে আঁকাবাঁকা রহস্যময় বিরাট সিঁড়ির রূপ দেয়, প্রেমকে অপরূপ রূপ দিয়ে যায়।'

—'শেষ পর্যন্ত প্রেমের সার্থকতা পরস্পরের কাছাকাছি বসে নয়?'

—'প্রায়ই না। অনেক দিনের অদর্শন, নিষ্ফলতা, পরিহাস -হয়তো মৃত্যুর মধ্যেই প্রেমের চরিতার্থতা। তুমি আমার চেয়ে ভাল বোঝ এই সব—'

—'কী রকম?'

—'তোমার রূপ ছিল, হৃদয় ছিল, তোমাকে ভালবেসে অনেকে তৃপ্তি পেয়েছে।'

আঁচলের চাবিটা অন্ধকারের মধ্যে খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বাজিয়ে-বাজিয়ে অঞ্জলি শেষে—'তা, আমার অবস্থাও এর মতই।'

—'আমিও তাই ভেবেছিলাম।'

—'এই মেয়েটি জানে না চন্দ্রকান্তর মতন এত বড় এক জন প্রেমিক পৃথিবীর কিনারে তার জন্য রয়ে গেছে। তাদের জঙ্গল-ঢাকা ভিটের ওপর মড়া কুকুর ও শকুন দেখে যার হৃদয় ভেঙেচুরে একশেষ হয়ে যায়—কোনো দিনও এ-সব জানবে না সে। হয়তো আজ ঠিক এইরকম অন্ধকারে বসে আমারই মতন রিঙের চাবি ঘোরাচ্ছে সে—ঘোরাচ্ছে—ঘোরাচ্ছে—। চাবির রিং ঘুরিয়েই দিন কাটে আমাদের—না-ঘষে-মেজে দিন চলে যায়—অথচ এক দণ্ড যদি চুপ করে ভাবি, বুঝতে পারি, যে এই শাড়ি, সোনার হার, সিঁদুর, দিনরাত এই দেহের পরিচর্যা, মনটাকে ঠকাবার অসংখ্য প্রয়াস সমস্তই কি নিদারুণ ছেলেখেলা'। একটু চুপ থেকে অঞ্জলি বললে -'কোন এক অপোগণ্ড বিধবার ময়নার মত রাধা কৃষ্ণ নামই আওড়াতে হবে সারা জীবন বসে, এই নিয়ে প্রতি মুহূর্তের কাল্পনিক কৃষ্ণভ্রান্তি, দুটো দানা পেয়ে ইনস্টিঙ্কটকে ঠাণ্ডা রাখা; দিনরাত ময়নার মত খেয়ে, ঘুমিয়ে, অর্থহীন অন্ধ কথা নেড়েচেড়ে, সময় কাটিয়ে দেই; অপমানকেও চিনি না, স্মরণ করতেও ভুলে যাই জীবনের উদ্দেশ্য কত গভীর ও সুন্দর ছিল, কত সুদূরে আলোর আয়োজনের ভিতর লুকিয়ে ছিল।'

অঞ্জলি কথা বললে, খানিকটা সময় কেটে গেলে পর —'কী ভাবছ?'

'অপোগণ্ড বিধবার ময়নার কথা—'

—'আচ্ছা যাও -ঠাট্টা করতে হবে না', মুখ টিপে হেসে, 'আচ্ছা, সে

বিধবা কে বল তো দেখি—'

—'তার একটা ময়না আছে—'

—'বেশ তো, কিন্তু নিজে সে কী ?'

—'একটি অপোগণ্ড বিধবা—'

—'অপোগণ্ড বিধবা বলতে আমি কাকে বুঝেছি ?'

—'ময়নার মালিককে।'

—'বা রে বাঃ, খুব রং করতে পার দেখছি! আমি এই সৃষ্টির বিধাতাকে লক্ষ্য করে বলেছি, মানুষ তার হাতে নির্বোধ ময়নার মত, নিজে তিনি অপোগণ্ড বোষ্টমী যেন একজন। আচ্ছা চন্দ্রকান্ত বিয়ে করেছেন ?'

—'না।'

—'ও-সব মানুষ বিয়ে করে না। তোমার বড়-বড় বন্ধু আর-কজন আছে? চন্দ্রকান্তর মত ?'

—'আছে আরো দু-চারজন। তাদের অবিশ্যি আমি অনেক দিন দেখি নি; কী রকম ব্যবহার করবে আজ আমার সঙ্গে বলতে পারি না; হয়তো চিনবে না।'

—'কেন? আমারও ও-রকম অনেক বন্ধু আছে। কত চিঠি লেখে আমাকে। উত্তরও দিতে পারি না—তারা আমাকে দেখলেই গলা জড়িয়ে ধরে কত আদর করে। সুলতা একজন—নিজে দেওয়ানের মেয়ে, বেশ ভাল বিয়ে হয়েছে তার, একজন ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের সঙ্গে,' অঞ্জলি নখ খুঁটতে খুঁটতে—'সাড়ে সাতশ টাকা মায়না পায় ওর বর।'

সতৃষ্ণ মুখে কয়েক মুহূর্ত জানালার বাইরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইল, পরে বললে, 'উমার বিয়ে হয়েছে আরো ভাল, ওর বর জার্মানি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসেছে, এখন বারশ টাকা মায়না পায়—'

অন্ধকারের ভিতর দেখলাম চোখ দুটো লোলুপতায় চকচক করছে বধূর। বললে—'বারশ মায়না পায়, দিল্লিতে থাকে, দুটো মোটর আছে ওদের। চিঠি লিখলে অবিশ্যি এখনও উত্তর দেয় উমা। কিন্তু কে যায় চিঠি লিখতে, আছে আছে বড় মানুষ, তাই বলে তার কাছে—'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল।

জানলার বাইরের সজনে গাছটার দিকে তাকিয়ে একটু পরে—'গরিব হোক,

ভিখিরি হোক, সকলেরই নিজের মনুষ্যত্ব আছে—দোকানের জিনিশের মত সে সব তো আর টাকা নিয়ে হাত বাড়ালেই বিক্রি করা চলে না।'

এক-আধ ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল।

অঞ্জলি আস্তে-আস্তে—'নইলে দিল্লিতে গিয়ে কয়েক মাস উমার সঙ্গে কাটিয়ে আসি এতে কি তার অসাধ ? কিন্তু আমি যাব কেন ? আমাকে কি পথের কুকুর বিইয়েছিল ?' অনেক ক্ষণ অন্ধকারের ভিতর মাথা হেঁট করে বসে থেকে শেষে বললে—'আচ্ছা, তুমি চাঁদা তুলতে পারো না ?'

—'কিসের জন্য ?'

—'বিলেত যাবে—'

—'বিলেত !'

—'হ্যাঁ, গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আসবে।'

—'ইঞ্জিনিয়ারিং কী করে পড়ব ?'

—'কেন ?'

—'আমি তো টেকনিক্যাল লাইনে যাই নি ; বি-এ কিংবা এম-এ পড়া যায়।'

—'বেশ, তাই পাশ করে আসবে।'

'সে জন্য চাঁদা ? তা কেউ দেবে না।'

—'কেন ?'

—'কেউ দেয় না।'

ধীরে ধীরে অন্ধকারের ভিতর আমার পায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় নোংরা জিরজিরে সুতির শাড়ি পরে আমাকে বললে—'রান্না হয়ে গেছে, খাবে ?'

—'না, তুমি রেঁধেছ বুঝি ?'

—'হ্যাঁ।'

—'আজ গা ধোও নি ?'

—'নাঃ, অত বড়মানুষি শখ দিয়ে কী হবে !'

—'সাবানটা তোমার আছে, না ফুরিয়ে গেছে ?'

—'কাপড়কাচা সাবান ?'

—'না, গায়ে মাখবারটা।'

—'আছে খানিকটা।'

—'ওটা আর ব্যবহার করো না তুমি।'

—'কেন ?'

—'ও একটা দু-আনা দামের সাবান—মেখে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়।'

—'তুমি নিজে তো কোনো সাবান মাখ না।'

—'না।'

—'দেখি, কাপড়-কাচা সাবান দিয়ে দাড়ি কামাও।'

—'হ্যাঁ, তাতেই চলে যায়।'

একটু বিমর্ষ হয়ে অঞ্জলি—'চলে তো যায়, কিন্তু আমার বাপের বাড়ির প্রসন্ন বিশ্বাসকেও দেখতাম সেভিং স্টিক ব্যবহার করছে—আর আমার স্বামীর এই অবস্থা ?'

—'প্রসন্ন বিশ্বাস কে ?'

—'তিনি ছিলেন রেলের গুদামের ক্লার্ক।'

একটু হেসে—'তবে কেন ব্যবহার করবেন না ?'

—'কিন্তু লোকটা ফাস্ট ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছিল শুধু, তুমি তো এম-এ-পাশ—কত বড় বই পড়ো, সুন্দর কল্পনা তোমার, ভাল লিখতে পার। মেটে সাবানে গাল জ্বলে না তো।'

—'না, সাবধানে কামালে কোনো অসুবিধা নেই তো।'

—'তোমার ঘরটা আজ ঝাঁট দেওয়া হয়েছিল ?'

—'হ্যাঁ—হয়েছিল বই কি।'

—'কে দিলে ?'

—'কেন, তুমিই তো দিয়েছ।'

—'মিছিমিছি মিথ্যে কথা বলো কেন! আমি শিগগির তোমার ঘরদোর ঝাঁটি নি তো—'

—'কেউ দিয়ে গেছে ঝাঁট—'

—'সত্যিই ? না মিথ্যে বলছ ?'

—'দেখো না তাকিয়ে—কী রকম পরিষ্কার।'

—'অন্ধকারে কী করে দেখব ?'

—'বাতিটা উশকে নাও।'

—'আমি ঝাড়ু নিয়ে আসি।'

আঁচল ধরে আটকে রেখে বললাম—'এখন একটু চুপচাপ বসেছি—এখন ধুলো উড়োতে পারবে না অঞ্জলি।'

—'আচ্ছা বেশ, তুমি যখন ঘুমিয়ে থাকবে—'

—'তখন ঝাঁট দেবে? ধুলোবালি যে তা হলে আমার মুখেচোখে গিয়ে লাগবে।'

—'তুমি মশারি ফেলে শুয়ে থাকবে তো।'

—'আচ্ছা বেশ, তাই করো।'

—'আজ ভেবেছিলাম তোমার ঘরে ধূপ দেব।'

—'ধুনুচিটা তো ভেঙে গেছে।'

—'পিসিমার খাটের নীচে আর-একটা পেয়েছি।'

—'সেটা তো পিসিমা ব্যবহার করেন।'

—'ইস, ব্যবহার করেন না ছাই—মাকড়সার জাল জমে গেছে সেটার ভিতর—'

—'তাই না কি?'

—'কতকগুলো টিকটিকির ডিম ছিল, কুমরো পোকার পাখনা, আরশোলা রয়েছে মরে।'

—'হুঁ?'

—'আমি সব ঝেড়েপুছে পরিষ্কার করে নিয়েছি—কিন্তু সারা বাড়ি খুঁজে এক ছিটে ধূপ পেলাম না।'

—'চার পয়সার আনালে হয়।'

—'ভাবছিলাম বাবাকে বলব, কিন্তু বলতে লজ্জা করে আমার।'

—'আচ্ছা, কাল সময় মতন বলব আমি।'

—'আজ তা হলে আর ধূপ দেওয়া হল না।'

দেখলাম মুখখানা বাস্তবিকই চিন্তিত, বিষণ্ণ। অঞ্জলির যে কখন কী হয় বুঝতে পারা যায় না।

—'তোমার বিছানার চাদরই-বা কী হয়েছে? ইস, কী ছিরি!'

—'কেন?'

—'চুরুটের ছাইয়ে, ধুলোয়, তেলে, মরা ছারপোকার রক্তে এ কী করেছ তুমি ?'

—'না, এটা ধুয়ে নিতে হবে ; শ্রীবিলাস সেদিন বসতেই কুণ্ঠিত বোধ করছিল আমার এ বিছানায়।'

—'ধুয়ে নিতে হবে, কে ধোবে শুনি ?'

—'আমিই ধুয়ে নেব এখন ; চানের সময় খানিকটা সাবান লাগিয়ে কয়েকটা আছাড় দিলেই তো হবে—'

—'বেশ, তুমি মনের সাধে যা খুশি তাই বলে যাও, কার প্রাণে গিয়ে কী রকম লাগে তার কোনো খোঁজখবরও নিতে যেও না। তুমি তোমার জামা-কাপড় কাচবে —আমি এ বাড়িতে কি সং হয়ে এসেছি ? বেশ, তাহলে একটা ফ্রেমে বেঁধে আমাকে বেড়ায় ঝুলিয়ে রাখ না কেন ?'

আঁচল দিয়ে হাত মুখ কপাল মুছে নিতে-নিতে অঞ্জলি—'তোমার কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। কাল সকালবেলা তোমার বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় আর যা ময়লা কাপড়-গেঞ্জি-শার্ট আছে সব নিয়ে যাব কিন্তু আমি। তুমি সকাল-সকাল উঠে বিছানা খালাশ করে দিও।'

—'এত জিনিশ এক দিনে কেচে কী লাভ ?'

—'একদিনেই কাচব আমি।'

—'তারপর, ঘুসঘুসে জ্বর হলে—'

—'তাই তো কামনা করো তুমি—'

একটু চুপ থেকে বলি—'তোমার বই জোগাড় হল ?'

—'না, কোথায় হল আর ?'

—'পড়বে না ?'

—'তোমরা তো আকাঙ্ক্ষা করো না। গুদামের একটা বস্তার মত তোমাদের সংসারের এককোণে আরশুটি মেরে পড়ে থাকি, যে খুশি মাড়িয়ে যাক, সকলের পায়ের তলে-তলেই জীবনটা উৎসর্গ করে দেই,' একটা নিঃশ্বাস ফেলে—'কিন্তু আমি তা হতে দেব না—পাশ না করলে আমার চলবে না—'

—'পাশ করে মাস্টারি করবে ?'

—'করব বৈকি। পারলে পেশোয়ারেও মাস্টারি নিয়ে যাব।'

—'তোমার কত টাকার বই-এর দরকার ?'

—'কেন মিছেমিছি স্ত্রীর কাছে সাপের মত হাঁচি দিয়ে বেড়াও? টাকা দিয়ে বই কিনে দেবে তুমি? পাড়ার ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন এবার বি-এ-পাশ করল। যোগ্যতা যদি থাকে তো ওদের কাছ থেকে জোগাড় করে এনে দাও না!'

অঞ্জলি একটু চুপ থেকে—'পরীক্ষার ফল কবেই তো বেরিয়ে গেছে। এত দিনে বই কি আর আছে ওদের হাতে? নিজের হাতে না করলে কিছুই হয় না—স্বামীও যে। মানুষের পর।'

অঞ্জলিই আবার বললে—'কী গো, চুপ করে যে?'

—'বাতিটা একটু আনো তো।'

—'কেন?'

—'খবরের কাগজ পড়ব।'

—'কাগজ পেলে কোথায়?'

—'বাবা একটা কিনে নিয়ে এসেছেন।'

—'ইংরাজি?'

—'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা, আমাকে দাও না—আমি পড়ি।'

বাতিটা সে নিয়ে এল।

বললে—'কী লিখেছে, দেখ তো।'

—'দাঁড়াও, দেখছি।'

—'কোথাও চাকরি খালি আছে?'

—'সে খবর নিয়ে লাভ কী?'

—'কেন?'

—'চার-পাঁচ বছর ধরে এমনি কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছি।'

—'তারপর?'

—'একটা উত্তরও আসে নি।'

খবরের কাগজটা দেখতে-দেখতে বললাম—'ফ্রান্সি ফিল্ডসের নাম শুনেছ?'

—'সে কে?'

—'একজন ভাল নায়িকা।'

—'ইংরেজ বুঝি?'

—'হ্যাঁ, ল্যাঙ্কাশায়ারে বাড়ি।'

—'তার কী হয়েছে ?'

—'একটা সিনেমা কোম্পানির সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছে যে প্রত্যেকটা ছবির জন্য ফ্রান্সিকে তেইশ হাজার পাউণ্ড দেবে।'

অঞ্জলি চোখে কপাল তুলে—'তেইশ হাজার ?'

—'টাকা নয়, পাউণ্ড—। একটা ছবির কাজে মিস ফিল্ডসের যতখানি সময় লাগে তাতে হিশেব করে দেখা গেছে যে প্রত্যেক মিনিটে সে পাঁচ পাউণ্ড করে পাবে—মানে ত্রিশ টাকা।'

—'প্রত্যেক মিনিটে ত্রিশ টাকা ?'

—'হ্যাঁ।'

—'যাক, এ-সব খবর আমি শুনতে চাই না।'

—'কেন ?'

—'গান্ধীর কী হল ?'

—'গান্ধীর কোনো খবর এতে নেই।'

—'এটা কী কাগজ ?'

—'স্টেটসম্যান।'

—'বাবা স্টেটসম্যান আনলেন যে ?'

—'এটা রবিবারের স্টেটসম্যান কি না।'

—'তাতে কি।'

—'মাসে-মাসে এই কাগজটা তিনি কেনেন। নানারকম খবর থাকে, একটা কাগজে তার ছ মাস চলে যায়।'

—'ছ মাস ?'

—'হ্যাঁ, অবকাশ মত অল্প-অল্প পড়েন। দিনরাত স্কুলের কাজ করে অবসর পান না আর। এই তো আগস্টে একটা কিনলেন—আবার হয়তো ফেব্রুয়ারিতে একখানা কিনবেন।'

—'কিন্তু তবুও এ কাগজ কেনা উচিত নয় তাঁর।'

—'তা হলে আমার পড়া বারণ ?'

—'তুমি পড়ো ; কিন্তু আমাকে শোনাতে যেও না—'

—'খবরের কাগজে কাজ করেছি বলে সব খবরের কাগজের প্রতিই আমার

একটা মোহ আছে অঞ্জলি? একটা ভালো আর্টিকেল দেখলে খানিকটা পরিতৃপ্তি পাই।'

—'ভালো আর্টিকেল মানে?'

—'আর্টিকেল-এর বক্তব্য বড় বেশি দেখতে যাই না; দেখি লিখবার রীতি।'

অঞ্জলি চুপ করে ছিল।'

বললাম—'এ কাগজে যদি আমার লেখা ছাপাতে পারি হয়তো পনের কুড়িটা টাকা দেবে।'

—'কী লেখা ছাপাবে তুমি এই কাগজে?'

—'অবিশ্যি রাজনীতি নয়--আরো কত রকম বিষয় আছে।'

—'লেখা পাঠালে এরা টাকা দেয়?'

—'লেখা ছাপালে দেয়।'

অঞ্জলি মাথা হেট করে নখ খুঁটতে-খুঁটতে, অবশেষে দ্বিধার সঙ্গে, 'দাও না পাঠিয়ে, যদি ছাপায়--'

একটু হেসে—'মাথা মাথা খুঁড়ে মরলেও ছাপবে না।'

—'কেন?'

—'বুঝবে যে, যে লেখা পাঠিয়েছে সে মানুষটির ঐকান্তিকতা নেই—নির্বোধ অবসাদে জীবন কাটাচ্ছে।'

অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে—'রবিবারের একটা দেশী কাগজও এনেছেন বাবা।'

—'আচ্ছা দেশী কাগজে লেখা ছাপাতে পারলে টাকা দেয়?'

মাথা নেড়ে—'না'।

—'মাসিকে যারা গল্প লেখে তারা টাকা পায়?'

—'পায় বোধ করি।'

—'কত?'

—'এই কুড়ি-পঁচিশ-ত্রিশ—'

—'তাহলে তুমি গল্প লেখো না—'

—'তা তুমি আমার চেয়ে ভালো লিখতে পার।'

—'একথা তুমি বল কেন? আমি কি কোনোদিন লিখেছি?'

—'লিখবার রুচি আছে হয় তো তোমার।'

—'তোমার নেই?'

—'না।'

—'আচ্ছা দেশী কাগজটায় থিয়েটারের বিজ্ঞাপন দিয়েছে ?'

—'দেখি।'

—'কী দিয়েছে ?'

বিজ্ঞাপন দেখতে-দেখতে—'থিয়েটার মানে আজকাল টকি অঞ্জলি।'

—'কী টকি হচ্ছে ?'

—'এই তো দেখছি চণ্ডীদাস হচ্ছে এক জায়গায়—'

—'দেখেছ তুমি এটা ?'

—'না।'

—'চণ্ডীদাসের জীবনের ব্যাপারটা কী ?'

—'রামী বলে একজন রজকিনীর মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা ছিল।'

—'দু জনেই দু জনকে ভালবাসত ?'

—'তাই তো বোধ হয়—'

—'আচ্ছা পদাবলির এই গানগুলো কি এই মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন ?'

—'মিনা হার্জলিসের উদ্দেশে গ্যয়টে যে-রকম লিখে গেছেন এ ঠিক সে জাতের নয় অঞ্জলি। অথচ মিনার নামে সাদের কবিতাগুলো পড়েই আমি তৃপ্তি পাই।'

—'কেন ?'

—'সরল সাধু বিশ্বাসের জীবন অনেক দিন হয় হারিয়ে ফেলেছি কি না। বাংলার রূপকেও সব সময় সবচেয়ে গভীর ও সুখের বলে মনে হয় না। আমরা অত্যন্ত চামার হয়ে পৃথিবীর পথে ফিরছি—'

—'কিন্তু চণ্ডীদাস—'

—'আহা, কী যে সরল হৃদয় ছিল মানুষটির ! বিধাতায় শিশুর মত বিশ্বাস ছিল—নারীর প্রতিও ; মানুষকে সব চেয়ে বড় বলে আখ্যাত করে গেছেন। আমার অনেক সময় কিন্তু মনে হয় একটা শালিখ বা চড়াইও অনেক মানুষের চেয়ে ঢের বড়—'

—'আচ্ছা, এই যে নাটক লিখে যারা থিয়েটারে দেয় তারা পয়সা পায় না ?'

—'যদি সে নাটক অভিনীত হয়—'

—'কত টাকা পায় ?'

—'ঠিক আমি বলতে পারি না ; তবে—'

—'তুমি একখানা নাটক লিখলে পারো।'

কোনো জবাব দিলাম না।

একটু চুপ থেকে অঞ্জলি—'আবার যে গম্ভীর হয়ে আছ ? কী চিন্তা করছ ?'

—'ভাবছি তুমি পুরুষ মানুষ হলে অনেক কিছুই করতে পারতে ; আমাকে দিয়ে কিছু হল না।'

—'এখানে কোনো টিউশনি পাওয়া যায় ?'

—'যে কটি পাওয়া যায় তা স্কুলের মাস্টারদেরই একচেটে'—

—'স্কুলের মাস্টারির জন্যও তো কত চেষ্টা করলে ; থাক, আর চেষ্টা করে দরকার নেই। তারচেয়ে তুমি কলকাতায় কোনো কাগজে ঢুকতে পার না কি সেই দেখ।'

—'তাই চেষ্টা করব।'

—'ঝপ করে ওটা কী পড়ল ?'

—'একটা ইঁদুর বোধ করি।'

—'মরে গেল না কি ?'

—'না, পালিয়ে গেছে।'

—'ঘরে বড্ড বেশি ইঁদুর হয়েছে।'

—'দরমুশ দিয়ে মেরে ফেলতে পার।'

—'ছি, মেরে কী লাভ !'

—'কাল এক-আধটা ধরলে হয়।'

—'কেন ?'

—'বেশ সাজা হবে তাতে।'

—'তাতে কি ওদের শিক্ষা হবে ?'

—'যাতনা তো পেয়ে নেবে বেশ।'

—'এ-সব ক্ষুদ্র জীবদের যাতনা দিয়ে কী লাভ ?'

—'বিধাতা তাতে অপ্রীত হবেন না।'

—'কী করে তা তুমি জানো ?'

—'তুমিও কি তা জানো না ! নিজের জীবনটার কথাই ভেবে দেখ না কেন ?'

অঞ্জলি একটু চুপ থেকে—'বই ক-খানার জোগাড় দেখো তো।'

—'আচ্ছা।'

—'তুমি যা বলেছ তাইই ঠিক মনে হয়। নোটগুলোই পড়ব শুধু—কী বলো?'

—'হ্যাঁ, তাতেই সুবিধা।'

—'পাশ করতে পারব না?'

—'আশা-আকাঙ্ক্ষা করতে দোষ কী?

—'কেমন যেন উদাসীন তুমি।'

—'কেন?'

—'উৎসাহ দেবার নামগন্ধও নেই।'

—'তোমার হৃদয়েই তো যথেষ্ট রয়েছে।'

—'এই বলেই তুমি খালাশ?'

—'বইও এনে দেব বইকি।'

অঞ্জলি বিছানার এককোণে মাথা কাত করে—'আচ্ছা আমার জীবনটাকে কলে ধরা ইঁদুরের মত বললে কেন?'

—'তেমনি বেদনা পাচ্ছ বলে মনে হয়।'

—'কলের ইঁদুরের মত?'

—'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা আমাদের বেদনায় বিধাতা কষ্ট পান না?'

—'কলের ভিতরকার ইঁদুর দেখে শিশুরা কি কষ্ট পায়?'

—'বিধাতা কি তেমনি না কি?'

—'সৃষ্টির নিদারুণ বেদনা ও নিষ্ফলতার চারদিকে তার আকাশ আলো-জলের প্রসন্ন শিশুর মত হাসি দেখে সেই কথাই তো মনে হয়।'

—'আমাকে টেক্সট ও নোটগুলো কিনে দিতে হবে শিগগিরই।'

—'আচ্ছা।'

—'কী করে কিনে দেবে?'

—'বাবাকে বলব।'

—'তিনি যদি বিরক্ত হন।'

—'আমার আংটিটাও বিক্রি করতে পারি।'

—'ছি, বিয়ের আংটি—কেন বেচবে?'

—'তুমি পাশ করে মাস্টারি করলে না-হয় আর-একটা গড়িয়ে দেবে।'

—'কিন্তু এর সঙ্গে একটা স্মৃতি মিশে রয়েছে যে।'

—'কিসের স্মৃতি, অঞ্জলি ?'

—'বাঃ আমাদের বিয়ের !'

—'তা না-হয় আর-একটা বিয়ে করা যাবে—আর-একটা আংটি পাওয়া যাবে।'

—'কে আর-একটা বিয়ে করবে ?'

—'আমি।'

—'কাকে ?'

—'অন্য আর-একজন মেয়েকে—'

—'তা তুমি যা খুশি করো—'

—'করব বই-কি, করাই তো উচিত। প্রেম জিনিশটাকে না বুঝে পৃথিবীর থেকে বিদায় নেওয়া কি ভাল ?'

—'তা তুমি যা খুশি তাই বলো', একটু চুপ থেকে, 'তুমি মনে করেছ আর-একটা বিয়ে করলেই প্রেমের সাক্ষাৎ পাবে।'

—'প্রেমের সাক্ষাৎ পেয়ে তবে তাকে বিয়ে করব।'

—'এমনই যদি বুঝেছিলে তাহলে অপ্রেম নিয়ে আমাকে বিয়ে করলে কেন ?'

—'আমি তো অপ্রেম আনি নি।'

—'ও, আমি বুঝি এনেছিলাম ?'

একটু চুপ থেকে—'আমি মরলে পর তবে বুঝবে।'

—'কী বুঝব ?'

—'বুঝবে যে দ্বিতীয় বার বিয়ে করা কত বেদনার জিনিশ।'

—'কেন, বেদনা কিসের অঞ্জলি ?'

—'আমি যে চার বছর তোমার সঙ্গে কাটিয়ে গেলাম এ স্মৃতি ইহজীবনেও মুছে ফেলতে পারবে না। দ্বিতীয় কোনো নারীর দিকে তাকানোও তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। স্মৃতিই তো আমাদের ব্যথা দেয়। বাধা দেয়।'

—'যে স্মৃতি বিরস তা ব্যথা দেবে কেন ?'

—'কিন্তু আমার স্মৃতি বিরস বলে মনে হবে না তো তোমার ?'

—'হবে না ?'

—'সেদিন বুঝবে এ চার বছর কত মমতায় ভরে রেখেছিলাম আমি—প্রেম থাকুক আর নাই থাকুক—নারীর অভিমান ও অহঙ্কার এই রকমই।'

—'একশটা টাকা পেয়েছি আমি অঞ্জলি—'

কাত হয়ে শুয়েছিল, হয় তো ঝিমুচ্ছিল, চোখ মেলে উঠে বসে চোখ বিস্তারিত করে বললে—'কী হয়েছে ?'

—'কিচ্ছু না।'

—'আ, বড্ড ঘুম আসছিল।'

—'ঘুমোও আবার।'

একটা হাই তুলে ভুরু কুঁচকে—'টাকা পেয়েছ ?'

—'স্বপ্ন দেখলে না কি ?'

—'কত টাকা পেয়েছ বল ?'

—'আলোটা আনো।'

—'এখানে আনতে হবে ?'

—'হ্যাঁ, এই বিছানার উপরই নিয়ে এসো।'

লণ্ঠনটা বিছানার উপর রেখে—'ঘুমের চোখে শুনলাম একশ টাকা পেয়েছ—ফাঁকি দিচ্ছ না তো ?'

—'আচ্ছা তুমি ক্ষেপেছ অঞ্জলি। একশ টাকা পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব কখনো ?'

—'তা হলে হয় তো ঘুমের চোখে নিজের মনেই কী না কী শুনলাম ; আচ্ছা, এ-রকম ঘুমের ভিতরেও টাকার কথা মনে হয় কেন ?'

—'আমারও তো মনে হয়।'

—'দীনতা আমাদের অনেক দূর পৌঁছেছে।'

—'তাই তো দেখছি।'

খানিকটা শূন্য, খানিকটা লুব্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে অঞ্জলি—'মাগো, আমার মন সায় মানছে না। স্বপ্ন আমি দেখি নি ; তোমাকেই আমি বলতে শুনেছি।'

—'কী বলেছি ?'

—'একশ টাকা পেয়েছি বললে।'

একটু হেসে—'ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে যখন শুনছিলে তখন লাখ টাকার কথাই বা

শুনলে না কেন ? ছি, তোমার বড্ড ছোট নজর অঞ্জলি ।'

—'স্বপ্ন আমি দেখি নি তো। আমি নিজের মুখেই তোমাকে বলতে শুনেছি। আমি বেঁচে আছি এ যেমন সত্য, শুনেছি যে তাও তেমনি সত্য। টাকা পেয়েছ ভালই ; যে যারটা উপভোগ করবে ; পরেরটায় কে ভাগ বসাতে যাবে ! টাকার বেলা স্ত্রী তো মানুষের পর ।' বলে বিমুখভাবে মুখ ফিরিয়ে রইল। খানিক ক্ষণ পরে মুখ ফিরিয়ে —'কে পাঠাল টাকা ?'

অন্ধকারের ভিতর চুপ করে ছিলাম।

—'তোমার বাবা তোমাকে দিয়েছেন ?'

—'না।'

—'তবে বাইরের থেকে কেউ পাঠাল বুঝি ?'

কোনো জবাব দিলাম না—

—'আমার বাপের বাড়ির থেকে পাঠিয়েছে না কি ? আমার নামে ?'

—'না, তোমাকে কেউ পাঠায় নি ।'

একটা শূন্য নিঃশ্বাস ফেলে অঞ্জলি—'তা আমি জানি ; বাবা মরে যাবার পর আমার খবর নেওয়ার মতো লোক কেই-বা আছে পৃথিবীতে ।'

চুপচাপ বসে রইলাম দু জনে।

অঞ্জলি—'শ্রীবিলাস চলে গেছেন ?'

—'কোথায় ? নাগপুরে ? না।'

—'এখানেই আছেন ?'

—'হ্যাঁ।'

—'তিনিই টাকাটা দিলেন বুঝি তোমাকে ?'

—'না, শ্রীবিলাস কেন দেবে ? আমিই বা নিতে যাব কেন ?'

একটু চুপ থেকে—'তাও তো ঠিক ।'

খানিক নিস্তব্ধ থেকে —'শুনেছিলাম চন্দ্র তো এখানে নেই ।'

—'না, সে চলে গেছে ।'

—'যে-রকম ভালবাসা তোমাদের দু জনের, সেখান থেকেই পাঠাল বুঝি ?'

—'কে ? চন্দ্র ? না—সে পাঠায় নি ।'

—'টাকাটা কি তা হলে আকাশ থেকে পড়ল ?'

একটু হেসে—'অনেকের কপালে তাও তো পড়ে। কিন্তু আমাদের কি সে

রকম কপাল আছে ?'

—'আচ্ছা কলকাতায় খবরের কাগজে যখন কাজ করতে তখন কি কিছু মাইনে বাকি ছিল তোমার ?'

—'না তো।'

—'ঠিক মনে আছে তোমার ?'

—'ঠিক।'

—'টিউশন তো মাসে-মাসে করতে ?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেউ টাকা ফেলে রাখে নি ?'

—'না।'

—'কোথাও শেয়ার কিনেছিলে ?'

—'না।'

—'কেউ টাকা ধার নিয়েছিল ?'

—'মনে তো পড়ে না।'

—'লটারিতে চার আনার টিকিট কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিলে না কি ? এখানে বসে লটারি খেলছ ?'

—'এইবার থেকে পাঠাব ভাবছি।'

—'টাকাটা তবে কোত্থেকে এল ?'

—'ঘুমোচ্ছ না কি ?'

—'না, ভাবছি—'

—'কী ভাবছ ?'

—'ভাবছি তুমি যদি টাকাও পাও তাহলেও তাতে আমার ব্যক্তিগত কোনো লাভ নেই।'

—'কী রকম ?'

—'তা তোমার নিজের উপভোগের জিনিশ শুধু।'

—'আমার বিছানার চাদরের দিকে তাকালেই আমার জীবন উপভোগের কথা বুঝতে পারবে। তোমার চাদর-বালিশ কাপড়-চোপড় আমার চেয়ে ঢের পরিষ্কার—জীবনটাও খানিকটা পরিপাটি। কী বলো তাই না অঞ্জলি ?'

—'নাও—টাকাটা দাও—'

—'তোমাকেই দিতে হবে ?'

—'তবে আবার কার কাছে দেবে ?' হাত বাড়াল।

পকেট থেকে রজনীকান্তর চিঠিটা বের করে—'এইটে পড়ে দেখো।'

— কী, এ তো নোট নয়।'

—'না।'

—'চেক্ ?'

—'না। একখানা চিঠি।'

—'আমি তোমার কাছে একশ টাকা চেয়েছি।'

—'চিঠিখানাই আগে পড়ে দেখো না।'

মনোযোগ দিয়ে চিঠিখানা পড়ে অঞ্জলি—'এতক্ষণ আমাকে বলো নি কেন ? তুমি লাক্ষার ব্যবসায় ছিলে ?'

—'না।'

—'একশ টাকা ওকে ধার দিয়েছিলে বুঝি ?'

একটু চুপ থেকে 'না তাও দেই নি।'

—'এই যে লিখেছেন।'

—'ও ভুল লিখেছেন।'

—'আবার রং করতে আরম্ভ করলে বুঝি ?'

—'না, এ বেলা আমি ঠিকই বলছি।'

—'কিন্তু এ হাতের লেখা তো তোমার নয়।'

—'হাতের লেখা রজনীকান্তর।'

—'এ রকম ব্যবসায়ী লোক সজ্ঞানে এ-রকম ভুল করবেন ?'

—'করেছেন তো।'

—'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

—'আসে যায় না কিছু তাতে।'

—'টাকাটা কোথায় ?'

—'দিচ্ছি।'

—'আরো ছত্রিশ টাকা পাঠাবেন তো—'

—'তাইতো লিখেছেন।'

—'সেটাও আমাকে দিতে হবে।'

—'পাঠালে দেব বইকি।'

—'এ টাকাগুলো আমি আমার কাছে রেখে দেব।'

—'দিও।'

—'দরকার মত খরচ করব। আমার কতকগুলো দরকারি বই কিনব।'

—'বই তো ছেলেদের কাছ থেকে পেতে পার।'

—'যদি না পাই? আর তোমার জন্য একটা স্কচ ইমালশন কিনতে হবে।'

—'আমার জন্য?'

—'হ্যাঁ, কী চেহারাটা হয়েছে তোমার; একটা টনিক না খেলে চলবে না তো। আমার মনে হয় মাঝে-মাঝে তোমার জ্বর হয়।'

—'একটা থার্মোমিটার কেনো।'

—'তা কিনব বইকি। তোমাকে দুটো-দুটো বালিশ তৈরি করে দিতে হবে, আর একজোড়া কাপড় কিনে আনতে হবে তোমার জন্য। একেবারে অমানুষের মতো দিন কাটছে যে।'

—'জুতো?'

—'জুতো ছিঁড়ে গেছে তোমার?'

—'হ্যাঁ—'

—'আচ্ছা, ছত্রিশ টাকা এলে তা কিনে দেওয়া যাবে।'

—'একশ টাকা দিলাম।'

পরদিন অঞ্জলিকে [দিয়েই বোধ করি] দেখলাম আমার কাপড়, শার্ট, নিজের কতকগুলো বই, নোট, একটা শাড়ি, নাগড়াই একজোড়া, ভাল সাবান, পাউডার ও আমার কডলিভার অয়েল ইমালশনটা পর্যন্ত এনে হাজির।'

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর নিজেই দুধ এনে ইমালশন তৈরি করে আমাকে খাওয়াল।

মাথা হেঁট করে নিস্তব্ধ হয়ে ভাবছিলাম।

তাকিয়ে দেখলাম থার্মোমিটার নিয়ে এসেছে। আমার টেম্পেরেচার দেখছে। টেম্পেরেচার অবিশ্যি সাতানব্বই ডিগ্রি উঠল।

—'কত টাকা খরচ হল অঞ্জলি?'

—'বেয়াল্লিশ টাকা শোয়া সাত আনা—'

—'তোমার জন্য একটা টনিক কিনেছ ?'

—'আমার জন্য আবার কী ?'

—'বাঃ, তোমারই তো দরকার—সন্তান হবার পর থেকে সেই যে সূতিকা ধরেছে, কিছু হজম হয় না, দড়ির মতো চেহারা হয়ে গেছে তোমার, যে দেখে সেই আক্ষেপ করে, পয়সা ছিল না, আমি এতদিন চুপচাপ করেই ছিলাম—আজ আমাকে একটু আক্ষেপ করতে দাও অঞ্জলি—বিকেলে বেড়িয়ে ফিরবার সময় একটা টনিক নিয়ে আসব।'

—'আমি যদি না খাই ?'

—'তবুও আমি আনব।'

—'এনে পয়সা নষ্ট করবে ?'

—'পয়সা নষ্ট হবার ভয়ে-ভয়েই ওষুধটা তুমি খাবে।'

অঞ্জলি মাথা হেঁট করে ছিল।

—'জীবনের সুস্থতা ও আনন্দকে আমরা চিনি না ; কিন্তু পয়সাকে তো চিনেছি। ওষুধটা খেলে শরীর ভাল হবে, শরীর ভাল হলে পৃথিবীটাও খানিকটা ভাল লাগবে, এ-সব বিচার আমরা বিলাসীদের জন্য রেখে দিয়েছি। কিন্তু পয়সা দিয়ে ওষুধ কিনে সেটাকে পচে যেতে দেখলে টাকার বেদনা আমাদের কামড়ে আর আস্ত রাখবে না ; না খেয়ে ওষুধের শিশি ফেলে রাখার জো আছে আমাদের ?'

একটু চুপ থেকে—'আচ্ছা এনো টনিক ; কিন্তু এত দুধ পাবে কোথায় ?'

—'না হয় জল দিয়ে খেও।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে অঞ্জলি—'ঐ জামাটা দেখেছ ?'

—'কোথায় ?'

—'ঐ যে খাটের ওপর সাদা খদ্দরের ওপর সবুজ-সবুজ ফুল কাটা ?'

—'ওটা খুকির জামা নয় ?'

—'হ্যাঁ—দেড় বছর বয়সের সময় এই জামাটা পরে সারা ঘর সে হেঁটে বেড়াত।'

—'কাঁদছ ?'

—'আমার কাছে কত লজনচুশ চেয়েছে—দিয়েছি শুধু অনাদর আর অক্ষমতা ;

মাঝে-মাঝে চুরি করে এনে এক-আধ টুকরো গুড়। আজ যখন এত জিনিশের ব্যবস্থা হচ্ছে তখন সে নেই। লক্ষ্মীটি, দেখো তো গিয়ে ঐ জামাটার ভেতর সে আছে কি না।'

চুরুটের ছাই, ধুলোবালি, ছারপোকার রক্তমাখা আমার বিছানার উপর সারাদিন সে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

সারাটা দিন।

(যখন জেগে উঠল, তাকিয়ে দেখল জামাটা নেই সেখানে আর।)

—[?] ডেলোরোজা যখন বিছানায় পড়েছিল ধীরে-ধীরে জামাটা তুলে আমি আমার বাক্সের এক কোণে রেখে দিয়েছি। রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকবে—মাঝে-মাঝে জামাটা খুলে এক-একদিন দেখব আমি ; জীবনে এই এক গভীর ঐশ্বর্য রয়ে গেছে।

দু-তিন দিন পরে।

অঞ্জলির একখানা বই-এর মধ্যে এই দুখানা চিঠি পেলাম।

দুখানা চিঠিতেই তারিখ দেওয়া আছে, আট-দশ দিন আগের তারিখ।

প্রথম চিঠিখানা অমলের।

লিখেছে :

তোমার সঙ্গে প্রায়ই তো দেখা হয়—যখন খুশি তখন যেতে পারি—কথাও অনেক দূর পর্যন্ত চলে।

কিন্তু তবুও এক-একটা ব্যাপারকে আশ্রয় করে মানুষের হৃদয় মাঝে-মাঝে কেমন নিস্তব্ধ হয়ে ওঠে—বড় নিগূঢ় হয়ে দাঁড়ায়। সেই জন্যই মানুষ ডায়েরি লেখে ; কবিতা লেখে ; চিঠি লিখবার প্রয়োজন বোধ করে। পৃথিবীতে অনেক গভীর রচনার ইতিহাসের পেছনেও…।

মুখে না বলে তোমাকে আজ আমি লিখছি তাই।

এ চিঠিখানা পড়ে তুমি কি বিস্মিত হবে—দুঃখিত হবে—কিংবা আঘাত পাবে ? যদি পাও তাহলে আমাকে ক্ষমা করো। অনেক বিবেচনার পর তোমাকে আমি লিখছি। কয়েকদিন সারারাত জেগে-জেগে বিচার করেছি বসে-বসে একটুও ঘুম হয়নি আমার। আমার পিতাকে দাহ করবার জন্য নিয়ে যাবার

সময় তাকে মৃত ছাগল ভেড়া কুকুরের স্তূপের ভিতর ফেলে রেখে যাবার আইন যদি আমার উপর জারি হয়, তাহলে মন যেমন বিচলিত হয়, হৃদয়ের শেষ লঘুত্বটুকুও বাষ্পের মতন মিলিয়ে যায় যেমন, সমস্ত বিরুদ্ধতাকেও উপেক্ষা করে মন যেমন তার গভীর আন্তরিক সম্বন্ধ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে পড়ে তোমাকে চিঠি লিখবার আগেও হৃদয় আমার সেই নিবিড় আশীর্বাদের আস্বাদ পেয়েছে। সেই আস্বাদের ভিতর থেকেই এই চিঠিখানার জন্ম।

আমি নিবৃত্তিকেই ভালোবাসি; বয়স আমার ত্রিশের কাছাকাছি হয়ে এল প্রায়; কিন্তু মনের স্থিরতা আমার সত্তর বছর বয়সের মানুষের মত, তারই মতন, মনে হয়, আকাঙ্ক্ষার সমস্ত রংই চেনা হয়ে গেছে যেন।

অখাদ্য মাংস খেয়ে উঠবার পর মনটা যেমন বিগড়ে থাকে, নিরপরাধ বৈরাগীর মুখ দেখতে ভাল লাগে, তাঁর গান শুনে আনন্দ পাওয়া যায়, তাঁর একতারা।

এ জীবনের পথে চলতে গিয়ে আমার অবস্থাও হয়েছে তাই। মনে হয় যেন পূর্বজন্মে রক্তমাংস নিয়ে যথেষ্ট যথেচ্ছাচার হয়ে গেছে—এই জন্মে তাই হৃদয় জীবনের অন্য আর-এক পিঠ দেখবার অবসর পেল।

কোন পিঠ বড়, কোন পিঠ ছোট, আনন্দ ও সৌন্দর্যের পাদপীঠই-বা কোনটা সে সব বলবার ভরসা আমি রাখি না। এই শুধু বলতে পারি যে জীবনের পথে এবার কোনো উত্তেজনা নেই, ধুলা কাঁকরের দীর্ঘ অবৈধ পথে হেঁটে রক্তাক্ততা নেই, সে সব চিন্তা ও কল্পনা মাথার ভিতর কৃমিকীট জন্মায় নি। আমি আছি—আমার লম্বা ছিপছিপে আর্যাবর্তের সন্ন্যাসীর মতো এই শরীরখানা, এই বলে কেদারের পথে হাঁটবার কোনো প্রবৃত্তি নেই, যদিও ছাদে পাইচারি করেই বুঝি—আমি রয়েছি, ঘাস রয়েছে, উষা রয়েছে, আকাশ রয়েছে, নক্ষত্র রয়েছে; বিধাতাকে বিশ্বাস না করেও মনের শান্তি নষ্ট হয় না, প্রার্থনা না করেও মৃত্যুকে জয় করবার জন্য কোনো অমৃত রচনা করবার দরকার হয় না, অন্ধকারে একদিন ফুরিয়ে যাব যে এই জেনেই ঢের গভীর আশ্বাস।

নিশ্চিন্তিকেই ভালবাসি আমি। কিন্তু এই যে চোখের সামনে দিনরাত ছেলেদের দেখি—শ্রাবণ রাতের—কী বলব? ব্যাঙের মতন? হাঁ, ব্যাঙের মতনই—শ্রাবণ রাতের প্রান্তরের ভিতর ব্যাঙের মতন তৃষ্ণা ও আসক্তির

জয়গান গাইছে একবার, অতৃপ্তি ও বেদনার পরাজয়ের তিক্ততায় তীব্রতায় কলরব করে উঠছে আরেকবার। এদের আমি ঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। হয়তো এরাই সত্য—আমিই মিথ্যা।

সত্য কী জানা বড় কঠিন।

কিন্তু তবুও শ্রাবণের কান্তারে প্রান্তরে পুকুরের পাড়ে ধানক্ষেতে উলুঘাসের ভিতর বর্ষার অবিরাম তীব্রতা ও বাদলের মর্মস্পর্শী কুয়াশার ভিতর ক্ষুধা ও খেদ, অধীরতা ও ব্যথা নিয়ে যে-জীবন—যে-জীবনপথের উপর আদিম যুগের চুম্বন রয়েছে, মধ্যযুগেরও, আধুনিক যুগেরও, সেই জীবনের পথে কোনোদিন চলি নি আমি, চলবার রুচি নেই আমার। এর আগে কোনো নারীকে আমি চিঠি লিখি নি, এক সেই মেদিনীপুরের কমললতা ছাড়া। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে কোনো নারীর সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক নেই আমার। কোনো বৈধ সম্পর্কও নেই: অনেক আগেই আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল—কিন্তু এখনো তো আমি বিয়ে করি নি।

চেহারার ভিতর আমার শ্রীহীনতা আছে বলে মনে করি না। নিজের চেহারার জন্য আমি লজ্জিত নই। আমার মন বিচার-ও কল্পনাবিমুখ নয় হৃদয় প্রেমহীন নয়।

পৃথিবীতে মানুষের ভিড়ের ভিতর নিঃসঙ্কোচে অনেকবার গিয়ে দাঁড়িয়েছি আমি; যতদিন বেঁচে আছি বার বার গিয়ে দাঁড়াব আশা করি—নিঃসঙ্কোচেই। আমি তাদের মধ্যে গিয়েছি বলে কেউ লজ্জা ও গ্লানি বোধ করে নি কোনো দিন। কিন্তু তবুও অনেক বারই আমার মনে হয় পৃথিবীর পথে বারবার গিয়ে কী লাভ—যে-জিনিশ সত্য সুন্দর জীবনের প্রয়োজনে সবচেয়ে প্রিয়তম ও নিকটতম এমন কোনো জিনিশকে নিয়ে···

কিন্তু এ-রকম জিনিশ বড় একটা পাওয়া যায় না।

এক পেয়েছিলাম সেই মেদিনীপুরের ভিখিরিনীর মেয়ে কমলতাতে। যখন তাকে দেখি তখন তার যক্ষ্মা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে রুগির মতন বিছানায় শুয়ে থাকত না সে। যাক, সে অনেক দিন হয় মারা গেছে।

আর-একবার পেয়েছিলাম আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটা কুকুরকে। শীতের রাতে রাস্তা দিয়ে ফিরছিলাম, এমন সময় দেখি একটা মিশন হাউসের থেকে একটা কুকুরকে ঠেঙিয়ে বের করে দেওয়া হচ্ছে। কুকুরটা বিলিতি

নয় অবিশ্যি—পথেরই একটা কুকুর। আমাকে দেখেও সে ভয়ে খ্যাঁক করে পিছিয়ে গেল; চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার পৃথিবীর প্রতি ঘৃণা আক্রোশ বা বিষ কিছুই নেই আর—আছে অবলোকিতেশ্বরের মতো মর্মস্পর্শী করুণা ও কাতরতা। কুকুরটাকে কয়েক পয়সার বিস্কুট ও রুটি কিনে দিলাম – কৃতজ্ঞ।

আমি তাকে সঙ্গে করে আমার বাসায় নিয়ে গেলাম, দিনরাত আমার বাসায়ই থাকত, কুকুরটার গলায় বগলেশ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, বগলেশ জিনিশটা ভালও বাসি না আমি; একদিন কুকুরটাকে অনেকক্ষণ দেখতে পেলাম না; রাস্তায় পায়চারি করতে-করতে দেখি মিউনিসি-প্যালিটির একজন ধাঙড় কুকুরটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—মড়া যে তা বোঝাও যায় না—কিন্তু শুনলাম বগলেস ছিল না বলে গুলি করে মারা হয়েছে।

আর-একবার পেয়েছিলাম মায়ের এক ফটোগ্রাফ—মা অনেক দিন হয় মারা গেছেন। বাবার ঘরে তাঁর যে ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট আছে বরাবর সেইটে দেখার অভ্যাস। কাজেই একটা পরিত্যক্ত বাক্সের এক কিনারে এই ফটোটা—মা যবে বিয়ে করে এসেছেন তখন, সেই সময়কার একটা ফটো—ফটোটা যখন পেলাম তখন মনে হল ঠিক এই জিনিশই আমি চেয়েছিলাম; জীবনপথের এই সংগ্রহটা আমার খুব ভাল হল। যথেষ্ট সাহায্য ও সমবেদনা পাওয়া যাবে, সান্ত্বনা ও শান্তি। আর-একবার লাভ করেছিলাম আমার ছোট বোন—তিন বছর বয়সের সময় সে মারা যায়—তার একজোড়া ছোট্ট জুতো; ঘরের এক কোণে অন্ধকারে খাটের নীচে অনেকদিন হয় পড়ে ছিল, প্রায় দশ বছর, ধুলো-ময়লায় বিরস, মাকড়সা ও পোকার বাসা, জুতো, না এটো মরা ছুঁচো, তখন দেখে বুঝবার জো নেই। কিন্তু ঝেড়েপুঁছে আলোর ভিতর এনে যখন রাখলাম তখন অনেকখানি লাভ হল। এ ঐশ্বর্যও চিরকাল আমার সঙ্গে থাকবে। দেখলাম, তারপর এই বিশ বছর পরে, তোমাকে।

তোমাকে দেখলাম। আমার মায়ের ফটোগ্রাফটা, মেদিনীপুরের সেই কমললতা, সেই কুকুরটা, আমার বোনের জুতো জোড়া, তোমাকে দেখে জীবনের এই সব বিগত জিনিশ আমার ভেসে যায় নি, কিংবা অর্থহীন হয়ে ওঠে নি, তাদের সান্ত্বনা ও সৌন্দর্য আরো ঢের বেড়ে গেছে বলে মনে হয়।

কাজেই তোমার মূল্য যে কত অকৃত্রিম গভীর ভাবেই বুঝতে পারি আমি তা।

তুমি বলতে পারো, সবই তো শুনলাম, তুমি আমার কাছে আসছ-যাচ্ছ, কথা বলছ, বেশ এই রকমই থাক না কেন। আমি তোমাকে বাধা দিচ্ছি না। এ-রকম ভাবে চিঠি লিখবার দরকার তবে?

এই সব তুমি বলতে পারো।

না, তুমি বাধা দিচ্ছ না; যখন খুশি তোমার কাছে যাচ্ছি; অনেক দিন দূর থেকেও তোমাকে দেখতে পাই কার্তিকের সন্ধ্যার ধূসরতার ভিতর পল্লীর দুঃখিনী রূপসীর উনুনের খানিকটা নরম ধোঁয়ার মত শাড়ির আঁচল তোমার ধীরে-ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঠিকই এই রকম যদি দেখতে পারতাম চিরকাল—তা হলে এ চিঠি লেখার প্রয়োজন বোধ করতাম না হয়তো। কিন্তু জীবনের অন্ধ ব্যবস্থা বড় কঠিন; ভবিতব্যতা কাউকে কারো কাছে বেশিক্ষণ রাখতে দেয় না; হৃদয় ও হৃদয়ের ভিতর যে, সামান্য সূত্রটি ব্যবধানের মত আছে, দেখতে-দেখতে তা সমুদ্রের মতন অলঙ্ঘ্য ও ক্ষমাহীন হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের জীবনের এই রীতি। অঞ্জলি, তুমি কি জানো না? নিশ্চয়ই জানো। হয়তো তুমি বলতে পারো—অধীর হয়ো না, একটু শান্ত হয়ে অপেক্ষা করো। এই মানুষের যত ব্যবধানকেই তারপর একদিন স্বাভাবিক ও নিরাপদ বলে মনে হবে। এই রকম ব্যবধান হয়ে গেছে বলেই শান্তি বোধ করবে, আনন্দ পাবে; জীবন যে-রাস্তায় চলে তার নিগূঢ় মানে বুঝতে পেরে তাকে ক্ষমা করবে, ভালবাসবে এই রকম বলতে পারো তুমি।

তোমার আগেও অনেকে অনেককে এই রকম কথা বলেছে। আমি নিজেও অনেক সময় ভাবি—জীবনে যখন এত অদ্ভুত জিনিশই ঘটে গেল তখন এই রকম বিপর্যয়ের মুহূর্তও যে না আসতে পারে তা তো নয়।

একদিন হয়তো এই বিপর্যয়ই হবে।

কিন্তু তবুও সেই শীত, [সেই] অন্ধ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে শান্তি পাব না সেদিন, আনন্দ পাব না; জীবনের ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে নেবার কোনো পথ খুঁজে পাব না।

আমি তোমাকে বলি অপেক্ষা করে, বিবেচনা করে—এক দিন নয় অনেক

দিন বসে—আমার এই কথাগুলো ভাল করে উপলব্ধি করে দেখো তুমি।
তুমি ভাবতে পারো, বলতেও পারো আমাকে, বেশ তো, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু আমরা যা আকাঙ্ক্ষা করি সবই কি পাই? পাওয়া উচিত নয়। অন্ধকারে মাথা হেঁট করে নিস্তব্ধ ভাবে চলে যাওয়াই তো ভাল, অনেক দূরে চলে যাওয়া। ভাল শুধু নয়—তা খুব সুন্দর। আমার নিজেরও অনেক সময় ইচ্ছা করে এই রকম স্নিগ্ধ উদাস পথে চলতে-চলতে অঘ্রানের বিকেলে নরম ম্লানতার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর থেকে ফুরিয়ে যাই। এই রকম কথা সব বলতে পারো তুমি।
যদি বলো, অসত্য বলবে না। অনেক মানুষ জীবনের একান্তে গিয়ে এই রকম নিস্তব্ধ ভাবে দিন কাটাচ্ছে। তাদের বেদনা সুন্দর। কিন্তু তবুও অনেক সময় তাদের নিস্তব্ধতা বড় স্থূল হয়ে ওঠে, কাদার ভিতর শূয়োরের মত নিজেকে নিয়ে বড় ভয়াবহ প্রতারণার খেলা করে তারা।
আমার কেমন ভয় করে।
আমি বড় দ্বিধা বোধ করি। শেষ পর্যন্ত এই পথেই কি ছেড়ে দেবে আমাকে?
তুমি হয়তো বলতে পারো—আমাকে কেন খুঁজে বার করলে তুমি? (আমি কি জানি না আমি কত অন্তঃসারশূন্য?) তুমি হয়তো আজ জানো না। কিন্তু একদিন বুঝবে—শিগগিরই বুঝবে একদিন সব। ফুটো হাঁড়ির মত আমিই-বা তখন কোথায় যাব? তুমিই-বা যাবে কোথায়?
নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখি নি বটে কোনোদিন; কিন্তু চোখ বুজে হোক, মাথা হেঁট করে হোক এদের পরিচয় টের পেয়েছি আমি। একজন সুন্দরীকে দেখে—তার কথাবার্তা অভিমান ও আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি করে আমার কেবলই মনে হয়েছে এই যে এর রক্তমাংসের পেছনে যে হাড় ক-খানা খটখট করছে একদিন চিতায় শুয়ে বেরিয়ে পড়বে যা সব, আজও যেন এর সমস্ত আমোদ-আহ্লাদ, আত্মতৃপ্তি—যাকে এ প্রেম বলে, আনন্দ বলে, মমত্বের ভিতর থেকে সেই জিনিশই ফুটে বেরুচ্ছে শুধু; আমি ধারণাই করতে পারি না যে এর ভিতর অন্য কিছু আছে। বাস্তবিক, একদিন আমি এদের দেখে ক্ষুধার উত্তেজনা মাঝে-মাঝে অনুভব করেছি শুধু, কামনার কষ্ট পেয়েছি, অন্ধকারে অবাক হয়ে ভেবেছি এই হাড় ক-খানার এত বিক্রম? যেদিন সে-বিক্রমকে

পরাজয় করতে পেরেছি সেদিনও শান্তি পাইনি। যেদিন পরাজিত হয়েছি সেদিন লাথি খাওয়া ঘেয়ো কুকুরের মত জীবনের মাটির পরিমাণের দিকে তাকিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে তো এতদিনের পরিচয়, কোনো অন্ধকার রাতে তোমার হাড়ের কথা মনে হয় নি, তোমার জিভ বের করে দেহকে জয় করবার কোনো কথা ওঠে নি, তার কাছে পরাজিত হবার কোনো প্রশ্নও মনে জাগে নি। তোমার কথা মনে করলেই মনে হয়েছে জীবনে মাটির পরিমাণ ঢের কাম্য—হয়তো তখন মাটি ফুরিয়ে গেছে, জীবনটা কিছুতেই কোনো মুহূর্তেই মৃতপ্রায় কুকুরের মত শিঁটিয়ে পড়ে থাকতে পারে নি আর। সম্ভবত আশ্বিন কিংবা কার্তিকের বিকেলের প্রসন্ন টানের মত আমাদের দুজনের জীবন, কিংবা চৈত্রের সন্ধ্যায় আঙিনার অপরাজিতার জঙ্গলের মধ্যে দুটো জোনাকির মত: চারদিকে তাদের অন্ধকার ও শিশিরের শান্তি, নিরপরাধ শান্তি; জীবনে এর চেয়ে বড় কথা নেই আর।

তুমি বলতে পারো নিরপরাধ হল কী করে? তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে [যাওয়া] যদি নিরপরাধ হয় তা হলে জীবনে অপরাধ কিছু নেই আর, এই বলবে তুমি।

আমাদের সেই সংসারের মানুষদের আগাগোড়া ইতিহাস যদি বিচার করে দেখি সেই আদিম কাল থেকে, বুঝব একটা কুৎসিত মাকড়সার মত শূন্যের ভিতর দিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে আমাদের জীবনপ্রণালী ভেসে চলেছে। এ জীবনপ্রণালীকে আমি কোনোদিনও শ্রদ্ধা করি না যদিও ব্যক্তিগত মানুষের বেদনা ও ক্ষতির কথা কী করে লঘু করা যায়, অনেক সময়ই নিঃসহায়ের মত ভাবি তাই। কিন্তু আমার কোনো কৃতকার্যে কারো ক্ষতি বা ব্যথার বোঝা বাড়াচ্ছি আমি—আমার বা তোমার জীবন সম্পর্কে এ রকম ব্যবস্থা নিয়ে কিছুতেই তৃপ্ত থাকতে পারব না; যে-শান্তির কথা বলেছি আমি তা আমার নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই তোমার অভাবে তোমার স্বামী যদি ক্ষতি ও বেদনা অনুভব করেন—অপর্যাপ্ত ক্ষতি ও ভূলুণ্ঠিত বেদনা—তাহলে এ জিনিসের এই দিকটাকে বিচার করে দেখতে হবে বই কি।

তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার বিশেষ কোনো ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও তাকে আমি উপলব্ধি করে দেখেছি।

'তুমি শুনলে হয়তো ব্যথিত হতে পার, হয়তো হবে না—কিন্তু আমি বুঝেছি, তিনি তোমাকে নিয়ে অতৃপ্ত। আমার মুখে এ কথা শুনে তোমার অভিমান হতে পারে, অহঙ্কারে বিক্ষুব্ধ হতে পারো তুমি, খানিকটা সময়ের জন্য অত্যন্ত বিমুখ হয়ে উঠতে পারে তোমার [মন] আমার প্রতি কিন্তু তবুও তোমার সঙ্গে এই চার বছরের সম্পর্ক রেখে বিয়ের আগের সেই বিশুষ্ক জীবনের কোনো সজীব আশাপ্রদ রূপান্তর হয়েছে বলে তাঁর মনে হয় না।

তা হবেই বা কী করে? তুমি তার জন্য নির্মিত হও নি—তিনিও তোমার জন্য না। দেখেছি বাইরের ঘরে ঠেলে দিয়েছ তাঁকে, যে বিছানায় তুমি শোও সেখানে বিবাহের পর ছ মাস মাত্র শুয়েছিলেন তিনি, ঝাড়ু হাতে রোজ তাঁকে নিজের ঘর ঝাঁট দিতে দেখি, নিজেই বিছানা পাতেন, নিজেই কাপড় কাচেন, জামার বোতাম লাগান, ছেঁড়া জামাও সেলাই করতে দেখেছি তাঁকে। তোমার মেয়েটি যতদিন বেঁচেছিল সেও তার বাবার কাছে থাকত। দেখলাম বিচ্ছিন্ন থাকতেই ভাল লাগে তোমার; জীবনের নিষ্ফলতাকে একবার বোঝা বলে মনে হয়, একবার মনে হয়, সুন্দর বিমর্ষতা। যখন স্বামী কাছে আসেন বিষণ্ণতাও তোমার কেমন স্থূল হয়ে ওঠে যেন। দিনান্তের অশ্বত্থের ভাঙা ডালে চাপা পড়া একটা বিকীর্ণ করবীর শাখার মত যখন সরে যান স্বামী, বিমর্ষতা তোমার রূপের মত মর্মস্পর্শী হয়ে ফুটে ওঠে। বিগত জীবনের স্বপ্ন দেখ তুমি। যা হয় নি, হল না, হয়তো হবেও না কোনোদিন—তাও হবে, কোনো-না-কোনোদিন হবে এই মিথ্যা আশ্বাসে কাল কাটাও তুমি।

তোমাদের দু জনের সম্বন্ধ এই রকম।

তোমার স্বামী সেদিন এই কটা লাইন পড়ে পড়ে আমাকে শোনাচ্ছিলেন:

I having a wife······says she

দেখলাম, তৃপ্তি তার আন্তরিক।

তোমরা যদি ইংলণ্ডের দিনমজুরের ঘরে জন্মাতে, তা হলে তোমাদের দু জনের অবস্থা হত ঠিক এই রকম।

কিন্তু এদেশে এই অবস্থার ভিতর জন্মগ্রহণ করে তোমরা আজীবন পরস্পরের সাথী থেকে কাটিয়ে দেবে—ডগডগে লাল পাড়ের শাড়ি পরবে, সিঁদুর পরবে, আলতা পরবে, শাঁখা ভাঙলে কষ্ট পাবে, নোয়াকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখবে,

অন্তঃপুরের ভেতর স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ করবে, বাইরে ঘোমটা ও নতদৃষ্টিকে নারীত্বের সবচেয়ে গৌরব বলে উপলব্ধি করে চলবে, বারবার শিহরিত হয়ে নিজেকে জননী বলে বুঝবে অথবা বিধবার থান পরবে, পাথরের থালে খাবে, আমিষ খাদ্য বর্জন করবে, একাদশী চলবে, তীর্থে-তীর্থে ঘুরবে। বুড়ো বয়সে রুদ্রাক্ষ ও নামাবলিও কি গলায় জড়াবে না? একটা ময়নাও পুষবে বটে। তারপর বৃদ্ধ বিধবা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে কবিরাজের বড়ি গিলবে হয়তো; একদিন খাটের থেকে উঠে কুলের আচার ও আমচুর খাওয়ার ব্যর্থ স্বপ্নে আজীবনের দাম্পত্যের সমস্ত ব্যর্থতা ভুলে যাবে তুমি।

তাই তো, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কাদার ভিতর দিয়ে, ধুলোর ভিতর দিয়ে, অন্ধকারের মধ্যে, কাঁকর ও কাঁটার পথ দিয়ে, সাপের গর্ত মাড়িয়ে, রক্ত ও অশ্রু মুছতে-মুছতে সেই পথ বেয়ে-বেয়েই তো চলেছে—সেই পথশেষের দিকে।

তোমাদের শিশুটি মরে গেছে; সে যদি বেঁচে থাকত তাহলে এত কথা লিখবার প্রয়োজন বোধ করতাম না আমি, কোনো কথাই লিখতে যেতাম না, তার কুয়াশাবাত অস্পষ্ট জীবনের প্রসন্ন বিকাশের পথে কাঁটার মত দাঁড়াতাম না এসে।

কিন্তু সে নেই।

তোমার স্বামীও তোমার জীবনে নেই।

তুমিও তার জীবনে নেই আর।

এক নিকট সান্নিধ্যে থেকেও তোমরা দু জনে পরস্পরের থেকে দূরে, যেন বহু দূরদূরান্তরে; দু জন তোমরা দুই বিচিত্র জগতে বাস কর; এক নক্ষত্রের থেকে আর-এক নক্ষত্রে যাওয়াও সহজ, কিন্তু তোমাদের হৃদয়ের ভিতর কোনো বিনিময়ের পথ নেই। এত কষ্ট দিচ্ছ কেন তাকে? তুমিও-বা কেন কষ্ট পাচ্ছ? মানুষ হয়তো ভাল বুঝেই সব কাজ করে: কিন্তু আকাশে-বাতাসে কারা থাকে—তার সমস্ত শুভবুদ্ধি ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষাকে পণ্ড করে দিয়ে যায়—যেখানে সহানুভূতির প্রত্যাশা করে সেখানে গিয়ে দেখে শুষ্কতা। যেখানে ভালবাসা চায় সেখানে পায় অভিনয়; সেখানে স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা করে সেখানে দেখে অবৈধ কলরবের হাট বসে গেছে—শেষ পর্যন্ত অসার মাটি এসে

সমস্ত জীবনটাকে ভরে ফেলতে থাকে।

মাটি এসে তোমার জীবনটাকেও যে ঘিরে ফেলেছে অঞ্জলি, এ কথা ভাবতে গেলে দুঃখ পাওয়ার কোনো জবাব খুঁজে পাই না আমি।

চলো, কোনো এক প্রান্তরে চলে যাব আমরা, গভীর রাতে সবুজ ঘাসের নিঃশ্বাস চারদিকে, মাথার উপর কখনো-বা গাঙশালিখের দল, কখনো শরতের নক্ষত্র। সেইখানে বাসা বাঁধব আমরা—

চিঠিখানা এর পর বাস্তব ঘর-সংসারের হিসাব-নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত।

সাড়ে তিনশ টাকা সম্বল করে অমল আপাতত এই নারীটিকে নিয়ে চলে যেতে যায়; দু-চার মাসের মধ্যে সাড়ে সাত হাজার টাকা আশা করে; ভবিষ্যতে আরো দেড় লাখ টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা রাখে।

অঞ্জলির এই সুন্দর স্বপ্ন—তার ভিতরেও এত টাকা-পয়সার হিশাব? চিঠিখানার শেষের দিকটা মনকে বড় পীড়া দেয়। প্রেমের পথে চলতে গিয়ে এত হিশেবের হুচোট বাদ দিলে হত না কি? বললে হত না কি—সবই তো বলেছি—এখন চলো।

কিন্তু নারীর কাছে বড়-বড় অঙ্কের হিশাবই যে সবচেয়ে সুন্দর জিনিশ, এই প্রেমিক ছেলেটি তাও জানে।

অঞ্জলির চিঠিখানা :

ভাই অমল,

তোমার চিঠিখানা পড়েছি। পড়েই এর এক উত্তর লিখে রেখেছিলাম, কিন্তু তুমি সেদিন আসনি—কাজেই তোমাকে তা দিতে পারিনি। সে চিঠিখানা তারপর আমি ছিঁড়ে ফেলেছি; সে চিঠিখানা পেলে বড্ড আঘাত পেতে। মানুষকে আঘাত দিয়ে কী লাভ? বিশেষত তোমার মত মানুষ, যার দেড় লাখ টাকার পৈত্রিক বিষয়ই শুধু নেই, বিচার-কল্পনাও বেশ আছে, লিখবার শক্তিটুকুও বেশ মানানসই।

বাস্তবিক শত চেষ্টা করেও তোমার মত লিখতে পারব না আমি। কবির

মত লেখ নি তুমি; লিখেছ হিস্টোরিয়ানদের মত; অবিশ্যি বড়দিয় হিস্টোরিয়ানদের কথা বলছি না আমি—ফ্রুড নয়, কার্লাইলও নয়—ধরো যেমন গিবন, কিংবা মমসেন। আমার মনে হয়, লিখবার অভ্যাস রাখলে, খুব পরিশ্রম ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে এ জিনিশ অনুশীলন করলে, বেশি বয়সে তুমি কয়েক ভলিউম চমৎকার ইতিহাস রেখে যেতে পারবে—ধরো, আমাদের দেশের বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে কিংবা মুসলমান আমল কিংবা মারাঠি আমল সম্বন্ধে।

তোমার চিঠিখানা সম্বন্ধে আমি ভাবছি।

তুমি আমাকে অনেকবার পড়তে বলেছ; অনেক দিন বসে, অনেক দিন অপেক্ষা করে উত্তর জানাতে বলেছ।

তোমার এই অনুরোধটুকু আমাকে রাখতে হবে। তুমি অনেক কথা লিখেছ—অনেক ভাববার কথা; আমার কল্পনা ঢের কম; উপলব্ধিও দুর্বল—তোমার এ চিঠিখানার নানা রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে ঢের দেরি লাগবে। তবে একটা কথা ঠিক। জীবনটাকে যদি গোলকধাঁধার মত মনে হয় কোনোদিন, তাহলে বুঝব সুন্দর শুভ কাম্য ও সহানুভূতির পথ নিয়ে অমল দাঁড়িয়ে আছে—তাকে ডাকলে হয়।

ডেকে বলব শতখানেক টাকার দারকার, ধার দিতে হবে, শোধ দিতে একটু দেরি হয়ে যেতে পারে কিন্তু অমল। কিংবা তুমি ততদিনে ডাক্তার হয়ে বেরুবে, বলব, আমার স্বামীর এই-এই অসুখ, তোমাকে একটু বিনে পয়সায় দেখে দিতে হবে।

আশা করি প্রীত হয়েই এমন করবে তুমি।

কিন্তু তবুও ভবিষ্যৎ তোমার জীবনে কোনো রূপান্তর আনবে বলতে পারি না।

তুমি কোথায় থাক তাই-বা কী করে জানব।

আমার শুভ আশীর্বাদ জেনো।

ইতি

অঞ্জলি

আপাত দেড় লক্ষ টাকার লোভ ছেড়ে দিয়েছে অঞ্জলি; তারও চিঠির বাকি কথাগুলো তার অভিমানের কথা—অভিনয়ও নয়, আন্তরিকতাও নয়। কেন

এমন অভিমান করল অঞ্জলি ? দারিদ্র্য ও নারীত্ব নিয়ে অহঙ্কার-অভিমান আমাদের এ দেশের এক ধরনের গৃহস্থবধূদের খুব ভাল লাগে। হয়তো এ চিঠিখানা লিখে বালিশে মুখ গুঁজে সে অনেক কেঁদেছে অমলকে ভালবেসে, আমাকে ঘৃণা করে না, নিজের নিঃসম্বল সংসার ও অজেয় নারীত্বের আড়ম্বরে।

দুদিন পরে রজনীকান্ত খাসনবীশের একখানা চিঠি পেলাম :

ভুল-প্রমাদ সকলেরই হয়। আমারও তাহা হইয়াছে। আমি কাগজপত্র পুনরায় নাড়াচাড়া করিতে গিয়া দেখিলাম তোমাকে যে একশত টাকা মানি অর্ডার করিয়া পাঠাইয়াছি উহা আমার ত্রুটি বশত প্রেরিত হইয়াছে। লাক্ষার ব্যবসা সম্পর্কে যাহার নিকট একশত টাকা ধার করিয়াছিলাম সে অন্য ব্যক্তি। তুমি নও। তোমার একখানা পুরানো চিঠি আমার দলিলপত্রের ভিতর মিশিয়া যাওয়াতে—এবং বৃদ্ধ বয়সে অনেক রাত্রি জাগিয়া কাজকর্ম করার দরুণ—কোনো কর্মচারী না থাকায়—এই রকম প্রমাদ মাঝে-মাঝে যদি ঘটে তাহাতে বিস্মিত বা অপদস্থ হইবার কিছু নাই।

তুমি পত্রপাঠ সম্পূর্ণ টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবা। কোনো বাধা করিবা না। বিলম্ব হইলে মহাজনী কারবারের খানিকটা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

কিমধিকমিতি

বশংবদ রজনীকান্ত খাসনবীশ

এ চিঠির অবিশ্যি আমি কোনো উত্তর দিতে গেলাম না। বেয়াল্লিশ টাকা সেদিনই অঞ্জলি খরচ করে ফেলেছে। আরো দশ-বার টাকা খরচ হয়ে গেছে। একশ টাকা কোথা থেকে পাঠাব আমি ? পাঠালে প্রথম দিনই পাঠিয়ে দিতাম।

এখন রজনীকান্তকে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রীবিলাসের বইখানা নিয়ে নিজের ঘরে বসেছিলাম।

বাবা এসে—'তোমার একখানা চিঠি দেখলাম।'

—'আমার ?'

—'হ্যাঁ—তোমারই তো।'

—'কোথায় ?'

—'কেন পিয়ন তোমাকে দেয় নি ?'

—'ওঃ, পোস্ট অফিসের চিঠির কথা বলছেন ?'

—'রাস্তায় পিয়ন আমার কাছে দিয়েছিল—আমি তোমার কাছে দিয়ে আসতে বললাম।'

—'হ্যাঁ, সে চিঠি আমি পেয়েছি।'

—'পোস্ট অফিসের চিঠি আমি পড়ে দেখলাম।'

—'ও, আপনি দেখেছেন বুঝি ?'

—'রজনীকান্ত কে ? কে তিনি ?'

—'লাক্ষা-তিসি-চা নানা রকম ব্যবসায় তার—'

—'তার সঙ্গে তোমার চেনা হল কোথায় ?'

—'কলকাতায়।'

—'কী সূত্রে ?'

—'এক সময় কয়েক দিনের জন্য আমাদের মেসে এসেছিলেন তিনি—আমার পাশের ঘরেই থাকতেন। তখন আলাপ হয়।'

—'তার ব্যবসায়ে কখনো তুমি সংযুক্ত ছিলে ?'

—'না।'

—'একশ টাকা ধার নিয়েছিলেন তিনি তোমার কাছ থেকে ?'

—'না।'

—'এ টাকাটা তুমি তার কাছ থেকে কোনো উপায়ে উপার্জন করেছিলে ?'

আবার মাথা নেড়ে—'না।'

—'কিছুদিন আগে তিনি তোমাকে একশ টাকা মানিঅর্ডার করে পাঠিয়েছিলেন ?'

—'ইনশিওর করে পাঠিয়েছিলেন।'

—'একশ টাকা ?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোনো চিঠি লেখেন নি ?'

—'কভারের ভেতরে চিঠি ছিল।'

—'কী লিখেছিলেন ?'

—'লিখেছিলেন, কলকাতায় লাক্ষার ব্যবসা করবার সময় বছর আটেক আগে আমার কাছ থেকে যে-একশ টাকা ধার নিয়েছিলেন এখন তা পাঠিয়ে দিচ্ছেন।'

—'কিন্তু এ ত তাঁর হিশেবপত্রের ভুল ?'

—'হ্যাঁ।'

—'টাকাটা পেয়ে তা হলে পাঠিয়ে দিলে না কেন ?'

চুপ করে ছিলাম।

—'টাকাটা কোথায় ?'

কোনো উত্তর দিলাম না।

—'টাকাটা আমাকে দাও। আজই আমি পাঠিয়ে দেব।'

—'সে টাকা তো অনেক খরচ হয়ে গেছে ?'

বাবা একটু বিস্মিত হয়ে—'কে খরচ করল ?'

—'আমিই।'

একটু চুপ থেকে—'বৌমাকে দিয়েছিলে তুমি ? সেও জানে তোমার যা-পাওনা নয় সেই জিনিশই তাকে তুমি খরচ করতে দিয়েছ ?'

—'না, তা সে জানে না।'

বাবা তারপর খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে, 'কী কিনেছ ?'

—'অঞ্জলি কয়েকখানা বই কিনেছে।'

—'কীসের বই ?'

—'বই ঠিক নয়, নোট, বি-এ পড়বে—'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে, 'এই শুধু—আর-কিছু কেনা হয় নি ?'

—'না, প্রায় ষাট টাকার মত খরচ হয়ে গেছে।'

—'যে-টাকাটা তোমার উপার্জিত নয়, তা দিয়ে, সেটা, এ-রকম করে খরচ করতে গেলে কেন তুমি ?'

একটু চুপ থেকে—'আর কী কিনেছ ?'

—'কাপড় দু জোড়া।'

—'কার জন্য ?'

—'আমার জন্য।'

—'পাট ভেঙেছ ?'

—'না।'

—'তা আমি ফিরিয়ে দেব।'

—'এক জোড়া জুতোও কিনেছি।'

—'তোমার জন্য ?'

—'আমার জন্য, অঞ্জলির জন্যও একজোড়া।'

—'ব্যবহার করা হয়েছে ?'

—'না।'

—'ফিরিয়ে দিতে হবে।'

—'শাড়িও পরে নি বোধ করি, কিনেই বাক্সে রেখে দিয়েছি।'

—'এই সমস্তই গুছিয়ে আমার কাছে দিতে হবে। আমি বিকেলেই ফিরিয়ে দিয়ে আসব সব।'

মাথা হেঁট করে বসেছিলাম।

—'বাকি যে-টাকা বৌমার কাছে রেখেছ তাও এনে দিতে হবে আমাকে, আমি কালই রজনীকান্তকে মানিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেব।'

বিকেলে বাবা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে স্কুল থেকে ফিরে এলেন। কিছু না-খেয়ে কাউকে কোনো কথা না বলেই বেরিয়ে গেলেন।

অনেকটা রাত করে ফিরে এসে আমাকে ডেকে, 'শোনো।'

তাঁর ঘরে গেলাম।

—'জিনিশপত্র এনে গুছিয়ে রেখেছ সব ?'

মাথা নেড়ে, 'না।'

—'বৌমার কাছে বাকি টাকাটা চেয়েছিলে ?'

—'না, তাও চাইনি।'

—'ভালই করেছ। আমার ভয় হচ্ছিল, তোমাকে বলে যাই নি, হয়তো চেয়ে বসবে। যাক, কোনো দরকার নেই। বৌমার কাছ থেকে তুমি শাড়ি বা টাকা ফিরিয়ে আনতে যাও নি যে, ভালই হয়েছে। যদি আমার নাম করে ফিরিয়ে আনতে সে আঘাত এই বুড়ো বয়সে আমি কখনো ভুলতে পারতাম না।

—'কোথায় গিয়েছিলেন আপনি ?'

—'লোন অফিশে !'

—'কেন ?'

—'আরো শতখানেক টাকা ধার করতে হবে তার ব্যবস্থা করে এলাম।'

—'আবার ধার করবেন ?'

—'ভয় নেই তোমার! সমস্তই আমি শোধ দিয়ে যাব। তোমাদের ঘাড়ে কিছু ফেলে যাব না। তিন হাজার টাকা ঋণ ছিল, এই পনের বছর বসে ষোল শ করে দিয়েছি, বাকি দিল চোদ্দ শ, রজনীকান্তর এই এক শ নিয়ে আবার হল দেড় হাজার, আমার বয়স এখন বাহাত্তর—আমি আট-দশ বছরের মধ্যেই এ টাকাটা শোধ করে দিতে পারব।'

—'আরো আট-দশ বছর কাজ করবেন আপনি ?'

—'বৌমা কোথায় ?'

—'রান্নাঘরে।'

—'রাঁধছে ?'

—'খাচ্ছে হয় তো।'

—'তুমি খেয়েছ ?'

—'না।'

—'যাই, আমিও খেতে যাই। স্কুল থেকে এসে আর-কিছু খাওয়া হয় নি। সকাল বেলা শকুনের মত আমি যে-সব কথা বলেছিলাম বৌমাকে বলেছ না কি ?'

—'না।'

—'খবরদার। কোনোদিনও বলো না—এ বুড়ো বয়সে আমি তা হলে বড্ড কষ্ট পাব।'

—'অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন ?'

—'না, লণ্ঠন লাগবে না।'

—'বৃষ্টি পড়ছে যে।'

—'এই তো রান্নাঘরে গিয়ে উঠলাম বলে।'

তুমি মনে করিয়াছ আইন অনুসারে কোনো স্টেপ না নিলে তুমি টাকা পাঠাইবে না। ভাবিয়াছ হয়তো আইনের সুব্যবস্থা আমার হাতে নাই—তোমাকে টাকা পাঠাইয়া দিয়াছি, সঙ্গে তোমার নিকট আমার ধার স্বীকার করিয়া একখানা চিঠির দলিলও দিয়াছি—অতএব তোমার কাজ সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা তুমি ভাবিতে পার বটে, তোমার উকিলও তোমাকে নানা রকম কুপরামর্শ দিবে। কিন্তু তবুও জানিও পৃথিবী এত সহজ জায়গা নয়। পরের বিষয় হস্তগত করিয়া খাইতে গিয়া রাজামহারাজারা কুপোকাত হইয়া গেল, তুমি চুনোপুঁটি হইয়া আমার চোখে ধুলো দিতে চাও। সভ্যতার কথা না-হয় ছাড়িয়াই দিলাম—বিবেক, চরিত্র, সাধুতা, ভগবান ও ধর্মের দোহাই দিয়া তোমাদের মত মানুষের নিকট অনুরোধ-উপরোধ করিয়া কোনো লাভ নাই।

অন্য বহুবিধ অস্ত্র আমার হাতে আছে। এই যে প্রত্যেকটি চিঠি তোমাকে লিখিতেছি : আমার বাঁ পাশে একজন পুলিশ অফিসার এবং দক্ষিণ দিকে একজন উকিল বসিয়া-বসিয়া প্রত্যেকটি চিঠির খশড়া স্ট্যাম্প দিয়া রেজিস্টারি করিয়া নিতেছে।

যাক, তোমার উপর অচিরেই নির্দয় হইবার বাসনা করি না। আরো কয়েক দিন সময় দিলাম। ইতিমধ্যে যদি আমার প্রাপ্য এক শত টাকা না পাঠাইয়া দাও তাহা হইলে আর কালক্ষেপ না করিয়া আমাকে নিজের হস্তেই আইন লইতে হইবে। রজনীকান্ত খাসনবীশ

পরদিন লোন অফিস থেকে বাবা সন্ধ্যার সময় ফিরলেন।

—'টাকা পেয়েছেন ?'

—'না।'

—'দেবে না ?'

—'দেবে বইকি।'

—'তবে ?'

—'একটু ঘুরিয়ে দেবে আর-কি।'

—'কিছু মর্টগেজ রাখতে চায় বুঝি ?'

—'হ্যাঁ, সেই রকমই ইচ্ছা ; কিন্তু মর্টগেজ দেবার মত কোনো জিনিশ তো আমার নেই।'

—'কেন এই বাড়িটা ?'

—'কত টুকুই-বা বাড়ি—আধা-আধি তো মর্টগেজ দেওয়াই হয়ে গেছে।'

—'বাকিটা ?'

—'তা হলে তোমরা দাঁড়াবে কোথায় ?'

বাবা দেওয়ালের ওপর ছায়া ফেলে খানিক ক্ষণ—সেই ছায়ার ভিতর থেকে সঞ্চারিত মানুষের মত বললেন—'না, তা হয় না।'

—'আবার যে চাদর কাঁধে নিলেন ?'

—'যাই, একটু তারিণীবাবুর কাছে।'

—'কেন ?'

—'দেখি, কোনো বিলিব্যবস্থা হয় কি না। এ বাড়ি আমি মর্টগেজ দিতে পারব না। তা হলে তোমরা মাথা গুঁজবে কোথায় ?

—'না খেয়েই যাচ্ছেন ?'

কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর অন্ধকারের মধ্যে বাহাত্তর বছরের বুড়ো মানুষ বেরিয়ে পড়লেন সেই মাইল তিনেক দূরে তারিণীবাবুর বাসার উদ্দেশে।

আমাকেও বেরুতে হয় তা হলে।

আধঘণ্টা পরে শ্রীবিলাসের আস্তানায় গিয়ে হাজির হলাম।

—'কী হে, বই ক খানা ফিরিয়ে দিতে এসেছ বুঝি ?'

—'না, বই-এর জন্য না—'

—'বই রেখে দেবার জন্যে ?'

—'না। ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'

—'আমি ও-সব বই পড়িটড়ি না, তবু মিছিমিছি টাকার মাল হারিয়ে লাভ কী ?'

—'তা তো বটেই।'

—'কাল সকালে এসে দিয়ে যেও।'

—'আচ্ছা।'

—'না যদি দাও, তা হলে আমাকেই মোটরে করে নিয়ে আসতে হবে।'

—'না। সে কষ্ট আর করবে কেন ?'

—'করতে হয় মাঝে-মাঝে ; দেনা-পাওনার ব্যাপারে নানা রকম চামারগিরি।'

—'তাই না কি ?'

—'এ ক্ষেত্রে চামার কিন্তু তুমি—'

আমি —'কেন, আমি তোমার বই ঠেকিয়ে রেখেছি না কি ?'

—'প্রথমত, জোর করে নিয়ে গেছ।'

—'জোর করে ?'

—'আমার দেবার ইচ্ছা ছিল না তো।'

—'কই, তা তো বল নি।'

—'কেন, তুমি কি মানুষের মুড স্টাডি করতে পার না, সবই কি মুখ ফুটে বলতে হবে।'

—'ও:, সেই কথা!'

—'প্রথমে তো বই-এর কেস খুলতে চাইলাম না, তবুও জোর করে খোলালে, তার পর—'

—'যাক গে, আজ রাতেই না হয় ফেরত দিয়ে যাব।'

—'চললে ?'

—'হ্যাঁ চললাম।'

—'বই আনতে ?'

—'হ্যাঁ ফেরত দিয়ে যাব।'

—'দিয়ে যাব বললেই তো হল না—আজ রাতেই চাই আমি।'

—'কেন, আজ তুমি চলে যাচ্ছ না কি ?'

একটা পয়েন্টার দিয়ে জানালায় আঘাত করে শ্রীবিলাস—'সে কথা তো হচ্ছে না, আজ রাতেই বই চাই আমি।'

—'একখানা কবিতার আর দুখানা পলিটিকসের বই, না ?'

গুম হয়ে একবার আমার দিকে তাকাল শ্রীবিলাস।

—'বেশ বই ; কবিতার বইখানা আমি পড়ছিলাম।'

পয়েন্টার দিয়ে জানালার গরাদে একবার আঘাত করল শুধু।

—'আচ্ছা যাই।'

অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু শ্রীবিলাসের কাছে এক শ টাকা ধার না পেলে কার কাছে পাব আর ?

মিনিট পনের পরে ঘুরেফিরে আবার এসে হাজির হলাম শ্রীবিলাসের কাছে—একটা নীল ঢাকনাওয়ালা উজ্জ্বল টেবিল ল্যাম্পের কাছে চুপ করে বসে-বসে সিগারেট খাচ্ছিল।

—'কে ?'

'আমি শচীন।'

—'বই এনেছ তুমি ?'

—'না, এখনো আনি নি। এই তো তোমাদের বাড়ির কাছে বটতলায় দাঁড়িয়েছিলাম।'

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সিগারেটটা ঝেড়ে নিয়ে—'কী মতলব তোমার, বলো তো দেখি !'

—'আমি এসেছি এক শ টাকা তোমার কাছ থেকে ধার করতে।'

একটু হেসে—'তোমাকে বিক্রি করলেও এক শ টাকা পাওয়া যায় ?'

—'বেশ, তোমার কাছে আমাকে বিক্রি করতেই রাজি আছি।'

—'বেশ, আমার জুতো বুরুশ করে দিতে পারবে ?' পা বাড়িয়ে দিল।

একটু হেসে—'বুরুশ কোথায় ?'

—'জুতোবুরুশকে তো তা বলে দিতে হয় না।'

উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, আবার বসলাম।

বললাম 'ব্যাপারটা কী হয়েছে শুনবে শ্রীবিলাস ?'

—'কোনো দরকার নেই আমার শুনবার।'

-'শুনতে অবিশ্যি তুমি পারতে।'

'কিছু দরকার নেই, আমি তোমাকে টাকা দেব না।'

—'আচ্ছা চন্দ্রর ঠিকানা কী বলতে পারো ?'

—'চন্দ্র কে ?'

—'চন্দ্র কে, চেনো না ? স্কুলে পড়েছিলাম একসঙ্গে।'

শ্রীবিলাস একবার ভ্রূকুটি করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে -'আমি পড়িনি কোনোদিন।'

—'বাঃ।'

—'আমি নামও শুনিনি তার।'

—'চন্দ্র চৌধুরী।'

—'এখানে কি দালালি নিয়ে বসলে না কি ?'

—'চেন না চন্দ্র চৌধুরীকে ?'

—'ভদ্রলোকের মত কথা বললে তোমার কানে যায় না ? চিরকাল মুখ খিস্তি শুনবার অভ্যাস বুঝি ?'

—'যাক—এক শ টাকা তোমাকে দিতেই হবে।'

—'তোমাদের দুজনকে বিক্রি করে এর সুদও তো উঠবে না—'

—'দু জন কে ?'

—'তুমি আর তোমার মাণিকজোড়। তোমাদের ছেলেপিলে হয়েছিল ?'

—'হঁ্যা।'

—'কটি ?'

—'একটি।'

—'সেই ছেলেটিকে আমাকে দাও—বাপের বদলে সেই না হয় আমার জুতো সাফ করে দেবে।'

—'ছেলে তো হয় নি—মেয়ে।'

শ্রীবিলাস কিছুক্ষণ চুপ থেকে —'আচ্ছা মেয়েটিকেও দাও।'

—'কী করবে তাকে দিয়ে ?'

একটু হেসে—'বাড়িউলি বানাব।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে—'আমি তো বেশি ক্ষণ বসতে পারব না শ্রীবিলাস।'

—'এখনই উঠে যেতে পারো।'

—'টাকাটা আনো তা হলে ?'

—'টাকা আমার পকেটেই আছে।'

—'দাও, আমি তোমাকে তিন-চার মাসে শোধ দিয়ে দেব।'

—'কত সুদ দেবে ?'

—'কত চাও ?'

—'মাসে আট টাকা করে।'

—'আচ্ছা বেশ, তাই।'

—'গিন্নিকে ডাক দেই তা হলে ?'

—'কেন, গিন্নি কেন—তুমি নিজেই দিতে পারো না ?'

—'না, গিন্নির আসা দরকার।'

—'তিনি এসে কী করবেন?'

—'প্রথমত পরামর্শ দেবেন।'

—'আচ্ছা, এই ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নাই-বা নিলে।'

—'তা কি কখনো হয়? তার পর চাবিও তো তাঁর কাছে।'

—'বললে না পকেটে টাকা আছে!'

—'এক শ টাকা পকেটে রেখে ঘুরব? আমি কি মগ?'

শ্রীবিলাস একটা শিস দিয়ে, হাত চাপড়ে, ডাকল—'ডার্লিং।'

দেখতে-দেখতে পাশের ঘরের থেকে একটি লম্বা-চওড়া বিরাটকায় মেয়েমানুষ এসে হাজির।

গায়ে পর্দার পর পর্দা রেশম শুধু— রেশমের দোকানই বাস্তবিক—মুখের থেকে ঘামের সঙ্গে মিশে পাউডার গলে পড়ছে—গলা ঘামে ও পাউডারে বীভৎস; রং মেটে ধরনের; সমস্ত শরীরটা মেদের একটা বিরাট বেলুন—যে-কোনো মুহূর্তে যেন তা উড়িয়ে নক্ষত্রের দিকে যাত্রা করতে পারে। মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়—রক্তমাংসের ব্যবহার এর খুব ভাল লাগে: আলো জ্বালিয়ে খাবার টেবিলের থেকেও বটে, বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে লুটিয়ে-লুটিয়েও তেমনি।

শ্রীবিলাস—'বসো অরুণা।'

—'না, বসব না।'

—'কেন?'

—'কিটকে চিঠি লিখছিলাম।'

—'বাই দি ওয়ে, কিটের খবর কী?'

—'ওরা সব শ্বশুর বাড়িতে আছে।'

—'এই, বেশ, না হল পেঁয়াজ, না-হল পয়জার!'

—'ইনি কে?'

—'এক শ টাকা ধার চাচ্ছেন।'

—'কে? ইনি?'

—'হ্যাঁ।'

—'একে তুমি পিক আপ করলে কোথায়?'

—'এই ঘরের মধ্যেই?'

—'এত রাতে।'

—'সিঁদেল চোর নয়! বা বার্গলার নয়।'

অরুণা চলে যাচ্ছিল।

শ্রীবিলাস—'দিলে না টাকা!'

—'তুমি ইচ্ছে করলে দিতে পারো—আমি দিতে পারব না।'

—'তার মানে?'

খানিকটা ফিরে এসে অরুণা—'একে তো কোনোদিন চোখে দেখি নি আমি।'

—'আমি তো এই পনের মিনিট ধরে দেখছি।'

—'ইনি কী কাজ করেন?'

—'টাকা ধার করে বেড়ান।'

—'কোনো ব্যবসা আছে?'

—'এই তো ব্যবসা।'

একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল সে।

শ্রীবিলাস—'প্রতি এক শ টাকায় মাসে আট টাকা করে সুদ দেবে।'

অরুণা দু-তিন পা এগিয়ে এসে—'এক শ টাকায় আট টাকা সুদ দেবেন মাসে? বেশ, তা হলে এগ্রিমেণ্ট লিখুন।'

কাগজপত্র আনা হল।

শ্রীবিলাস—'সিকিউরিটি কে হবে?'

অরুণা—'সিকিউরিটির দরকার নেই; মর্টগেজ রাখলেই হয়।'

শ্রীবিলাস—'কী, সোনার ঘড়ি-টোনার ঘড়ি আছে তোমার কাছে?'

—'না, বন্ধকি রাখবার মতো কিছু নেই।'

অরুণা—'বাড়ি ঘর-দোর?'

—'আচ্ছা, মোটরে করে না হয় গিয়ে দেখে আসব সব।'

—'বাড়িঘর তো আমার নয়।'

—'কার?'

—'বাঁধাও দিতে পারব না।'

অরুণা সিগারেটে এক টান দিয়ে—'এতক্ষণে তো কিটির চিঠি শেষ করতে পারতাম।'

চলে গেল সে।

শ্রীবিলাসকে বললাম—'তোমার স্ত্রীর মেজাজ কিন্তু ঢের শান্ত; সময় তো অনেকটা নষ্ট হল হল ; কিন্তু কই কাণ্ডজ্ঞান হারালেন না তো।'

—'উঠলে ?'

—'হ্যাঁ, চললাম ভাই।'

—'আমি তোমাকে একটা কথা বলি।'

—'কী বলো।'

—অ্যানার্কিজমে ভিড়ে পড়ো।'

—'কেন, তাতে কী লাভ ?'

—'একটা জবরদস্ত মার্ডার করো।'

—'তার পর ?'

—'তোমার মাথার পেছনে ৫০০ টাকা ডিক্লেয়ার্ড হোক।'

—'ও, সেই কথা।'

—'আমার কাছে এসে সারেণ্ডার করো। চারশ পঞ্চাশ টাকা ধার দেব তোমায়।'

বড় মজার কথাই বলেছে শ্রীবিলাস—শুনে আমার পক্ষের থেকে হাসিটা আন্তরিকভাবেই ফেটে পড়তে লাগল। শ্রীবিলাসের সঙ্গে একটু পাঞ্জা লড়তে গেলাম, সে আমার হাত দিল জাহান্নম মচকে, টনটনে হাতটা নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে নেমে পড়ে দেখলাম, বেশ বৃষ্টি পড়ছে।

পর দিন সকাল বেলা খুব ভাল করে দাড়ি কামিয়ে, সাবান দিয়ে স্নান করে, ঝাড়াঝাপটা হয়ে বাক্সের নীচের থেকে ভাঁজ করা লংক্লথের জামাটা বের করে গায়ে দিয়ে নিলাম। একটা চাদরের অবিশ্যি দরকার! বাবার একখানা চাদর আছে বটে—কিন্তু ইস্কুলে বেরুবার সময় সেটা তাঁর লাগবে। মার অনেক দিনের পুরোন একখানা সিল্কের চাদর ছিল, ছিঁড়ে ফেঁড়ে যাওয়াতে অঞ্জলির বাক্সের এক কিনারে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু চাদরটা বের করে আমার মনে হল ঢেকেঢুকে নিলে এ-চাদর চলে যায়। একটু সতর্কতার সঙ্গে পরতে হয় বটে, পরে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়—অসাবধানতা,

বাতাস, ফূর্তি কাউকেই বিশেষ আশকারা দিতে হয় না। চাদরটা গুছিয়ে নিয়ে পরা গেল।

শুনলাম কিছুদিন হল প্রতিমা এসেছে এখানে।

প্রতিমা আমার থেকে বছর তিনেকের ছোট, এখানে মেয়ের স্কুলে একদিন সে পড়ত, সে আজ প্রায় বছর পঁচিশ আগের কথা। সে ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরিয়েছে তো প্রায় বার বছর হল; আট ন বছর হল চাকরি করছে, ইনস্পেকট্রেস, বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমে। এখানে তাদের জায়গা-জমি ঢের আছে, সুন্দর একখানা দালান আছে; মাঝে-মাঝে তাই সে আসে। বছর পাঁচেক আগে একবার এসেছিল, তখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

সকালবেলা আকাশটা ঢেকে আছে মেঘে। এই মেঘ-বৃষ্টি মাথায় করে যাব কি না ভাবছিলাম—হয়তো এক ঝোড়ো কাক হয়ে গিয়ে উঠতে হবে। হয়তো বেচারি বাদলের শান্তির ভিতর নিজের মনের সুন্দর খণ্ডটা নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল এমন সময় এডগার এ্যালেন পো র র‍্যাভেন এর মত গিয়ে হাজির হব: 'নেভার মোর।'

সন্ধ্যার দিকেই গেলাম। আকাশ পরিষ্কার। ভাদ্র মাস—চারদিকে কেমন একটু নরম শরতের আভাস, খালের কিনারে ঘাসের ভিতর সেই নীল ফুল; ইতস্তত ঘ্রাণ থেকে-থেকে ঘাসের ভিতর ফেনিয়ে উঠেছে; উলুখড়ের ওপারে মাছরাঙা প্রিয়ারই বুঝি কেমন শূন্য বেদনার কান্না, বিকেলের শেষে পৃথিবীর ধান সোনালি, খড় বাদামি, খড় সোনালি, আরো ম্লান হয়ে পড়ে; অশ্বত্থের পাতা খসে—থেকে-থেকে ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে যায়।

তাকিয়ে দেখলাম, মাঠের বাঁ পাশে খানিকটা দূরে একটা মরা বাছুরকে ঘিরে কতকগুলো শকুন।

ছেলেবেলাকার কোনো মৃত মুখের স্মৃতির মত পঞ্চমীর জোৎস্না অনেক দূরের বাঁশের জঙ্গলের পিছন থেকে ধীরে-ধীরে উঁকি দিচ্ছে। সে মুখ কি আমারই? না, আমি যে-পৃথিবীকে ভালবেসেছিলাম, তার? যাক—দুজনেই আজ মৃত।

আরো মিনিট-পনের পরে প্রতিমাদের দালানের সিঁড়ি বেয়ে উঠে ধীরে ধীরে

খাশ কামরার দরজায় ধাক্কা দিলাম। কোথাও কোনো জনমানব নেই; সিকি মাইল দূরে পর্যন্ত না। হিজলের ডালপালার ভিতর কয়েকটা ঘুঘু শুধু অনেক ক্ষণ ধরে ডাকছে।

—'কে!'

—'আমি—'

ভিতর থেকে রুক্ষস্বরে জবাব এল—'তুমি কে?'

—'আমি শচীন—'

—'শচীন কে? মিস্ত্রি নাকি? আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি, তুমি কাল সকালে এসো।'

—'না, আমি মিস্ত্রি নই।'

—'কাকে চাও?'

—'মিস সেন আছেন?'

—'আ, জ্বালালে দেখছি!'

ধীরে-ধীরে দরজা খুলে দিয়ে আমার দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে প্রতিমা একটু অবাক হয়ে—'কে তুমি?'

—'যাক, আমাকে দেখে দু-হাত পিছিয়ে যাও নি—ঠিক জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছো।'

—'আপনি কী চান?'

—'অন্ধকারের মধ্যে বুঝবে না; এই তোমার বারান্দার এদিকে বেশ জ্যোৎস্না পড়েছে; এই দিকে এসো প্রতিমা, আমাকে তো চিনতেও পারলে না—না পেরেছ?'

প্রতিমা অন্ধকারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল।

—'আলোর ভিতরে একটু আসবে?'

নিস্তব্ধ।

—'বারে, এ রকম করে দাঁড়িয়ে আছো যে?'

—'অবাক হয়ে ভাবছিলাম কার এত সাহস—আমাকে নাম ধরে ডাকে।'

—'কেন, এদেশে কি কেউ তেমন নেই? কোথায় যাব?'

—'ভিতরেই এসো।'

—'এই বারান্দায় তো বেশ জ্যোৎস্না ছিল।'

—'ভিতরেও বড় টেবিল ল্যাম্প আছে।'

—'এই তো কামিনী ফুলের গাছের কাছে বেঞ্চ রয়েছে বাইরে, এখানেই বসা যাক, বেশ বড় বেঞ্চ, দু জনেই বসতে পারব।'

—'না, ওখানে আমি কী করে বসি?'

—'কেন?'

—'তা বলতে পারা যায় না—বাইরে রাস্তা দিয়ে কত লোক যাচ্ছে।'

—'কিন্তু ছেলেবেলায় এ বেঞ্চিতে কত বসেছি আমরা দু জনে, ঠিক এই রকম রাতে। কামিনী ফুলের গাছে গোখরো আসে এই ভয়ে ঘেঁসতে চাইতাম না, তুমি জোর করে বসাতে আমাকে; বলতে, পুরুষ মানুষের এত ভয়। ভীরু ছিলাম, কিন্তু নাবালকও তো ছিলাম; পুরুষ মানুষের দোহাই তুমি তখন না পাড়লেও পারতে। এরই মধ্যে পঁচিশ বছর চলে গেল প্রতিমা?'

নিস্তব্ধ।

—'এখন এখানে বসাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব।'

এবারও কোনো উত্তর দিল না সে।

—'আচ্ছা, তুমি না হয় এ বেঞ্চির উপরে বসো, আমি একটু দূরে সরে ঘাসের উপর বসব।'

—'ভিতরে এসো, আমি কাজ করছিলাম—উঠে এসেছি। এসো।'

অগত্যা যেতে হল।

পিছনে যেতে-যেতে বললাম—'তোমাদের বাড়ির আশেপাশে আধ মাইল দূরেও তো কোনো লোক দেখলাম না আমি। বাইরে বসলে কেই-বা দেখত।'

—'কেন, রামধনিয়াই তো দেখত।'

—'সে কে?'

—'আমার বেয়ারা।'

—'বেহারি বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে দেখলে এমন কীই-বা এসে যেত।'

—'তুমি বুঝতে পার না শচীন, মর্যাদা অনেক জিনিসেই নষ্ট হয়; বিশেষত এই সব চাকরবাকরের সামনে আমাকে সব সময়ই বড্ড সতর্ক থাকতে

হয়'—ঘরের ভিতর ঢুকে একটা গদি-অাঁটা চেয়ারে বসে প্রতিমা,
'রামধনিয়া—'

রামধনিয়া আসতেই প্রতিমা—'এই বাবুর জন্য একটা কুর্শি নিয়ে এসো তো—'
আধ মিনিটের মধ্যেই কুর্শি এল। রামধনিয়া চলে গেলে চেয়ারে বসে—
'আচ্ছা প্রতিমা—'

—'বলো—'

—'গদি-অাঁটা চেয়ারে তুমি বসে নিয়ে তারপর আমার জন্য এই কাঠের চেয়ারটা আনাতে দিলে কেন?'

—'চাকরটাকে বুঝতে দিলাম যে তুমি আমার সাব-অর্ডিনেট।'

—'আমি অবিশ্যি তোমার ডিপার্টমেণ্টে কাজ করি না।'

—'এ নিয়ে কথা বললে কিছু লাভ আছে শচীন?'

—'না, লাভ অবিশ্যি কিছু নেই প্রতিমা।'

—'রামধনিয়া যদি আবার আমার ঘরের ভিতর ঢোকে—'

—'হ্যাঁ?'

—'তাহলে কিন্তু প্রতিমা বলে ডেকো না।'

জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম শিরীষগাছের ওপর চাঁদ এসে উঠেছে—মুখখানা যেন এক বিমুগ্ধ দীন বধূর মত করে; কিংবা আমার মৃত সন্তানের মত।

—'রামধনিয়ার সামনে অবিশ্যি তোমাকে নাম ধরে ডাকব না প্রতিমা—'

—'মিস সেনও বলো না।'

—'না, কোনোকিছুই বলার দরকার নেই; এমনি কথাবার্তা বলব।'

ধীরে-ধীরে টেবিলের থেকে তুলে নিয়ে চশমা জোড়া চোখে এঁটে নিল প্রতিমা।

আমি—'বিনে চশমায়, অন্ধকারে, কী করে চিনলে আমাকে তুমি?'

—'গলার আওয়াজে চিনেছিলাম।'

—'ওঃ।'

একটু চুপ থেকে—'চেহারা আমার বদলে গেছে বুঝি?'

—'হ্যাঁ, চেনা শক্ত।'

—'বৌ বলে, আমার থাইসিস হয়েছে।'

—'বাস্তবিক, তোমার থাইসিস হয়েছে নাকি ?'

গদি-আঁটা চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল, স্প্রিঙের চশমা বুকের উপর ঝুলে পড়ল।

—'না, সে ভাবে, হয়েছে। বাস্তবিক হয় নি।'

—'হয় নি কী করে তুমি তা বুঝলে ?'

—'জ্বর নেই। একটা ইমালশন এনে দিয়েছে ; কিন্তু আমি তার দরকার বোধ করি না—'

—'তোমাকে একটা কথা বলব শচীন—'

ধীরে ধীরে চশমা পরে নিয়ে—'যদি টিউবারকিউলোসিস হয়ে থাকে তাহলে তো তুমি জানই তার জার্ম কত সাংঘাতিক।'

—'তা জানি বই-কি—'

—'তা হলে এ ব্যারাম নিয়ে যেখানে-সেখানে যাওয়া তো তোমার শোভা পায় না।'

মাথা নেড়ে—'না। অবিশ্যি তোমাদের কাছে আসতে পারি।'

প্রতিমা ধীরে-ধীরে ঘাড় নেড়ে, 'না আমাদের কাছে না ; আমরাও তো মানুষ।'

প্রতিমা যে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয় সেটা সে এ-রকমভাবে মনে করিয়ে না দিলে সন্দিগ্ধ হতাম না।

—'তাও তো বটে প্রতিমা।· কিন্তু তবুও মানুষের মনুষ্যত্বে সন্দিগ্ধ না হওয়াই ভাল।'

—'তাহলে—'

—'অবিশ্যি আমি উঠব না। এখানে একটু বসবার জন্যই এসেছি। আমি ভালই আছি। তোমার কোনো ভয় নেই প্রতিমা।'

—'মানুষকে মাঝে-মাঝে বড্ড দুর্দৈব সহ্য করতে হয়।'

—'তা হয় বই-কি ; আমি চলে গেলে চেয়ারটা না হয় স্টেরিলাইজ করে নিও।'

—'সমস্ত ঘরটাকেই হাইজিনিক্যালি পরিষ্কার করে নিতে হবে।'

—'বেশ তাই নিও। ছেলেবেলা যে-সব দিন আমরা নিরপরাধ আনন্দে কাটিয়েছি তার স্মৃতিতে এইটুকু অন্তত, করো।'

ব্যথিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে—'তারপর, কী জন্যেই বা এলে ?'

—'শুনলাম তুমি এখানে এসেছ।'

—'কার কাছেই বা শুনতে পেলে ?'

—'তোমার সন্ধান এ-কয় বছর আমি বরাবরই রেখেছি ; তোমাদের মালতী বলছিল, যে তুমি শিগগিরই আসবে।'

—'ও—'

—'প্রায় ছ সাত বছর পরে এলে তো।'

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ—'

—'এতদিন দেশে আস নি কেন ?'

—'আমি মুসুরিতেই প্রায় থাকি ; গত বছর দার্জিলিং অব্দি এসেছিলাম—এ সব দিক বড় একটা ভাল লাগে না।'

—'তোমার মা কোথায় ?'

—'তিনি নৈনিতালেই আছেন ; বীরুও সেখানে।'

—'তোমার মা তো অনেকদিন এদিকে আসেন না ?'

—'না, তিনি আর আসবেন না।'

—'কেমন আছেন ?'

—'ভালই। আমিও এবার নেহাত এলাম এ জায়গাজমিগুলো বিক্রি করে ফেলব বলে।'

'বারে, এই সব বিক্রি করবে ? এমন সুন্দর দালানকোঠা, মাঠ, দিঘি—সামনের ঐ মস্তবড় মাঠটা—এটাকে প্রান্তর বলাও চলে তিমা—এর জন্য যে আমি সমস্ত জীবন বিসর্জন দিতে পারি ! এই বারান্দায় বসে ঐ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকা—দুপুরবেলায়—এমনি জ্যোৎস্নারাতে—'

বাধা দিয়ে একটু হেসে—'কালিংপং-এ একটা বাড়ি করেছি, নৈনিতালে একটা, আলমোড়ায় একটা, এ জায়গাজমি বিক্রি করে দেব তাই।'

—'আমার কাছে বিক্রি করো-না।'

—'চল্লিশ হাজার টাকা দিলেই করি।'

একটু চুপ থেকে—'তাহলে তোমরা এখানে আর আসবে না !'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'দুঃখ করবে না ?'

—'এখানে এসে যে কটা দিন রয়েছি এতেই আমার মরণান্ত হয়ে উঠেছে। তুমি বোঝো না, এ-সব দেশের ও মানুষের স্বাদ আমরা অনেকদিন হয় হারিয়ে ফেলেছি। এখানকার কিছুই ভাল লাগে না আমার।'

—'তোমার জীবনের পক্ষে এটা মস্ত ক্ষতি নয় প্রতিমা ?'

—'আমি তা মনে করি না।'

—'বাংলাদেশের পাড়াগাঁকে তুমি নৈনিতালের কাছে বিক্রি করে ফেললে ?'

—'তাতে আমার লাভই তো হল।

—'এই তুমি মনে কর প্রতিমা ?'

—'আমি এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি যে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলাম।

—'তোমাদের এ বাড়িটা কিনবার শক্তি বিধাতা যদি আমায় দিতেন প্রতিমা !'

—'তোমাকে না-হয় সাড়ে উনচল্লিশ হাজার টাকায় ছেড়ে দেব—কেনো-না।'

—'সাড়ে উনচল্লিশ পয়সাও তো আমার নেই।'

একটু চুপ থেকে—'একটু অপেক্ষা করবে ?'

—'কিসের জন্য ?'

—'এই পাঁচ-সাত বছর ; তারপর এই বাড়িটাকে বিক্রি করো।'

—'তাতে আমার কী লাভ ?'

—'তবুও মাঝে-মাঝে এ দেশে আসবে তুমি ; তোমাকে—'

একটু চুপ থেকে—'হ্যাঁ তোমাকে দেখতে পারব আমরা।'

মাথা নেড়ে—'সুদের টাকা কে আমাদের দেবে ?'

—'কীসের সুদ ?'

—'এই চল্লিশ হাজার টাকার কত সুদ হয় ছ-বছরে ?'

—'ও, সেই কথা ভাবছিলে তুমি।'

—'এ টাকাটা যত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় ততই ভাল, পেয়েই লয়েডস ব্যাঙ্কে রেখে দেব।'

—'তোমার সঙ্গে এখানে রামধনিয়া এসেছে শুধু ?'

—'হ্যাঁ।'

—'এ বাড়িতে আর-কেউ নেই ?'

—'না।'

—'বড্ড একা লাগে না তোমার ?'

—'আমি তো দু-চার দিনের মধ্যেই পালিয়ে যাব।'

—'বাড়ি বিক্রির কোনো ব্যবস্থা ঠিকঠাক হল !'

—'হ্যাঁ, একজন মুসলমান জমিদার কিনবেন। কাল সকালেই তাঁর আসবার কথা।'

—'এসে কোথায় থাকবেন ?'

—'এখানেই। টাকাটা পেলেই আমি চলে যাব।'

—'কালই টাকা পাবে আশা করছ ?'

—'হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যায় তা হলে আমি রওনা হব।'

—'ওটা কী ডাকছে ?'

—'কই ?'

—'ঐ যে শুনছ না ?'

—'কী একটা পাখি—'

—'লক্ষ্মী পেঁচা বোধ করি। তোমাদের বকুলগাছে এসে বসেছে। অনেক কথা মনে পড়ে যায় প্রতিমা ; সেই পনের বছর আগের—বিশ বছর আগের কথা সব।'

দেখলাম, সে আমার পাঞ্জাবির বোতামগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। বোতামগুলো নকল সোনার—কিন্তু সোনার মতই দেখাচ্ছিল হয় তো।

—'পাঁচ আনা দিয়ে কিনেছি।'

—'কী ?'

—'এই বোতামগুলো।'

—'সোনার বোতাম নয় ?'

—'না, গিল্‌টি।'

—'দেখাচ্ছিল কিন্তু সোনার মত।'

—'কয়েক দিন সে রকম দেখাবে বটে—'

—'মোটে পাঁচ আনা দাম ?'

—'কী লিখছিলে ?'

—'একটা আর্টিকেল।'

—'কী বিষয়ে ?'

—'শিশুদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে।'

—'তুমি বিলেত থেকে এডুকেশন ডিগ্রি এনেছিলে ?'

—'না, বিলেত আমি যাই নি ; এখানকারই বি. টি।'

—'যাবে না কি ?'

—'বিলেত! যেতে পারি। তবে ডিগ্রি আনতে নয়—'

—'তবে ?'

—'বেড়াতে—'

—'কোন জায়গা ভাল লাগে তোমার ?'

—'ইউরোপ ? ফ্লোরেন্স, ভেনিস, রোম, জেনেভা, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ডে ঘুরতে পারি।'

—'হাইল্যাণ্ড ভাল লাগে না ?'

—'স্কটল্যাণ্ডের কথা বলছ ?'

—'হ্যাঁ, দেখবে কোনো এক দীর্ঘ হাইল্যাণ্ডার কোনো এক লেকের কাছে দাঁড়িয়ে বর্নি কাটছে হয় তো, নিরালা দুপুর কিংবা সন্ধ্যা হয়ে আসছে। একটা পিউইট পাখি কাতর ভাবে ডেকে যাচ্ছে হয় তো—কিংবা একটা দাঁড়কাকের অলস বিরস আওয়াজ ; একটা গুউজ হয়তো হক হক গোবাক গোবাক বলে চেঁচাচ্ছে—আর সেই কারলিউ পাখি, ইয়েটস-এর এক-একটা ছোট কবিতায় যার বিষণ্ণ আস্বাদ পাওয়া যায়—বাতাসে হয় তো সেই কারলিউ-এর নিরালা মর্মান্তিক গান ভেসে আসছে—আমাদের বিলদিঘির জলপিপির মত হয় তো অনেকটা ; কিংবা কে জানে বর্ষার মাঠে বৃষ্টির কুয়াশার ভিতর মাছরাঙার অস্ফুট করুণ গলার মত হয় তো। এক হাঁটু ঘাসের ভেতর দিয়ে ওয়েভ করে হাঁটতে হাঁটতে এই সব বেশ লাগবে কিন্তু—'

প্রতিমা মাথা নেড়ে—'না, এডিনবুর্গ ইউনিভার্সিটিতে একবার দেখতে পারি, কিংবা গ্লাসগোয়, তাছাড়া স্কটল্যাণ্ডে আর-কী আছে !'

—'নেই কিছু ?'

—'না।'

—'কী জানি, এক-একটা বই-এ দেখি।'

—'স্কটরা নিজেদের তারিফ করে খুব লেখে। একটা শূন্য মরুভূমি ছাড়া

ও-দেশে আর-কিছু নেই।'

—'শিশুর সাইকোলজি সম্বন্ধে লিখছ; ছাপাবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোথায়?'

একটা ইংরেজি কাগজের নাম করল প্রতিমা।

—'শিশুদের খুব ভাল লাগে বুঝি তোমার?'

—'ভাল লাগা না-লাগার কিছু তো নেই এতে; তাদের সম্বন্ধে আমি গবেষণা করছি।'

—'ওঃ—এমনি একটা শিশুকে কেমন লাগে তোমার?'

—'এ সব প্রশ্ন করো না আমাকে।'

—'কেন?'

—'প্রশ্নগুলো বড্ড খাপছাড়া, আমার মনে হয় রুচিহীন, বলতে পারা যায় অবৈধ।'

—'তা ঠিক।'

—'এই আর্টিকেলটা আজকে আমাকে শেষ করতে হবে।'

—'ঐ আর্টিকেলটা তোমার? দু-দিনের জন্য এসেছ তাও এই সব লট-খট সঙ্গে করে?'

—'তা আনতে হয় বই-কি; তুমি টাইপ করতে জানো?'

—'জানি একটু আধটু।'

—'আচ্ছা, আমার এই লেখাগুলো টাইপ করে দাও না।'

—'ক পৃষ্ঠা হবে?'

—'টাইপড পৃষ্ঠা তিনেক হবে বোধ করি; বার আনা পয়সা দেব।'

দেখলাম উৎকর্ণ আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, মুখখানা গম্ভীর।

বললে, 'পারবে না?'

—'না।'

—'কেন?'

—'তুমিই ভেবে দেখো।'

—'এর পর হয় তো বলবে পাঁচ সিকে!'

—'না, পাঁচ সিকে বড্ড বেশি হয়ে যায়—', একটু চুপ থেকে, 'করলে আমি

বিনে পয়সায়ই করে দিতাম।'

সমস্ত শরীরে খানিকক্ষণ মোচড় খেয়ে নিয়ে—'আচ্ছা, পাঁচ সিকেই না হয় দেব। আমি নিজেও করলে করতে পারতাম; যাক—কেমন একটা আলসেমি ধরে গেছে। তা তুমিই করো; পয়সা পেলে তোমারও লাভই তো হবে।'

—'তোমার এ শুভ ইচ্ছার কথা কোনোদিন আমি ভুলতে পারব না প্রতিমা; কিন্তু—এ আমাকে দিয়ে হয়ে উঠবে না।'

প্রতিমা একটু বিরক্ত হয়ে—'থাক। শেষে আমার সঙ্গে দর কষাকষি আরম্ভ করলে তুমি, তোমাদের এ দেশের মানুষ এ-রকমই হয়।'

—'না, দর কষাকষি করতে আমি একদমই চাই না।'

—'তুমি হয়তো ভাবছ, এত কথার পর আমি তোমাকে দু টাকা ছেড়ে দেব!'

—'এই টাইপিঙের জন্য?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমি এক পয়সাও চাই না—'

—'চাও না? দর দস্তুর তো করছ ফড়ের মতন? করছ না শচীন?'

—'তোমার-আমার সম্বন্ধের মধ্যে কোনোদিন যেন কোনো মূল্যের কথা না আসে প্রতিমা।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ রইল।

পরে একটু হেসে—'আচ্ছা; বিনি পয়সায়ই করে দাও তাহলে।'

—'বেশ তো, এক্ষুণি করে দিতে হবে?'

—'হাঁ, ম্যানাসক্রিপ্ট প্রায় হয়ে গেছে। এসো, আমি ডিকটেট করি।'

টাইপ রাইটারের কাছে গিয়ে বসলাম।

প্রতিমা একটু হেসে বললে—'আচ্ছা থাক, তোমার করতে হবে না।'

—'কী হল?'

—'না, মানুষকে আমি বিনে পয়সায় খাটাই না।'

—'সে তোমার দাক্ষিণ্য।'

— কিন্তু দাক্ষিণ্য আমার দু টাকার ওপরে উঠবে না। তুমি যতই চাল দাও না কেন—এর ওপর চার আনা পয়সাও আমি দিতে পারব না শচীন।'

চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে মাথা হেঁট করে—'আর-কোনোদিন তোমার সঙ্গে দেখা

হবে না প্রতিমা ?'

—'কবে আবার ?'

—'এমন কি কোনোদিন কি হবে না যখন আমি নৈনিতালে বাড়ি করতে পারব ?'

—'সে বিধাতার ইচ্ছা।'

—'যদি করতে পারি, তাহলে কি তুমি নৈনিতাল থেকে সরে যাবে ?'

—'না। কেন ? তুমি কি আমার শত্রু ?'

—'আজ উঠি তা হলে !'

—'কেন এসেছিলে ?'

—'একশটা টাকা ধার নিতে।'

—'এতক্ষণ বলো নি তো কিছু।'

—'এতক্ষণে বলেছি যে সেই জন্যই নিজেকে ধন্যবাদ দেই। টাকাটা পেলে নিজেকে আশীর্বাদ করব—বুঝব যে এসব কথা একটু রয়েসয়েই বলতে হয়—মানুষ হতে পেরেছি।'

একটু চুপ থেকে—'কেন ধার চাচ্ছ ?'

—'মদ-গাঁজা কিছু খাব না—ভাল কাজই করব।'

—'কিন্তু কালই তো আমি চলে যাচ্ছি।'

—'টাকাটা তোমাকে নৈনিতালের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব।'

—'বসো। আমি চার আনা পয়সা তোমাকে একবার দিয়েছিলাম।'

—'কবে ?'

'সে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের কথা।'

—'তাই হবে। তাই নাকি ? কিছু মনে নেই আমার।'

—'বয়েস তখন আমার সাত-কি-আট, দশ-পনের আনা পয়সা শুধু জীবনের সম্বল।'

—'এত দরিদ্র তুমি ছিলে একদিন ?'

—'হ্যাঁ। আট বছরের সময়ে ছিলাম বই-কি। ভাল মনে করে চার আনা পয়সা তোমাকে দিয়েছিলাম ; কিন্তু সে পয়সা তুমি কোনোদিনও ফেরত দিলে না।'

—'দেই নি বুঝি ?'

—'ভুলে গেছিলে বোধ করি। কিন্তু তখন ছেলেমানুষ আমি—জীবনের সেই চার আনার শোক অনেক দিন পর্যন্ত ভুলতে পারি নি আমি।'

—'আমাকে বললেই পারতে!'

—'না, আমি বলি নি। এই একশ টাকার বেলাও সেই রকম যদি হয়?'

—এবার আর ছেলেমানুষ নও; হয় তো এ শোক শুধরে উঠতে পারবে। পারবে না প্রতিমা?'

প্রতিমা চশমাটা খুলে আলোর দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে বসে রইল।

—'বীরু ছাড়া তোমাদের সংসারে পুরুষ আর-কেউ নেই বুঝি?'

—'না, বাবা মরে যাওয়ার পর ঐ একমাত্র পুরুষমানুষ।'

—'খুব একা লাগে না তোমার?'

—'আমার? কেন?'

ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে খানিকটা হেসে নিল প্রতিমা।

—'তোমার মাইনে এখন কত?'

—'তাও জিজ্ঞেস করবে? ছশ টাকা পাচ্ছি।'

—'তুমি বাংলাদেশে এলেই পারতে।'

—'আমি পশ্চিমে হয়ে গেছি।'

—'তোমার সঙ্গে পরিচয়লাভ করতে পেরেছিলাম বলেই তো বাংলার রূপকে আমি চিনেছি। না-হলে এ পথঘাট অন্ধের মত ফিরতে হত আমাকে।'

—'বাংলার রূপকে তুমি চিনেছ—সে তোমার হৃদয়ের গৌরবে। আমার তাতে কোনো হাত নেই কিন্তু শচীন।'

চশমা পরে কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে বসল।

—'লিখবে?'

—'হ্যাঁ।'

চলে যাচ্ছিলাম—'আচ্ছা আমি যাই তা হলে।'

—'একটা কথা শুনে যাও শচীন।'

—'বলো—'

—'তোমার থাইসিস হয়েছে বোধ হয়?'

—'মনে তো হয় না।'

—'একজন ডাক্তার দেখিও।'

—'আচ্ছা।'
—'একজন ভাল ডাক্তারই দেখিও শচীন।'
—'চেষ্টা করব।'
—'কোনো এক জায়গায় চেঞ্জে তোমার যেতে হতে পারে কিন্তু। যেও। অবহেলা করো না।'
—'না, মিছেমিছি স্ত্রীকে বিধবা করে কী লাভ!'
মাঠের পথে খানিকটা নেমে, ফিরে এসে, আবার প্রতিমার কাছেই গেলাম।
—'কে, শচীন?'
—'হ্যাঁ।'
—'কেন?'
—'টাকাটা দিতে ভুলে গেলে যে তুমি।'
—'না, ভুলি নি।'
—'একশ টাকা ধার চেয়েছিলাম।'
—'হ্যাঁ, কিন্তু দিতে পারব না তো।'

বাড়ির কাছে এসে দেখি জ্যোৎস্নার ভিতর জামরুলতলায় অমল পায়চারি করছে।
—'কে, অমল?'
আমাকে দেখে সে সিগারেট জ্বালাল।
—'চলো একটু গল্প করি গিয়ে।'
—'কোথায়?'
—'চলো, আমার ঘরে।'
ইতস্তত করে—'না, এখন—'
—'অঞ্জলি কোথায়?'
—'তার নিজের ঘরে আছে হয় তো—'
—'চলো না সেখানে।'
—'না, থাক।'
সিগারেটে এক টান দিয়ে মাঠের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। দেখলাম

অঞ্জলির ঘরের তিনটে দরজা আটকানো। মাঝখানের দরজাটায় আস্তে একটা ধাক্কা দিলাম।

—'কে?'

—'আমি—'

ধীরে-ধীরে দরজা খুলে দিয়ে টেবিলে বাতির কাছে গিয়ে বসল।

—'একেবারে দরজাটা বন্ধ করে বসেছ যে—রাত তো বেশি হয় নি।'

—'বাধ্য হয়েই বসতে হয়।'

—'কেন, কী হল?'

—'কেদারবাবু মুন্সেফের ছেলেকে চেনো?'

—'কে, অমল?'

—'হ্যাঁ, বড্ড বিরক্ত করে এসে।'

—'কী রকম?'

—'আমি তাকে বলেছি তুমি বরং দিনের বেলা আমার কাছে এসো—তবুও সে রাত করে আসবেই'—বলে অমলের একখানা বই-এর ভিতর থেকে বের করে দু খানা চিঠি আমাকে দিল। চিঠিখানা পড়েছিলাম। আস্তে-আস্তে টেবিলের এক কিনারে রেখে দিয়ে—'তুমি কী লিখছ?'

—'কতকগুলো হিশেবপত্র নিয়ে বসেছি।'

—'কিসের?'

—'এই টাকাকড়ির। .আচ্ছা বায়স্কোপের জন্য সেদিন ২ টাকা নিয়েছিলাম তোমার কাছ থেকে, না?'

—'হ্যাঁ।'

—'দু জনের টিকিটে গেল আট আনা-আট আনা এক টাকা; গাড়ি ভাড়া আসা-যাওয়ায় পাঁচ আনা-পাঁচ আনা দশ আনা; এই হল এক টাকা দশ আনা—আর ছ আনা পয়সা বাকি থাকে তো?'

চোখ কপালে তুলে অঞ্জলি আমার দিকে তাকাল, বললে—'এই ছ আনা পয়সা অমল তো আমাকে ফেরত দেয় নি।'

—'হয় তো আর কিছু খরচ করে থাকবে।'

—'আবার কী হবে?'

—'কিছু খেয়েছিলে?'

—'ইন্টারভেলে অমল আমাকে কাটলেট আর লেমনেড দিয়েছিল; কিন্তু তাতেই কি ছ আনা পয়সা খরচ হয়ে যায়?'

—'বেচারি নিজেও হয় তো কাটলেট আর লেমনেড খেয়েছে।'

—'কিন্তু সে কথা আমাকে বলা উচিত ছিল তার।'

—'ভেবেছে হয় তো না বললেও তুমি বুঝে নিয়েছ।'

—'ওসব মিষ্টি কথায় আমি মজি না, আমি তার কাছে ছ আনা পয়সার হিশেব চাইব।'

'ছি, চাইতে যেও না অঞ্জলি।'

—'কেন চাইব না? ছ-আনা পয়সা ভেসে আসে?'

ধীরে-ধীরে জ্যোৎস্নার পথের মধ্যে বেরিয়ে গেলাম। এ-রকম চিরকাল চলতে পারা যায় না কি? মাঠ-প্রান্তর ভেঙে, জানা-অজানার ওপারে, জ্যোৎস্নার আকাশে-বাতাসে বুনো হাঁসের মতন, যে-পর্যন্ত, যে-পর্যন্ত শেষ গুলি এসে বুকের ভিতর না লাগে!

—

বড় গল্প

পূর্ণিমা

সন্তোষের অবিবাহিতা বড় শালী চপলা [চামেলি] বিধবা আশ্রমের ইস্কুলের কাজ ছাড়বার পর থেকে সন্তোষ এ মেয়েমানুষটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এই মেয়ে কটির বাপ নেই, মা নেই—একটি বুড়ো মামা টিকির-টিকির করছেন বটে—কিন্তু কত দিন আর এ-রকম চলতে পারে ভাবতে গেলে সুস্থির ভাবে জীবনটাকে অনুভব করতে পারা যায় না। অন্য কোনো এক রকম ব্যবস্থা হলেই ভাল হত ; অন্তত এই বিধবা আশ্রমের চাকরিটিও যদি থাকত।

চাকরিটি চপলা নিজের ইচ্ছায়ই খুইয়েছে। সন্তোষ ভাবছে, জীবনের যে-অবস্থা তাদের তাতে মান-অপমানবোধ ওর একটু কম হলেই ভাল হত। নিজে সন্তোষও চাকরি খুঁজছে।

টাকাকড়ির অভাবে কামনা-আকাঙ্ক্ষা তো ঢের দূরে—মানুষের জীবনের সাধারণ ধর্মটারই এত অপব্যবহার চলেছে !

চামেলিকে সে আজ আশ্রয় দিতে পারছে না, তার অন্য ভাইবোনদেরও না, বুড়ো মামাশ্বশুর মানুষটিরও কোনো কাজেই আজ সে লাগল না—কে জানে এদের সকলের কাজে কবেই-বা সে লাগতে পারবে ? শেষ পর্যন্ত ঘুরেফিরে সন্তোষকেই এরা একমাত্র নির্ভরের জিনিশ বলে বুঝে নিতে চাচ্ছে কিন্তু তবুও নিজের শক্তি-সামর্থ্যের কথা ভেবে সন্তোষ কিছু বুঝে দেখতে চাচ্ছে না—মান-অপমান বোধ নিয়ে এরা সরেই থাকছে।

সেই ভাল !

একটু অপেক্ষা করা যাক। এমন একটা দিন আসবে না কি যখন আশা-বাসনার অত্যুচ্চতার স্বাদ না মেটালেও জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দায়িত্ব-গুলোকে সে মিটিয়ে দিতে পারবে? কেন আসবে না? নিশ্চয়ই সেই সফলতা তার জন্য প্রতীক্ষা করছে। ভবিষ্যতের এমন একটা দিন যখন চামেলি দিদিদের প্রয়োজনীয় সমস্ত দাবিদাওয়া সে মিটিয়ে দিতে পারবে—হয় তো ওদের বিয়ের ব্যবস্থাও সে করে দিতে পারবে—কিংবা চাকরির ব্যবস্থা কিংবা জীবনের আবশ্যকমত সাদাসিধে সাধারণ সচ্ছলতার বন্দোবস্ত সব—

সন্তোষের জীবনের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি এতেই।

মানুষের জীবনের সাধারণ কর্তব্যগুলোই আজ তার ধর্ম।

নিজের কোনো মতামত, স্বাধীনতা বা আকাঙ্ক্ষার জন্য কোনো ভালবাসা নেই আজ তার, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কোনো উন্নতি বা যশ আজ আর চায় না সে। এক দিন সন্তোষ এমনই ভাবত বটে যে নিজের ঐশ্বর্য বাড়াতে গিয়ে কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ করবে না সে আর, কোনো প্রবঞ্চিতের কথাই ভাবতে যাবে না। বরং মানুষকে সজ্ঞানে প্রবঞ্চনা করে চলবে সে, নিপীড়ন করে, নির্যাতন করে. চারদিককার মানুষের জীবনগুলোকে ব্যথায়, ক্ষুধায়, হয় তো মৃত্যুতেও, ভরে দিয়ে নিজের সমৃদ্ধি ও সম্মান সঞ্চয় করে চলবে সে।

সঞ্চয় করতে পারা যেত কি না বিধাতা জানেন—কিন্তু সে রকম নির্মম অক্লান্ত চেষ্টার পথ ধরতে গিয়ে সন্তোষের জীবনে কোনো বাধা ছিল না।

নিজের উপলব্ধি আজ তার সে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

অসাধারণ পথের অসম সাহস ও রক্তাক্ততা দিয়ে কোনো দরকার নেই তার। সাধারণ সামান্য জীবনের দায়িত্বগুলোকে সন্তুষ্ট করে এই শান্ত মধুরতার পথেই চলুক সে।

পৃথিবীর আদর-অভ্যর্থনার কোলাহলময় দারুণ রুদ্র জীবন না হয় একেবারেই চাপা পড়ে রইল।

তা হোক। সামান্য মানুষের কর্তব্যগুলোকে পালন করে, সহজ দাবিদাওয়াগুলোর ভিতর দিয়ে জীবনটাকে নিভৃতভাবে চালিয়ে, জীবনে স্নিগ্ধতা চাচ্ছে সন্তোষ।

এরই জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে সে।

সন্তোষের স্ত্রী পূর্ণিমাও স্বামীকে ভরসা দিচ্ছে—চাকরি-বাকরি টাকাকড়ি সচ্ছলতা শিগগিরই হবে তাদের। তার পর দিদিকে, ছোট বোন টুকুকে, আর মামাকে পূর্ণিমা নিজের কাছে এনে রাখবে।

ভবিষ্যতের এই ব্যবস্থার কথা ভেবে পরিতৃপ্তি পাচ্ছে পূর্ণিমা। পূর্ণিমার কাছে এটা দায়িত্বপালনের তৃপ্তি নয় শুধু, আরো ঢের সরসতা আছে এর ভিতর। পূর্ণিমা যেমন, তার বোন কটিও দেখতে খুবই সুন্দর।

সন্তোষও নিজে জানে শালী কটিকে নিজেদের আশ্রয়ে এনে শুকনো কঠিন কর্তব্যপালন করাই হল না শুধু: এর ভিতর ঢের সফলতা ও কোমলতাও আছে—বেশ একটা নীড় তৈরি হবে, যেন পৃথিবীর কয়েকটি নিরুপম নিবিড় পাখিদের নিয়ে।

পূর্ণিমাও যেমন—তার বোন কটিও দেখতে খুবই সুন্দর। কিন্তু তবুও এর ভিতর কোনো অবান্তর ক্ষুধা, পিপাসা, কামনার কথা নেই—কিন্তু সহজ সরসতা সেদিন প্রতি খুঁটিনাটিতেই কত যে ফুটে উঠবে জানে না কি সে?

সন্তোষ সবই জানত।

পূর্ণিমাও যেমন—তার বোন কটিও দেখতে খুবই সুন্দর।

বিধবা আশ্রমের কাজটি, চামেলিদি, এদের সকলেরই জীবনের বর্তমান এই দুরবস্থার সময় রাখলেই পারত। তবুও যে কয়েকটি টাকা পাচ্ছিল তাতে ওদের তো চলে যেত। সন্তোষরাও নিজেদের টেনে-হিঁচড়ে চালাচ্ছিল এক রকমে। কিন্তু এখন কী হবে, না হবে, ভাবতে পারছিল না সন্তোষ। সকলকে নিয়ে একটা সুব্যবস্থার ভিতর থাকতে হলে যে সুস্থির চেষ্টার প্রয়োজন, জীবনের সেই স্থির ধীরতা এমন অন্যায্য রকমে ও আকস্মিকভাবে আঘাত খেয়ে বসেছে যে ওদের এখন নানা রকম বিপাকই সম্ভব—বিশেষত ওদের রূপ চারদিকে যে-রকম লোলুপতা জাগিয়ে চলে এবং নিজেদের দু জনের তখন দুশ্চিন্তার আর শেষ থাকবে না।

সন্তোষের দুশ্চিন্তার গভীরতা অনেক দূর পর্যন্ত পেঁছুবে।

সন্তোষ খবরের কাগজের বিশেষ কলমগুলো দেখে যাচ্ছিল।

পূর্ণিমা বললে, 'চিঠি আছে।'

—'কার?'

—'মামার।'

চিঠি পড়তে-পড়তে পূর্ণিমা হঠাৎ অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে, 'সুখবর আছে।'

কাগজের ওপর থেকে উঁকি মেরে সন্তোষ বললে, 'কী রকম ?'

—'ভেবে দেখো তো! কী।'

পূর্ণিমার সুখবরের জন্য তেমন কিছু কৌতূহল না থাকলেও সন্তোষ একটু বুঝি আগ্রহ দেখাতে চেষ্টা করছে—বেচারি আঘাত পাবে না-হলে।

পূর্ণিমা বললে—'কই, বলতে তো পারলে না।'

সন্তোষ কাগজের এক শিট তুলে নিয়ে বললে, 'দাঁড়াও না, আগে বলো সুখবর কার, আমাদের না অন্য কারো ?'

—'ধেত্তরি তার ! পূর্ণিমা ভ্রূকুটি করে হেসে উঠে বললে, 'তোমার মুণ্ডু, দিদির বিয়ে হচ্ছে।'

—'বিয়ে ? চামেলিদির ?'

—'বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি ?'

সন্তোষ প্রথম ধাক্কাটা একটু সামলে নিয়ে বললে—'সুন্দরী মানুষদের বিয়ে না-হওয়াটাই তো রহস্যের জিনিশ।'

একটু থেমে বললে—'আমি এত দিন ভাবছিলাম যে দিদি হয় তো সঙ্কল্পই করেছেন যে বিয়ে করবেন না ; নইলে অমন রূপসীর জন্য পাত্রের অভাব ছিল ?'

পূর্ণিমা শুরু করলে, 'রূপসী কি টুকু নয় ? আমি নই ? লোকে বলে দিদিরই বরং আমাদের চেয়ে রূপ কম।'

—'কথাটা সত্যি বটে।'

পূর্ণিমা বললে, 'কিন্তু আমরা গরিব বলে—'

সন্তোষ বললে, 'তা ঠিক ; তোমার মত সুন্দরী যদি বড় লোকের ঘরে হত, তা হলে বিয়ে তো বিয়ে—তোমাকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখবার অধিকারও হয় তো আমার থাকত না।'

হাসছিল সন্তোষ।

পূর্ণিমা হয় তো একটু আঘাত পেয়ে নিজের জীবনের অন্য রকম একটা সম্ভাবনার কথা ভাবছিল। তা সে ভাবতে পারে। এত রূপলাবণ্য, সুস্থতা, সামর্থ্য নিয়ে কী পুরস্কার পেল সে ? দিনের পর দিন একটু সামান্য সচ্ছলতার

তৃপ্তির জন্যও কত যে দুর্ভাবনা ভুগতে হয় তাকে! এমন অপরূপ সম্পন্নতা তার যদি এই দামেই বিকোয় পৃথিবীতে বিচার কোথায় তা হলে?

এই সব সন্দেহ ব্যথায় পূর্ণিমা এখন কষ্ট পাচ্ছে কী না জানে না সন্তোষ— 'কিন্তু মাঝে-মাঝে এখন নানা কথা ভেবে খুবই ব্যথা পায় মেয়েটি; কেনই-বা পাবে না? ওর ব্যথার গভীরতার অনুপাতে ওর জীবনের পরম তৎপরপ্রিয়তা ধরা পড়ে। সন্তোষের প্রশ্নগুলোর জন্য বিষম উত্তর সব তৈরি রয়েছে যেন মেয়েটির হৃদয়ে; সন্তোষের দারুণ উত্তরের জন্য মর্মান্তিক প্রত্যুত্তর সব। তবুও তারপর উপশম রয়েছে; মুছে দিতে আসে কিন্তু সেটা কতদূর অন্তরের বুঝতে পারা যায় না সব সময়।

যাক- পূর্ণিমা একটা সফল সমাধান মোটেই নয়।

শেষ পর্যন্ত সন্তোষের জীবনের আশ্রয় কোথায় গিয়েছে—জানে না সে।

—'পুরুষ মানুষ যদি হতাম চাকরির জন্য নর্থপোলে যেতে হলেও আমি সেটা ভাগ্যই মনে করতাম,' পূর্ণিমা বললে, 'দিদির খুব বড় লোকের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে।'

সন্তোষ খবরের কাগজের শিটে একটা মৃদু ভাঁজ দিয়ে বললে—'কী করে জামাই?'

—'বম্বেতে খুব বড় চাকরি করে।'

—'বম্বে!'

পূর্ণিমা বললে, 'বম্বে শুনে তুমি নাক সিঁটকালে কেন শুনি?'

সন্তোষ বললে, 'না তা নয়; ভাবছিলাম বম্বে—তেমন আ[illegible] কী—কিন্তু—'

পূর্ণিমা বললে, 'বম্বেতে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে আছেন।'

সন্তোষ দু-এক মিনিট আবিষ্টের মত থেকে বললে, 'বাঙালি আজকাল অত বড় চাকরি পায়? আরো, বম্বেতে গিয়ে?'

পূর্ণিমা একটু শ্লেষের সঙ্গে বললে—'শক্তি থাকলেই পায়।'

—'মামা লিখেছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'আর কী লিখেছেন?'

—'কয়েক বছর ধরে ছেলেটি বম্বেতে আছেন।'

সন্তোষ একটু বিস্মিত হয়ে বললে—'ওর বয়েস কত?'

পূর্ণিমাও একটু বিদ্রূপের সুরে বললে—'দিদির চেয়ে বড় নিশ্চয়ই—কিন্তু তোমার চেয়ে ছোট ঢের।'

সন্তোষ একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, 'আমার চেয়ে ঢের ছোট আর কী করে হয়—বম্বেতে তো কয়েক বছর ধরেই আছেন—ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে নতুন লোক শিগগির নেয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।'

সন্তোষ একটু নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে বললে, 'হয় তো ছোটই হবে আমার থেকে।' একটু পরে মাথা তুলে একটু মৃদু রহস্য করে সন্তোষ বললে, 'তিন বোনের ভেতর সবচেয়ে রূপসী সতেজ মানুষটিই গেল এক বুড়ো অকর্মণ্যের হাতে; জীবনের বিচার, বিবেক, পুরস্কারের এই রকম উপলব্ধি নিয়ে সৃষ্টিটা কোন দিকে যাবে? টিকবেও-বা কত দিন? টিকলেও এর সার্থকতাই-বা কী?'

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সন্তোষের নিজের কাছেই ছিল। পৃথিবীতে সে আনন্দ উৎসব সম্ভোগ করতে আসে নি, এসেছে সহ্য করতে, জীবনের তামাশাটা বুঝে নিতে। কিন্তু পূর্ণিমাকে সেই রকম গোপন, নিশ্চয় জীবনের ভিতর জীবিত করে নেবার না আছে কোনো অধিকার সন্তোষের, না আছে কোনো সাহস; রুচি নেই—প্রয়োজন নেই।

পূর্ণিমা দু-এক মিনিট মাথা হেঁট করে চুপ করে রইল।

আস্তে-আস্তে মুখ তুলে বললে—'রঙ্গ করতেই শিখে এসেছিলে শুধু—এই জন্যই তোমার কিছু হল না। পুরুষ মানুষের যা কর্তব্য তা করতে পারো না? নিজেকে কেন এতটা হীন করে ফেলতে চাও?'

কিন্তু পূর্ণিমা নিজের বিবাহিত জীবনের সঙ্গে গভীর সংলগ্ন একটা দুঃখকে চাপবার জন্যই বড়-বড় সাহসের কথাগুলো পেড়ে যাচ্ছে শুধু। দুর্বৃত্ত জীবন—যা মেয়েমানুষকে, রূপকে, রসকে, আগ্রহ আন্তরিকতা যত্ন প্রয়াসকে, কুটোর চেয়েও নগণ্য মনে করে—সেই জীবনেরই একটি পরম কৃপার পাত্র হয়ে বেঁচে থেকেও পূর্ণিমা তাকেই চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে চাচ্ছে। প্রবল, দুর্দান্ত জীবন তামাশা বোধ করে, গোপনে হেসে চলেছে যে, পূর্ণিমা যদি কোনোদিন তা দেখত!

পূর্ণিমা একটু আশ্বস্ত হয়ে বললে—'বাপ-মা নেই আমাদের—আমরা অকূলে ভাসছিলাম। ভেবেই পেতাম না দিদির কী হবে, ওর যে এমন সুন্দর একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল এতে আমাদের সকলেরই মঙ্গল হবে।'

পূর্ণিমা তার নিজের ভাগ্যকে দিদির ভাগ্যের সঙ্গে তুলনা করে এতক্ষণ ব্যথা পেয়ে এ জিনিশটার উপশমের দিকটা খুঁজে বের করে তৃপ্তি পাচ্ছে। জীবনের অন্ধকারের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকবার মত সহ্যশক্তি, সহিষ্ণুতা বা তামাশাবোধ নেই পূর্ণিমার। এ উজ্জ্বল পথের যাত্রী—ওর দিদির চেয়েও ঢের বেশি করে। কিন্তু একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ সমুদ্রের মত হতাশার অমাবস্যা যে ওর চারদিকে! ওর ভিতর থেকে ও কী দিয়ে যে কী করবে ভাবতে পারছে না সন্তোষ।

পূর্ণিমা বললে, 'জামাইবাবুর জন্য টুকুরও, দেখো, একটা ভাল বিয়ে হবে! কী বলো?'

সন্তোষ কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

পূর্ণিমা বললে, 'আর রবিনেরও পড়াশুনোর সুবিধে হবে; টুইশনি পাচ্ছিল না—দিদিও চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। টাকার জন্য ওর বি-এ পড়া হত না বোধ হয় আর। কিন্তু এখন,' পূর্ণিমা হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে, 'এখন তো জামাইবাবুই ওকে পড়াতে পারবেন; অত বড় চাকরিওয়ালা, চাকরিও দিতে পারবেন—হয়তো বিলেত ঘুরিয়েই আনলেন—কী বলো? অসম্ভব কি কিছু?'

সন্তোষ ঘাড় নেড়ে বললে, 'না।'

—'এমন তো কত জায়গায়ই হচ্ছে—হচ্ছে না?'

সন্তোষ বললে—'হচ্ছে বই কি।'

পূর্ণিমা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললে—'সুখের মুখ এইবার দেখলাম আমরা। এতদিন আমরা ভাইবোন মিলে কষ্টই পেয়ে আসছিলাম।'

সন্তোষ পূর্ণিমাকে আশ্বাস দিয়ে বললে—'তোমারও সুখ। সুখ বই-কি; ওদের সুখে তোমারও সুখ।'

অনুভূতির এই সুখটুকু, এ ছাড়া ব্যক্তিগত কোনো সুখ-সম্পদ-আশ্রয় তার দিদির এ বিবাহের থেকে পূর্ণিমা কি আর আহরণ করতে পারবে? আহরণের উচ্ছিষ্ট যদিও বা কিছু থাকে টুকু-রবিনের জন্য—সন্তোষকে গ্রহণ করে পূর্ণিমার সে সব সুযোগ চলে গিয়েছে।

'কিন্তু পরের সুখেও—তেমন ভাবে গ্রহণ করে নিলে—সুখী হতে পারা যায়। আর এরা তো তোমার ভাইবোন, পূর্ণিমা।'

পূর্ণিমা বললে—'আমারও এত দিন পর একটা নিস্তার, মামার জন্য আমাদের ভাবনা ছিল বড্ড।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পূর্ণিমা বললে, 'কিন্তু এই সমস্ত যদি তোমাকে দিয়ে হত।'

এক মিনিট চুপ।

পূর্ণিমা ব্যথায় জড়িয়ে বললে—'কিন্তু যা হবার নয়—তা হয় না; নইলে এ দু-তিন বছরের ভেতর তুমি তেমন একটা চাকরি খুঁজে পেলে না? অনুপযুক্ত হলে আর-এক কথা ছিল—কিন্তু তাও তো নয়?'

পূর্ণিমা তেমনি কষ্টের সঙ্গে বললে—'কিন্তু দিনের পর যত দিন যায় মনে হয় তুমি কি উপযুক্ত!'

সন্তোষ শুনছিল।

পূর্ণিমা বললে—'অন্তত জামাইবাবুর কাছে তুমি আর কে? অত বড় চাকরি! অমন সাহেবি! সে কী সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য আমরা ভাবতেও পারি না।'

আধ মিনিট চুপ থেকে বললে, 'অত শত কিছু চাইও না। থাকলই-বা রূপগুণ টুকুর—আমাদের মাঝারি জীবন হলেই চলে যায়। নিতান্ত অভাবে পড়ে না মরলেই হল। আজকালকার স্বদেশীর দিনে তবে সাহেবিই বা কে চায়? কিন্তু তাই বলে একটু সচ্ছলতাও কি থাকবার নয়? কতদিন আর এমন ছ্যাঁচড়ামির ভেতর দিয়ে টিকে থাকতে পারা যায়? টাকাকড়ির গর্ব চাইনে—কিন্তু মানুষের জীবনের জন্য যে-স্বাধীনতাটুকুর দরকার সেই হলেই হত। কিন্তু কিছুই তো হল না।'

সন্তোষ পূর্ণিমার হাতটা ঈষৎ আবেগের সঙ্গে টেনে নিয়ে বললে—'ছি, এত হতাশ হয়ে পড়তে হয় কি? তোমাকে কতবার আমি বলেছি, সবই হবে, শুধু একটু প্রতীক্ষা দরকার। তুমি দেখেছই তো, পূর্ণিমা, কত রকম যত্ন করছি আমি। নিশ্চয়ই হবে, নিশ্চয়ই হবে—ছি, অত নিরাশ হয়ে পড়তে হয় না লক্ষ্মীটি—'

পূর্ণিমা সন্তোষের ঘাড়ে মাথা রেখে ব্যথায় অভিভূত হয়ে পড়ে বললে—'আর কত দিন অপেক্ষা করব আমি? আমি যে আর পারি না।'

সন্তোষ আশ্বাস দিয়ে বললে—'আর বেশি দিন নয়। শিগগিরই একটা কিছু হবে ভাবছি। না-হয় সেই যে-এজেন্সির কথাটা বলেছিলাম তোমাকে, তাই

নেব।'

পূর্ণিমা একটু নিস্তার পেয়ে বললে—'ভাবছিলাম রবিনকে পড়াব, টুকুকে আমার কাছে এনে রাখব। দু বছর ধরে এই চেষ্টাই তো চলেছে। কিন্তু এখনও তা পারলাম না যে—'

সন্তোষ বললে, 'তা পারবে—পারবে। না-হয় তোমার দিদিই এখন দেখবেন।'

পূর্ণিমা আহত হয়ে বললে—'সব দিক দিয়েই দিদির ভাগ্য আমার চেয়ে বেশি। ওদের মানুষ করার ভাগ্যও তারই হাতে--' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পূর্ণিমা উঠে দাঁড়াল।

বললে—'দিদির বিয়েটা হয়ে যাক—তার পর রবিনকে মেডিকেল লাইনে দেবার জন্য দিদিকে লিখব।'

এই প্রস্তাবের উপযুক্ততা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য না করে সন্তোষ বললে—'তা লিখো।'

—'তোমারও হয় তো কিছু সুবিধে হতে পারে; মেডিকেল লাইনে নয় অবিশ্যি—কিন্তু বম্বে-টম্বের দিকে—অত বড় চাকুরে কি না—'

সে সুবিধা-অসুবিধার পরিপূর্ণবোধ সন্তোষের আছে; জীবন ঢের শিখিয়েছে তাকে। কিন্তু সে-সব উদ্ঘাটন করে এই মেয়েটিকে তেমন কঠিন আঘাত দেওয়ার থেকে এর এই আশা-ভরসা ও স্বপ্নের ভুলের ভিতরেই পূর্ণিমাকে রেখে দেবার প্রয়োজন বোধ করছে সন্তোষ।

তার পর একদিন সুদিন যখন আসবে—এই মেয়েটিকে জীবনের নানা রকম সত্য শেখানো যাবে তখন।

এই সবের জন্য অপেক্ষা করছে সন্তোষ।

চার-পাঁচ দিন পর মামাশ্বশুরের চিঠি এসেছে আবার।

সন্তোষ বললে—'কী লিখেছেন?'

পূর্ণিমা বললে—'তুমি কি কলকাতায় যাচ্ছ?'

'কে? আমি?'

'হ্যাঁ।'

সন্তোষ একটু স্থির থেকে বললে—'যেতে তো হবেই।'

—'কতকগুলো জিনিশ চেষ্টা করে দেখবার আছে—তার পর কিছু না হলে সেই এজেন্সিটা'

পূর্ণিমা বললে—'মামাবাবু আর দিদিও কলকাতায় যাচ্ছেন।'

—'কবে ?'

—'শিগগিরই ; তাঁরা আশা করেছেন তুমিও যাবে।'

—'আমি ? তা যাব বই-কি !'

পূর্ণিমা মনের ভিতর কী-একটা প্রস্তাব ফেঁদে ফেলতে-ফেলতে বললে—'তা যেও, বেশ তাড়াতাড়ি যেও ; ক-দিন ধরে তো যাবে-যাবে বলছিলেই—আজকালই তো যেতে। মিছিমিছি বাড়িতে বসে থেকে লাভ কী ? তার চেয়ে ওখানে গিয়ে জোগাড়জাগাড়ের পথও দেখা যায়—কিন্তু তা ছাড়া ওদের সঙ্গেও দেখা হবে এবার। দিদির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে আগের থেকে কথাবার্তা বলে রাখা ভাল।'

সন্তোষ বললে—'কী কথা ?' নিজেই থমকে গিয়ে বললে, 'ওঃ সেই ?'

—'হ্যাঁ গো, সেই চাকরি-বাকরির চেষ্টাই ! জামাইবাবুর এত বড় কাজ—দিদিকে দিয়ে একটা কিছু কি না হবে ?'

পূর্ণিমার এই নিদারুণ সরলতা এই দু বছরের ভিতর কতবার ভাঙল-গড়ল ! আবার তা ভাঙছে, গড়ে উঠছে আবার। এই বিষম প্রক্রিয়ার কোনোদিনও কি শেষ হবে না আর ?

পূর্ণিমাকে বলতে ইচ্ছা করে যে চামেলিদির স্বামী তাকে যে-চোখেই দেখুন না কেন—খুব ভাল চোখেই এখন দেখে নিন না—সন্তোষের শিক্ষা-দীক্ষা রুচি-প্রয়োজনের সঙ্গে ডাক্তার মানুষটি নিজেকে এত কম সংশ্লিষ্ট মনে করবেন যে বিয়ের আগের কয়েকটা দিন সন্তোষের সঙ্গে অপর্যাপ্ত ভদ্রতা ও খাতির করলেও বিয়ের পর কারো সঙ্গে কারো কোনো সংস্রবও থাকবে না। এ হবেই ; এ হতে বাধ্য ; এরা দু জনেই একেবারে আলাদা জগতের লোক যে, চাকরি-বাকরি জোগাড় দূরের কথা, সন্তোষ কোনো সহানুভূতিরও প্রত্যাশা রাখে না, একটুও প্রয়োজন বোধ করে না। চামেলিদির বিয়ে পর্যন্ত কলকাতার দিনগুলোর ভিতর ঢের গোপন স্নেহের ইশারা সে পাচ্ছে, নিজের মনের ভিতর ঢের নিভৃত আমোদও অনুভব করবে সে—এই মাত্র।

এ ছাড়া আর-কিছু নয়। সন্তোষ একা থাকলে মনের নানা রকম গোপন আমোদ নিয়ে জীবনটা বেশ চলে যেত তার, কিন্তু পূর্ণিমার লক্ষ্য একেবারেই আলাদা এবং সেটাকে পরিপূর্ণরূপেই স্বীকার করতে হবে যে।

পূর্ণিমা বললে—'আজ মঙ্গলবার। আসছে শুক্রবারের পরের শুক্রবার দিদিরা গিয়ে কলকাতায় পৌঁছবেন—তুমি না-হয় এই শুক্রবারই কলকাতায় চলে যাও।'

—'যেতে হবে বটে, কিন্তু এই শুক্রবারই?'

পূর্ণিমা এ-রকম উদাসীন প্রশ্নে অত্যন্ত আঘাত পাচ্ছে, বিরক্ত হচ্ছে।

—'সুযোগ না বুঝতে পেরেই তুমি মরলে।'

সন্তোষ বললে—'জামাইবাবুও কলকাতায় আসছেন না কি?'

—'তিনিও আসবেন বই-কি।'

—'মামাবাবু কিছু লিখেছেন না কি চিঠিতে, সে সব কথা?'

—'না।'

—'তা হলে ওরা মিছিমিছি কলকাতায় গিয়ে কী করছে?'

—'মিছিমিছি নিশ্চয়ই নয়। মামাবাবু না জেনেশুনে এত টাকা খরচ করতে যাচ্ছেন না আর। বুড়ো মানুষ—সব কথা গুছিয়ে লিখতে পারেন নি হয় তো। আমার মনে হয়—বিরাজবাবু শিগগিরই আসবেন।'

—'বিরাজ? তোমার দিদির জামাইয়ের নাম?'

—'হ্যাঁ গো।'

সন্তোষ বললে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাচ্ছি—তোমার মামাও হয় তো খুলে লেখেন নি কিছু—কোথায় দেখা হল দিদির সঙ্গে বিরাজবাবুর? আমরা একটুও জানলাম না! তিনি বম্বের থেকে কবেই-বা এদিকে এলেন?'

পূর্ণিমা একটু মুগ্ধ হয়ে হেসে বললে—'এসেছিলেন নিশ্চয়ই—না হলে আর হাওয়ায়-হাওয়ায় তো কিছু হয়ে ওঠে নি। এসেছিলেন, দিদিকে দেখেছেন, পছন্দ হয়েছে, বিয়ের তারিখ অব্দি ঠিক হয়ে গেছে, এই সবই সত্যি কথা। বিশ্বেস না হয়—এই চিঠিগুলো দেখো।'

মামাবাবুর চিঠি সন্তোষের কোলের উপর ছুঁড়ে ফেললে পূর্ণিমা। বললে—'জানাবেনই বা কেন তোমাকে? দিদির চাকরি যখন গেল, আমার ভাইবোনদের একটা আশ্রয় দিতে পেরেছিলে তুমি? পেরেছিলে মামাবাবুর

বোঝা কিছু হালকা করতে ? ঐ রকমই সব। নিজের দিক দিয়েই ভেবে দেখ। পরের কাছ থেকে প্রত্যাশা করলে নিজেকেও আশা-আশ্রয় দিতে হয়।'

পূর্ণিমা বললে—'তুমি হয় তো বলবে যে উপায় থাকলে তো ওদের আমি আশ্রয় দেব। কিন্তু এ একটা কথাই হল না। উপায় অর্জন করবার মত শক্তি তোমার হল না কেন ? কেন তবে বিয়ে করতে গেলে। বোঝো নি কি যে বিয়ে করবার সঙ্গে-সঙ্গে নানা রকম দায়িত্ব এসে মানুষকে জড়ায় ?'

এক-আধ মিনিট পরে একটু নরম হয়ে বললে, 'যাক সে-সব, নাও এখন তুমি যাবার বন্দোবস্ত করো। বিরাজবাবু শিগগিরই কলকাতায় আসছেন—বিয়ের তারিখটা আরো কিছু এগিয়ে পড়বে হয় তো। তা হলে এক মাসের ভিতরেই ওদের বিয়ে হয়ে যাবে।'

এখন আর অবিলম্বে কলকাতায় না গেলেই চলে না।

চামেলিদি সন্তোষকে লিখেছে কী করে কোথায় তার সঙ্গে দেখা হল ; তিনি না কি চামেলিদির রূপের কথা আগেই শুনেছিলেন। আগেই কলকাতায় একবার দেখেছিলেন পূর্ণিমার দিদিকে, জীবনের এ সব গোপন কথা—এদের দু জনেরই—আগে কাউকেই জানানো হয় নি—সন্তোষকেও না, পূর্ণিমাকেও না। ঠিকঠাক [না] হতে জানানো যে উচিত মনে করেন নি—চামেলিদি হয় তো জানাতে পারত—তার দিক থেকে তা কি অবিসংবাদী সত্য নয় ?

তা ঠিকই তো। তা ঠিক।

জীবনের নানা রকম স্থির নিয়ম ও সিদ্ধান্তকে বোধ করবার ক্ষমতা এবং সেগুলোর প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধায় চামেলিদির চিঠি এমন স্নিগ্ধ।

এই মেয়েমানুষটিকে বরাবরই অনুভব করে দেখেছে সন্তোষ। মানুষের জীবনের এমন কোমল মমতাময় বিবেচক এই লোকটি, এমন নিভৃত, এমন মৃদু সৌন্দর্যে রূপবতী, এত সহিষ্ণু যে নিজের ভবিষ্যৎ নীড়ের ভিতর এর নিতান্তই প্রয়োজন বোধ করেছিল সন্তোষ—একে ছাড়া চলবে না যে ! জীবনের নানা রকম রুক্ষতা ও রক্তাক্ততার ওপর উপশমের মত এই মেয়েটি থেকে যেত। কিন্তু তার নিজের জীবনের প্রয়োজনের দিকে চলেছে চামেলিদি। তাকে

ছাড়তে হবে।

পৃথিবীতে কোথাও বিরাজের মত ডাক্তারেরও হয় তো এরই জন্য আবশ্যকতা ছিল।

নীড়ের থেকে একটা পাখি খসে পড়ল।

সে নীড় মনের ভিতরই তৈরি হচ্ছিল, কল্পনার ভিতর দিয়েই তার প্রক্রিয়া চলেছে, পরিবর্তন চলেছে। কোথায় গিয়ে যে তার পরিণতি সন্তোষ জানে না, কেউ জানে না।

পূর্ণিমা বললে—'এক মাসের ভিতরেই সব, এবার আর দেরি নয়।'

সন্তোষ বললে—'তুমিও চলো তা হলে।'

কিন্তু পূর্ণিমা কী করে যাবে? পেটের ভেতর সন্তান যে তার। অত্যন্ত অগ্রসরগ্রস্ত।

এই আরেকটা শস্ত্র। বিবেক-বিচারের সমস্ত শক্তি দিয়েও এ আঘাতকে গ্রহণ করলে চলে না যেন! এ আঘাত যেন আরো তীক্ষ্ণ—জীবনের কাছ থেকে আরো গভীর উপলব্ধি দিয়ে প্রতি মুহূর্তেই নিজের বিচার পাচ্ছে যেন। গভীর অনুভূতিশীল মানুষের জীবনও তত ক্ষুধা মেটাতে পারে না যে।

পূর্ণিমা বললে—'কলকাতায় যাবার উপায় রেখেছ তুমি?'

কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে সন্তোষকে অনেক দিন ধরে অনেক পীড়ন করেছে পূর্ণিমা। কিন্তু জীবনে, এ দু বছরের জীবনটিতে তার, নিজেই সে যে উৎপীড়িতা হয়েছে ঢের বেশি—জীবনের দুঃসময়ে সন্তানকে পেটে ধরেই শুধু নয়—সন্তোষের সঙ্গে, পূর্ণিমার এমন অপরূপ অসামান্য সম্পন্ন জীবনটাকে মিলিয়ে দিয়ে, এই নিরর্থক ভ্রষ্ট দাম্পত্যের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তেই যেন—

কিন্তু তবুও সন্তোষকে আজ নিজের এই মর্মান্তিক গর্ভের কথা নিয়ে আর-একটা কঠিন কথাও বলছে না পূর্ণিমা।

ক্ষমা করেছে সন্তোষকে সে। স্বামী তার একটা চাকরি জুটিয়ে নিক, সচ্ছল হোক, সাংসারিক স্বাধীনতা অর্জন করুক, তার পর তাদের দু জনের জীবনেই ঢের পরিতৃপ্তির সময় আসবে। এই সব বলছে পূর্ণিমা? পূর্ণিমা খুব মমতা নিয়ে কথা বলছে। নিজের ভরা পেটের যথেষ্ট কষ্ট-ব্যাঘাত নিয়েও সন্তোষের জিনিশ পত্রের সুশৃঙ্খল গোছগাছ করে দিচ্ছে সে—কলকাতায় যেতে

এবার সন্তোষের কী-কী লাগবে, গিয়েই-বা কিসের-কিসের প্রয়োজন, সমস্তই যথাসাধ্য জুগিয়ে দিতে লেগে গেছে পূর্ণিমা।

সন্তোষ এবার একটু মুগ্ধ হয়েই কলকাতায় এসেছে।
একটা উপযুক্ত মতন আয়ের ব্যবস্থা দেখে নিতে পারলে জীবনে তাদের পরিতৃপ্তির অভাব হবে না—তারও না, পূর্ণিমারও না।
এই সুস্থিরতা-নিশ্চয়তা, ঘুম-শান্তি-কাজ ও পরিণতির মধুরতা এই? জীবনের থেকে এমন বিচিত্র ব্যবস্থাকে অধিকার করে নেবার জন্য সন্তোষের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চলেছে কলকাতায় এবার। ছ-সাত দিন কেটে গিয়েছে।
এক দিন ভোরের বেলায় মামাবাবুর একটা কার্ড পাওয়া গেল। কলকাতায় তারা দু-দিন হল এসেছে—কিন্তু ব্যস্ততায় সন্তোষকে খবর দিতে পারে নি; সন্তোষ যেন চিঠি পেয়েই অবিলম্বেই গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে।
মামাবাবুর চিঠিতে কোনো ঠিকানা নেই।
পর দিন চামেলিদির খাম এসেছে—নিজের প্রতি মৃদু ভৎ‍্সনা, সন্তোষের কাছে নিবিড় অনুযোগ—কিছু মনে করে না যেন সন্তোষ এর আগে খবর দেওয়া হয় নি বলে; অবিলম্বেই দেখা করবার জন্য চলে আসে যেন—ঠিকানাও রয়েছে বটে; পরিষ্কার মৃদু হাতের রূপসী চিঠিখানা এই।
এই সাত-আট দিন কলকাতার নানা রকম হিংস্র ঝঞ্ঝাটের মাথায়, মেসের রুক্ষ কঠিনতার মধ্যে চামেলিদির এই দু পাতা একটা গভীর প্রবোধের মত এসে পড়েছে।
পূর্ণিমা ঢের দূরে। জীবনে আর আত্মীয় কোথাও কেউ নেই তো।
কলকাতায় এসে বন্ধু বলেও এবার কাউকে গ্রহণ করতে পারে নি সন্তোষ। চারদিককার নিঃসঙ্গতা নির্জন রক্তপ্রবণতার মধ্যে বন্ধুই শুধু নয়—ওর মতন একটু আত্মীয়ার পরশ যেন সে চায়—আত্মীয়ার, পরমাত্মীয়ার।

চামেলিদি চেয়ারটা এগিয়ে দিল
সন্তোষ বসল।

সে রইল দাঁড়িয়ে।

সন্তোষ কিছু বললে না।

চামেলি বললে—'আপনাকে স্টেশনে গিয়ে আমাদের রিসিভ করতে বলি নি কেন, জানেন? একে তো এই ভীষণ শীত—তার ওপর ট্রেন ভোর চারটে-সাড়ে চারটের সময় কলকাতায় আসে। ঐ সময়ে মানুষকে মানুষ কেউ বিব্রত করতে যায়?'

চামেলি নিজের মনের মুগ্ধতায় একটু হাসল।

বললে—'পূর্ণিমা কেমন আছে? ভাল তো? বাড়ির সব ভাল?'

সন্তোষ ঘাড় নেড়ে বললে—'ভালই।'

চামেলি বলে—'মামাবাবু বেরিয়ে গেছেন।'

—'কখন ফিরবেন?'

—'বেলা এগারটা-বারটার আগে না—'

—'বিয়ের যোগাড়-যন্ত্র করছেন বুঝি?'

চামেলি একটু ঘাড় কাত করে, কোনো জবাব দিল না।

সন্তোষ বললে—'আমার যথেষ্ট অবসর আছে, খাটবারও খুব প্রবল ইচ্ছা, কী-কী করতে হবে, বলুন।'

চামেলি বললে—'কিছু না, বিয়ে সে-রকম ভাবে হবে না! খুবই চুপচাপে হয়ে যাবে; লোকজনকে খাওয়ানোও হবে না। নিমন্ত্রিতও দু-পাঁচজন মাত্র। আমাদের কিছু করবার নেই—সত্যি বলছি আপনাকে—'

সন্তোষ বললে—'ভালই, আমিও হুড়হাঙ্গামার পক্ষপাতী নই। গরিবদের জাঁকজমকেরই বা কী প্রয়োজন?'

চামেলি বললে—'মামাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করবেন। কাজ নেই বললাম বলে আপনি হয় তো আর এ দিক মাড়াবেন না। আসবেন কিন্তু।'

সন্তোষ বললে—'এখনো তো চলে যাচ্ছি না।'

চামেলি হাসছিল।

সন্তোষ বললে—'এ বাড়িটা কাদের? বেশ তো বাড়ি!'

চামেলি বললে—'মামাবাবুর এক বন্ধুর—'

চামেলি বললে—'কলকাতায় তো কয়েক দিন হল এসেছেন—কিছু সুবিধে-টুবিধে হল?'

সন্তোষ ঘাড় নাড়ল।

চামেলি বললে—'হবেই-বা কী? আমি নিজেও তো সেদিন পিকেটিং করেছিলাম। বিধবাশ্রমের স্কুলের কথা বলছি—সেক্রেটারি কত অনুযোগ করলেন, কিন্তু স্কুলের টিচার হয়েও মেয়েদের সঙ্গে পিকেটিং করলাম আমি—'

চামেলি একটু বললে—'দেখুন, কী রকম আখখুটে মেয়ে আমি; সব দিক থেকেই সকলে বললে—কাজটা ছেড়ো না তুমি চামেলি···মামাবাবু কত সাধলেন, আপনিও লিখলেন, কিন্তু আমার জেদ আমি রাখলামই—কী দারুণ বলুন তো দেখি। কোথায় কূল পেতাম, বলুন? কিন্তু সে-সব ভেবে দেখবার মত মন থাকে কারো?'

চামেলি অত্যন্ত গভীর ভাবে অনুভব করে হাসতে লাগল।

বললে—'দেশের নাড়ী-নক্ষত্র যে কোথায় নিজেরই তো খুব ভাল করে জানা আছে আমার। এ আর চাকরি-বাকরির সময় নয় যেন! কে কাকে তা দেবেই-বা বলুন—'

একটু থেমে বললে—'কিন্তু বিবাহিত লোকের পক্ষে পিকেটিং করাও মোটেই সম্ভব নয়। কী যে করবে তারা—'

চামেলি বললে—'এ কয়দিন কতকগুলো খবরের কাগজ থেকে কয়েকটা চাকরির কাটিঙ যোগাড় করেছি আপনার জন্য। দিচ্ছি আপনাকে—'

চামেলি একটা খাতার ভেতর করে [থেকে] কাটিঙস বের করে দিলে। সন্তোষ এ সবই দেখেছিল।

তবু কৃতজ্ঞতা জানালে—পকেটে সেগুলো যত্ন করে [রেখে] দিলে—বললে, 'হ্যাঁ দিদি, দরখাস্ত আমি করবই।'

চামেলি বললে, 'দেখুন।'

সন্তোষ এক-আধ মিনিট চুপ থেকে বললে, 'তিনি কবে আসছেন?'

—'বোধ হয় চার-পাঁচ দিনের ভেতরই; এক মাসের ছুটি নিয়ে আসছেন। তিনি এলে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবেন কিন্তু—করবেনই। তাঁদের বাসায় গিয়েও দেখা করতে পারেন।'

বিরাজবাবুর কলকাতার ঠিকানা জানিয়ে দিচ্ছে চামেলি।

পরের দিনই চামেলির সঙ্গে আবার দেখা।

—'আমি ভাবতে পারছিলাম না যে আপনি আসবেন, বড্ড দয়া যে! চা করে দেব?'

সন্তোষ বললে—'মিছিমিছি চায়ের ঝঞ্ঝাটে গিয়ে আমাকে কেন একা ফেলে যাবেন? বিরাজবাবু তো আজকালই এসে পড়বেন—তখন আমাদের হাতের কাজ শেষ হয়ে গেছে; আপনিও নিশ্চিন্ত—আমরাও বিমুগ্ধ!'

সন্তোষ বললে—'বিমুগ্ধ বই কি! জীবনটা একটা মুগ্ধতা ছাড়া কী-আর চামেলি দি? চারদিককার পরিবর্তন, উপহাস, অন্যায়, বেদনা মনটাকে এমন অভিভূত করে রাখছে—তিক্ততা দিয়ে নয় নিশ্চয়ই—মধুরতা দিয়ে।'

চামেলি অবাক হয়ে তাকাল।

—'মধুরতা নয়?'

চামেলি যে কী জবাব দেবে সে জানে না।

সন্তোষ বললে—'পূর্ণিমা অতটা বোঝে না, কিন্তু তুমি বুঝেছিলে। এ দু বছর দুঃখ-যন্ত্রণার আর কোনো অবধি ছিল না তোমার। কিন্তু যখনই তোমার জীবনের দিকে তাকিয়েছি তার স্নিগ্ধতা ও সহ্যশক্তি দেখে আমারও হৃদয় মধুরতায় ভরে গিয়েছে। ভেবেছি, কী রকম করে মানুষ এমন হতে পারে? জীবনের আগের মতামত আমার পরিবর্তিত হল। জীবনকে, সমস্ত জীবনকেই কী বিমুগ্ধ ভাবে তুমি যে দেখ বুঝতে পারলাম—'

সন্তোষ বললে—'কিন্তু তবুও তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য আছে। শুধু সহ্যশক্তিই তোমার সম্বল ছিল। কিন্তু একটা বিপুল তামাশাবোধ জীবনের সমস্ত মর্মান্তিকতার ভিতর আমাকে নিশ্চয় পথ দেখিয়ে দেয়।'

চামেলি বললে—'জীবনের মর্মান্তিকতাকে আমি অস্বীকার করি নে সন্তোষ। আজীবনই পূর্ণিমার চেয়েও আমি ঢের ভুগে এসেছি—তা তুমি জানো। কিন্তু তুমি যে-মুগ্ধতা আমার ভেতর দেখেছ সত্যিই তা কোনো দিন ছিল না—'

চামেলি হঠাৎ থেমে গিয়ে, একটু চুপ করে থেকে, পরে বললে—'হয় তো ছিল না।'

চামেলি বললে—'ছিল কি সন্তোষ?'

সন্তোষ বললে—'ছিলই তো—কিন্তু থাকবার কোনো প্রয়োজন ছিল কি?'

চামেলি চুপ করে ভাবছিল।

সন্তোষের মনে হল, কোনো একটা জীবনের কুয়াশা কর্কশতার ভিতর একটা

জোনাকি যেন ডুবে-ডুবে দেখছে তার সমস্ত স্নেহগুণ সহ্যগুণ মমতা মায়া নিয়ে।

কিন্তু তবুও এ চিত্র দেখবার কোনো রুচি নেই আজ সন্তোষের—বাস্তবিকই কোনো রুচি নেই, চামেলিরও নেই—কোনো রুচি নেই, কোনো প্রয়োজনও নেই ; কারণ এ ছবি একেবারেই ছিঁড়ে গেছে।

চামেলিকে বিদায় দিয়ে মনের ভিতর কোনো ক্ষোভও নেই সন্তোষের। এই মেয়েটিকেও আজ তবু একটু চিন্তিত দেখা যাচ্ছে—কিন্তু পরের দিনই নতুন জীবনের উৎফুল্লতায় সমস্ত সহানুভূতিকেও হারিয়ে ফেলছে যেন চামেলি। বিরাজের স্ত্রী হবার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত হচ্ছে সে। বিধবাশ্রমের টিচারের পক্ষে সেটা বরং শক্ত জিনিশই হত—কিন্তু রূপ, শিক্ষা, অর্জন করবার শক্তি—পরিবর্তিত হবার ক্ষমতা শুধু চামেলিরই নয়, নারীদেরই। এই সব বিশেষ অস্থি-মজ্জার জিনিশ চামেলিকে খুব সাহায্য করছে।

সে দিন সে পিকেটিং করছিল—দেশের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের ব্যবস্থা-গুলোকেই বরং দুর্বল মনে করছিল—এক মাসও কেটে যায় নি, বিলেতি দামি সেন্টেড নোট পেপারে বম্বেতে দু খানা করে চিঠি লিখছে সে রোজ। দু খানা করে পাচ্ছে ফিরে—রোজ।

অত বড় সাহেব ডাক্তারকে পিকেটার চামেলি দু বেলা করে এত কী লিখতে পারে? কিন্তু পিকেটিঙের কথা নিশ্চয়ই সে লিখছে না—বিধবাশ্রমের সেক্রেটারির স্বদেশদ্রোহিতাকে নিন্দে করে না, বরং ডাক্তারের পরিপূর্ণ রুচিমত যথাসাধ্য সাজিয়ে লিখতে প্রয়াস পাচ্ছে চামেলি—যাতে বিরাজ-বাবুর খুব ভাল লাগে, মনটা সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে—সেই সব কথা। জোর করে নয়—কৃত্রিমতার ভিতর এমন বিমুগ্ধতা থাকে কি? নিজেরই মনের পরিপূর্ণ প্রেরণায় লিখে যাচ্ছে চামেলি। নিজের মতামত কিছু নেই আজ চামেলির—নিজের ভাব নেই—স্বভাব হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমে-ক্রমে—কিন্তু আশ্চর্য, কোনো কৃত্রিমতার গন্ধও নেই। সব বড় দ্রুত, বড় বিরাট পরিবর্তনের ভিতর—স্বাভাবিক আবেগের সঙ্গেই আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে সব—শেষ হয়ে যাচ্ছে।

বিরাজের চিঠি দেখাবার মত নয়। জানাবার মতোও কিছু নেই সে সবের ভিতর। চামেলি বললে—'কী আমি লিখি? তাও কী করে বলব?'

চামেলি বললে—'একটা ভয় হয় শুধু; আমাদের চেয়ে এর সম্পূর্ণ নতুন জীবনটার ভিতর আমাকে নিয়ে একটা নির্ঘাত ধাক্কা না খান।'

সন্তোষ জানে, তা অসম্ভব। আই-এম-এস—বড় মানুষ বটে, কিন্তু কত বড় মানুষই-বা। মেয়েমানুষের মোহ জিনিশটাই আলাদা, বিশেষত চামেলিদের মত এমন সম্পন্ন পরম মেয়েমানুষদের। লেডি হ্যামিলটন, নেল গোয়াইনের প্রেমিকদের সঙ্গে বিরাজের তো কোনো তুলনাই হয় না, অথচ ভয় তো সে-সব মেয়েরা কোনো দিন করে নি—ট্রাফালগারের বীরেরাই বরং আশঙ্কায় আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে উঠত জীবনের রূপ, প্রেমের কথা বলতে গেলে।

চামেলি বললে—'অত বড় সাহেব, এমন গ্রেট ম্যান একজন! না পারি যদি? সমস্তই যদি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়—'

চামেলি ঘাড় হেঁট করে কী যেন ভাবছিল। আস্তে মুখ তুলে বললে, 'কিন্তু তিনি তো প্রতি চিঠিতেই আমাকে আশ্বাস দিচ্ছেন—বলছেন, ভয় তোমার কী আবার? ভাবনা বরং আমারই; আমাকে পেয়ে সুখী হবে কি? ঠিক বুঝতে পারছি না।'

চামেলি প্রসন্ন মুখে হাসতে-হাসতে বললে—'এই সব লেখেন; দেখো তো কী অন্যায়।'

সন্তোষের মনে হচ্ছিল, কী অপরিমেয় ব্যবধান হয়ে যাচ্ছে এই দুটি বোনের ভিতর। পূর্ণিমা—যে বিরাজের দিক দিয়ে, সমস্ত বড় মানুষের দিক দিয়েই, চামেলির চেয়ে ঢের বেশি যোগ্যতর ছিল—তার আজ এই অবস্থা আর চামেলি—যার জীবনে এই বীভৎস মোচড়ের কোনো প্রয়োজন ছিল না—নিজেরই স্বাভাবিক নিয়মে জীবনের প্রকৃত উপশম যে ঢের বেশি পেতে পারত—দিতে পারত ঢের বেশি—তাকে নিয়ে এমন কুৎসিত টানা-হেঁচড়া।

এক দিন সমস্তই ঠিক হয়ে যাবে বটে।

পূর্ণিমা গরিবের বৌ বলে বাৎলে [বদলে?] যাবে—চামেলি কর্নেলের লেডি বলে।

কিন্তু সেই দূর সিদ্ধান্তের স্থিরতায় পৌঁছতে গিয়ে এই চারটি জীবনই যা

অপব্যয়, অপচয় ও রক্তাক্ততায় বীভৎস হয়ে উঠবে। কিন্তু চারটি জীবনই বা ভাবছে কেন সন্তোষ? দুটি জীবন মাত্র—তার নিজের ও পূর্ণিমার। কারণ শেষ পর্যন্ত জীবনকে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, জীবনকে বিচার, জীবনকে ধিক্কার, জীবনকে অনুভব, জীবনকে গ্রহণ, জীবনের শূন্যতা বেদনা শান্তি সিদ্ধান্ত সমস্তই গরিবদের দায়ে পড়া কাজ; দায়ে পড়েই তাদের অনুভূতি এমন গভীর হয়ে ওঠে—মানুষের জীবনটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে এদেরই রুধির কর্দমসিক্ত উপলব্ধির কাছে এমন পরিপূর্ণভাবে ধরা পড়ে যেতে থাকে—ধরা, পড়ে যেতে থাকে।

নিজের মৃত্যুর আগে সন্তোষ এ জীবনটাকে যেমন বুঝে যেতে পারবে, পূর্ণিমাও—বিরাজ ও চামেলি তাদের নিজেদের জীবনের প্রবোধ ও আশ্রয়ের ভিতর থেকে কী বুঝবে সে-সবের? কতটুকুই-বা? তারা আর অগ্রসর হবে না—স্বচ্ছন্দ সংসার, সমৃদ্ধিময় পৃথিবীতে তাদের পরিসমাপ্তি হয়ে গেল—কিন্তু সন্তোষ-পূর্ণিমার আকণ্ঠ প্রয়াস ও ব্যথার কোনো পূর্ণচ্ছেদ নেই কোনো দিকে, মৃত্যুর পরে এ উপলব্ধিকে কাজে ধরা জিনিশ মনে হবে না সন্তোষের আর এ অনুভবকে পরিপূর্ণ প্রাণে ভালবেসে যাবে সে: জীবনকে সে দেখল সমস্ত দিক দিয়েই তারা নিষ্ফল হয়েছিল বলে; মৃত্যুর সময় পূর্ণিমা ও সন্তোষ এই সফলতার সমৃদ্ধি নিয়ে চলে যেতে পারবে।

জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা এই নয় কি?

চামেলি বললে—'তিনি. লিখেছেন নিজের চোখেই তো দেখেছি কত রূপগুণ সম্পন্ন তুমি, কিন্তু তোমার গুণের জন্যও তোমাকে চাচ্ছি না, তোমার রূপের জন্যও না—তোমাকে চাচ্ছি তোমার জন্য শুধু।'

চামেলি একটু বিদ্রূপের সুরে হেসে বললে—'দেখো তো, ডাক্তার মানুষেরও কবিত্বের কী গভীরতা—'

চামেলি বিদ্রূপ অক্ষুন্ন রেখে বললে—'কিংবা নিরর্থকতা'। একটু গম্ভীর হয়ে বললে—'সত্যি এ-সবের মানে কী?'

ধীরে-ধীরে আবিষ্ট হয়ে চামেলি বললে—'ভালবাসায় মানুষকে কী রকম অভিভূত করে ফেলে। ওঁর চিঠির সমস্ত ভণিতাই ঘুরেফিরে সেই ভালবাসারই কারচুপি'—চামেলি মুগ্ধ মুখচোখে হাসতে লাগল; রুপোর চামচে যেন রুপোর বাটিতে আওয়াজ করে চলেছে—না জানি কোন অনির্বচনীয়

যাত্ যেন শিগগিরই উদ্ঘাটিত হয়ে পড়বে। কিন্তু বিরাজ ছিল না—সমস্তই গুটিয়ে গেল তাই।

চামেলি বিরাজের চিঠির উত্তর দেবার আয়োজন করছিল।

সন্তোষকে আর বসাল না সে।

বিরাজের আসতে এখনও দশ-পনের দিন দেরি—বিশেষ কাজের জন্য ছুটিটা পিছিয়ে দিতে হয়েছে।

এই জন্য ঢের মনখারাপ চামেলির।

বললে—'বিয়ের তারিখ তো পিছবে না?'

সন্তোষ বললে—'না।'

—'মামাবাবু কিন্তু চিঠি ছাপাচ্ছেন।'

'ওরাও তো জানে আশা করি।'

—'হ্যাঁ, ওরা নিজেরাও ছাপাচ্ছে, শুনেছি।'

চামেলি একটু আশ্বস্ত হয়ে বললে, 'উনিও লিখেছেন—আজকের চিঠিতেও—দেরি তো হতেই পারে না—বরং আগে ছুটি পেলে আজ-কালই ব্যবস্থা করে ফেলতেন'—সমস্ত চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে চামেলির—নোট পেপারে হাত রেখে একটু কাত হয়ে বসেছে সে।

সন্তোষ মেসে এসে পূর্ণিমার একটা চিঠি পেয়েছে—সাত-আট দিন পরে এক খানা চিঠি! কিন্তু সে নিজেও কি বেচারিকে এ কদিনের ভিতর এক-খানা লিখেছিল—বম্বের থেকে কলকাতায়, কলকাতার থেকে বম্বেতে রোজই দু-তিন খানা যাচ্ছে-আসছে দেখেও? কিন্তু চামেলিদের জীবনের ব্যবহার দিয়ে নিজেদের জীবনকে পরিমাপ করলে চলে কি আজ আর? বিরাজ সন্তোষের চেয়ে বয়সে ঢের বড় বটে, চামেলিও পূর্ণিমার চেয়ে অনেক বড়—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নিজেরাই বুড়ো তারা দু জনে: চামেলিরাই নতুন: জীবনের প্রথম পাঠ নিতে চলেছে যেন—প্রেমের পিপাসার, রোমাঞ্চের, স্বপ্নের নীড়ের।

পূর্ণিমা লিখেছে: পেটের ভারে সে না পারে হাঁটতে, না পারে শুতে, পা ছড়িয়ে বেড়ায় ঠেস দিয়ে বসে থাকতে হয় শুধু। বসে-বসে কী ভাবে সে?

ভাবে যা তা দু পৃষ্ঠা বসে ব্যক্ত করেছে পূর্ণিমা।

তা না বলাই ভাল। সন্তোষ যদি ভুলে যেতে পারে—কোনোদিনও এই দু পৃষ্ঠার স্মৃতি মনে যদি না থাকে আর তার, তবেই সে বেঁচে যেতে পারে!

কিন্তু বেঁচে যেতে সে আসে নি।

কিন্তু পূর্ণিমাকেও সে বাঁচাতে পারবে না।

পূর্ণিমার যদি মৃত্যু হত—এই প্রসবের সময়—তা হলে দু জনেই বেঁচে যেতে পারত তারা। কিন্তু তা কি হবে? তা যে হবে না এই মনে রেখেই জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল—দু জনের সমগ্র জীবনটার সমস্ত পরিশ্রম, প্রয়াস ও ব্যর্থতার ও প্রয়াসের জন্য।

মেসের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সন্তোষের মনে হচ্ছে এটা যদি সে ঠিক বুঝতে পারত যে পূর্ণিমা প্রসবের আঘাতটাকে কিছুতেই উৎরোতে পারবে না, মরতে তাকে হবেই, তা হলে কম্বল মুড়ি দিয়ে বাইরের শীতের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এই অন্ধকারের ভিতর এমনই একটা আরাম পেত সন্তোষ!

কী গভীর নিস্তার পেত তা হলে জীবনে সে? সমস্ত পৃথিবীর দুঃখকষ্ট তার অনুভূতিশীল হৃদয়ের কাছ থেকে যে-করুণা চায়, যে-বেদনা চায়, আনন্দের উপশমের মত মনে হত যেন সেগুলোকে সন্তোষের। পূর্ণিমার এই একটি জীবন যে করুণা, মমতা, মায়া ও ব্যথার দাবি করে চলে গেছে সন্তোষের কাছ থেকে, সে-সবের অপরিসীম বেদনার কাছে, পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-কষ্টই আনন্দের উপশমের মত মনে হত যেন।

পৃথিবীতে কাউকেই ভালবাসে নি সন্তোষ।

কিংবা পূর্ণিমাকেই শুধু ভালবেসেছে। পৃথিবীর লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি লোকের ভিতর এই মেয়েটিরই শুধু দুঃখ দূর করবার জন্য, এর জন্যই শুধু একটা আশ্রয়, একটা শৃঙ্খলা, জীবনের কাছে থেকে একটা মমতামুগ্ধ স্নেহপূর্ণ ব্যবস্থা বিচার আহরণ করে নেবার জন্য—এরই আশা-আশ্বাস পরিতৃপ্তি ও মঙ্গলের জন্য—জীবনে যদি কিছু না পারা গেল মৃত্যুর হাতে ছেড়ে দিয়েও একে প্রকৃত শান্তি, স্নিগ্ধতা ও নিবিড়তা বুঝতে দেবার জন্য অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বেঁচে থাকাটাকে যদি ভালবাসা বলা যায়, তা হলে একমাত্র পূর্ণিমাকেই ভাল বাসে সন্তোষ। হয় তো প্রেমের মানেও এই-ই।

কিন্তু করুণা কি প্রেমের চেয়ে বড় নয়?

সৃষ্টির অন্য নক্ষত্রগুলোর কথা জানে না সন্তোষ—কিন্তু এই পৃথিবীর প্রতি অণু-পরমাণুও প্রতি মুহূর্তেই যে-অব্যক্ত বেদনায় কুঞ্চিত হয়ে পড়ছে—পরিবর্তে কোনো এক দিক থেকে যে অসীম করুণার প্রতীক্ষা করছে—প্রতীক্ষা করছে শুধু, পাচ্ছে না—এই সমস্তই তো সন্তোষ উপলব্ধি করেছে—এই সবের অপরিসীম বেদনা তাকে ব্যথা দিয়ে গেছে; কিন্তু তবুও এই সব ব্যথা যেন কিছু নয়; পূর্ণিমার জীবন যেন এদের সকলের চেয়েই ঢের কৃপার পাত্র; এদের সকলকে বঞ্চিত করেও সন্তোষের সমস্ত স্নেহ-মমতা, দক্ষিণা, করুণা জীবনের স্বাভাবিক গতিতে বারবার পূর্ণিমাকেই খুঁজে বেড়াতে চায়—পূর্ণিমাকে স্পর্শ করতে না পারলে সে অন্ধ গতির যেন কোনো স্তব্ধতা নেই, তৃপ্তি নেই, অন্ধকারের কোনো শেষ নেই আর।

জীবনের সমস্ত করুণাও এই মেয়েটিকে দিয়ে দিয়েছে সন্তোষ। একে নিয়ে তাই বড় ব্যথা।

শীত রাতের অন্ধকারের ভিতর মেসের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে নিজের জীবন থেকে পূর্ণিমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাচ্ছে সন্তোষ; পূর্ণিমা বেঁচে থাক, কী মরে যাক—সন্তোষের জীবনকে সে যেন আর স্পর্শ না করে। পূর্ণিমা তার রূপ-সৌভাগ্য, শক্তি সমৃদ্ধি ও সুলক্ষণ নিয়ে চামেলির চেয়ে ঢের বেশি করে পৃথিবীর যে-কোনো বিরাজকে কৃতার্থ করতে পারত। পৃথিবীতে লক্ষ-লক্ষ বিরাজ বেঁচে রয়েছে—আজ এই শীতের রাতের এমন কঠিনতার ভিতর জীবনের নিঃসঙ্গতায় রুধিরাক্ত হয়ে রয়েছে—পূর্ণিমাকে পেলে এই মুহূর্তেই তারা জীবনের মানে পরিবর্তিত করে ফেলতে পারে—তাদের একজনকেও যদি চিনত সন্তোষ উপযাচক হয়ে এই রাতেই পূর্ণিমাকে দিয়ে আসত;—আঃ, জীবনে কী গভীর নিস্তার পেত তা হলে!

আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে সমস্ত শীতটা ভরে ঘুমের একটুও ব্যাঘাত হত না তা হলে আর। চিন্তার ব্যথা থাকত না। পূর্ণিমা যখন নিজের মাথায় তুলে সে-সব কুড়িয়ে নিয়ে চলে যেত, সন্তোষের জীবনে প্রেম আর আসত না তার পর, করুণা আর আসত না। এই দুটো জিনিসই মানুষের জীবনকে পণ্ড করে দেয় না কি?

এই জিনিসগুলোকে বাদ দিয়ে সবুজ ঘাসের মত কোমল কমনীয় উপলব্ধিহীন জীবন যে কী মধুর!

কোথাও কোনো চিন্তার পীড়া নেই, ভাবের কষ্ট নেই—শুধু আস্বাদ করে যাওয়া—শুধু আস্বাদ করে যাওয়া ; তাই ভাল হত না কি ?
কিংবা সন্তোষ মরে যেত ; এত প্রেম ও করুণা বহন করবার শক্তি তার নেই যে !

কয়েক দিন কেটে গেছে।
বিরাজ এসেছে।

আরো কয়েক দিন চলে গেল।
আজ সন্ধ্যায় চামেলির বিয়ে হয়ে গেল।

আরো দু-তিন দিন চলে যাচ্ছে।
এই দুই বোনের জীবনের বিরাট ব্যবধানের অবিচার সন্তোষকে পেয়ে বসেছে—এই ভীষণ অভিশাপ নিয়ে সে কোথায় যাবে ? দোষ কি তার, না বিরাজের ? পূর্ণিমার না চামেলির ?'
হঠাৎ এমন পার্থক্য হয়ে পড়ে কেন জীবনে ? যে-জিনিশ ক্রমে-ক্রমে হয়, আস্তে-আস্তে, অনেক সহিষ্ণুতা, প্রতিভা, প্রয়াস ও পরিশ্রমের পর তার মহিমাকে স্বীকার করে সন্তোষ।
কিন্তু যতই মনে হচ্ছে যে পূর্ণিমা বেড়ায় ঠেস দিয়ে, দুই পা ছড়িয়ে বসে আছে, পাড়াগাঁর নিরানন্দ জীবনের ভিতর প্রসবের প্রতীক্ষা করছে, গামলা কাঁচি ইত্যাদির জন্য সন্তোষের কাছে পয়সা চেয়ে পাঠিয়েছে, যতই মনে হয় যে নাড়ী কাটবার কাঁচি, বোরিক, গামলা ইত্যাদির দিকে তাকিয়ে ও ব্যবস্থা ও উপকরণের সঙ্গতিতে, এতেই, আন্তরিক তৃপ্তি পাচ্ছে পূর্ণিমা আজ।
রিচি রোডে বিরাজদের মস্ত বড় বাড়ির মেমসাহেব চামেলির তৃপ্তির উপকরণ-গুলোর আকাশস্পর্শী উচ্চতাকে যখন আর অনুসরণ করতে পারা যায় না মেসের দেয়ালে ঠেস দিয়ে মাথাটা আস্তে-আস্তে হেঁট হয়ে আসে, নিজের প্রতি অবিশ্বাস ও অবিচার সমস্ত মন ভরে উপচে থাকে, জীবনের এই নতুন

সমস্যার কী মীমাংসা করবে সে? এমনিই তো অনেক অমীমাংসা জীবনকে আচ্ছন্ন করেছিল, সংসার সন্তোষকে নির্যাতন করতে একটুও ছাড়েনি তো, কিন্তু সন্তোষের এই পাপের শাস্তি কোনো সংসার, কোনো পৃথিবী, কোনো পৃথিবী কোনোদিনই, যেন দিয়ে শেষ করতে পারে না।

হয় তো কোনো অবিবেচক ভাগ্যবিধাতার যাচ্ছেতাই খামখেয়ালিতে চামেলি আজ এত বড়।

কিন্তু সে যে এত বড় তা যে নিতান্তই সত্য—যে-জিনিশকে আলেয়া বলে উড়িয়ে দেবার কোনো উপায় নেই তা আজ।

কে বড় কে ছোট এ-সব জিনিশ সন্তোষকে কোনো কালেও স্পর্শ করে না, আজও করছে না—কিন্তু পূর্ণিমা ও চামেলির অবস্থা-ব্যবস্থার এই আকাশ-পাতাল তফাতের ভিতর যে-অবিচার ও অপরাধ লুকিয়ে রয়েছে তার শিকার তো পূর্ণিমা—কিন্তু শিকারী কে? যদি ভাবা যেত, চামেলি? যদি বোঝা যেত, বিরাজ? যদি কোনো বিধাতার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়তে পারা যেত, নিস্তার পাওয়া যেত?

কিন্তু এ অপরাধ ও অবিচার—শেষ পর্যন্ত পূর্ণিমাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে যা—এই অবিচার ও অপরাধের সমস্ত ভার সন্তোষকেই বহন করতে হবে।

চামেলির জীবন হয় তো বিরাজের সঙ্গে গিয়ে মিলত। পূর্ণিমা তার নিজের বিরাজকে তার দিদির চেয়ে ঢের বেশি অবিসংবাদী ভাবে লাভ করতে পারত—সে সমস্ত উপকরণই তার ভিতর ছিল।

এবং এই তিনটি লোকের জীবনের সংস্পর্শে আসবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না সন্তোষের।

সুশৃঙ্খল বিধাতা হলে এই কয়টি জীবনকে এমনি করেই সাজাত। কিন্তু সুশৃঙ্খল বা উচ্ছৃঙ্খল—বিধাতা বা শয়তান বলে কেউ কোথাও নেই। কিংবা আছে কি? কে জানে? থাকলে ঢের বেশি শান্তি পাওয়া যেত—নালিশ করে কিংবা প্রার্থনা করে কিংবা বিদ্রোহী হয়ে—কিংবা ভবিতব্যতাকে স্বীকার করে। কিন্তু সে সব উপায়গুলো হেমন্তের পাতার মত জীবন থেকে এক দিন ঝরে পড়ে গেছে।

সে ঢের অতীতের কথা।

জীবনের নতুন উপলব্ধির কাছে সে সবের কোনো মানে নেই আজ। সমস্ত

জীবনই শান্তি ও নিস্তার খুঁজছে—কিন্তু সন্তোষের পথ আলাদা ; জানে না সে এই পথে তার কোনো সঙ্গী আছে কী না ; কী যে সে পথ : বেদনার পথ বটে—খুব গভীর বেদনার পথ—খুব গভীর বেদনার পথ। একজন পূর্ণিমাকেও যে সে ভালবাসতে পেরেছে, লোকেরা বলে, বিধাতা মানুষকে যেমন ভালবাসে ; এক জন পূর্ণিমাকেও যে সে করুণা করতে পেরেছে, লোকেরা বলে, বিধাতা তার তুচ্ছ কীটকেও সেই রকম করুণা করে।

কিন্তু বিধাতা ও লোকদের কথা আলাদা। সন্তোষ ও পূর্ণিমা সত্য, সন্তোষের এ প্রেম, এ করুণা তার।

পূর্ণিমা লিখেছে 'এখানে থিয়েটারের পার্টি এসেছিল—খুড়ো শ্বশুরমশায় সে সবের বিরুদ্ধে পিকেটিং করতে গিয়ে মাথা ভেঙেছেন। বাড়িতে তো আর পুরুষমানুষ নেই। শুনলাম মিশনের সিসটার দু জন—মার্গারেট ও এডিথ—যারা আমার কাছে মাঝে-মাঝে আসছেন, এবং প্রসবের সময় থাকবেন বলেছিলেন—এখন আজ দার্জিলিঙ চলে গেলেন। তিন-চার মাসের ভিতর আর আসবেন না। অথচ আমার তো তিন-চার সপ্তাহের ভিতরেই হতে পারে—কী হবে বলো তো ?'

হবে আর কী ? এমনই যদি কিছু হয়—পূর্ণিমা নিস্তার পাবে। বেঁচে থেকে যদি সে একদিক দিয়ে চামেলি-বিরাজ ও অন্য দিক দিয়ে সন্তোষের জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত পর্যন্ত সহমরণ করতে থাকে তা হলে সে কদর্য অশ্লীল অক্ষম অবসন্ন পৃথিবীতে সে কারো ভার লাঘব করবে না—সকলেরই বোঝা হয়ে উঠবে মাত্র !

হয় তো চামেলিও তাকে ছবিটিই মনে করবে—নিজের চেয়ে ঢের যোগ্যতর ও উপযুক্ত বোনটিকে জীবনের পাঁকের ভিতর পচতে দেখে চামেলির বিবেক চামেলিকে কষ্ট দেবে।

সম্পদ ঐশ্চর্যের স্বচ্ছন্দতার ভিতর হৃদয়ের এ সূক্ষ্ম অশান্তি কেউ চায় না—। বিরাজও হয় তো জীবনের ফাঁকে-ফাঁকে দু-এক মিনিটের জন্য স্তম্ভিত হয়ে থাকবে ; 'কী হতে পারত—কী না হতে পারত, হায় !' বিলাস বটে—কিন্তু সেও ব্যথারই বিলাস। বেদনার বিলাসও মাঝে-মাঝে এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে ব্যথার থেকে তাকে পৃথক করতে পারা যায় না—তাকে ছাড়াতে পারা যায় না—একটা বোঝার মত হয়ে থাকে সে।

বিরাজের হৃদয়ের ওপরও একটা বোঝার মত চেপে থাকবার শক্তি পূর্ণিমার রয়েছে। কিন্তু বিরাজের স্বচ্ছন্দ স্বভাব, জীবনের সঙ্গতির ভিতর এর কি প্রয়োজন আছে!

নেই কিছু।

কোথাও কোনো প্রয়োজন নেই পূর্ণিমার যে ব্যথা দেবে, কষ্ট দেবে, গুরুভারে আক্রান্ত করবে মানুষকে।

নিজে সে বুঝে যাবে, যদি সে বেঁচে থাকে, যে সবচেয়ে বেশি প্রবঞ্চিত হল সে—সবচেয়ে বেশি উপহাসাস্পদ হয়ে গেল; শেষ পর্যন্ত এই-ই তাকে বুঝতে হবে।

পূর্ণিমার আর-এক খানা চিঠি এসেছে—'কাকা মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন—'সকলেরই সেই জন্য চিন্তা, বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই; আমার জন্য কারো কোনো সহানুভূতিও নেই যেন। ওগো, আমার কী হবে, বলো? তুমি এই চিঠি পেয়েই চলে এসো।'

সন্তোষ যাচ্ছে—কিন্তু পূর্ণিমার কাছে নয়—চামেলির বৌ-ভাতে। সঙ্গে অমূল্য চলেছে—পূর্ণিমাকেও সে চেনে, সন্তোষের বন্ধু সে। বড্ড শীত—ভাল এক খানা চাদরও নেই সন্তোষের। অমূল্য নিজের শাল-দোশালাখানা সন্তোষকে দিয়ে বিরাজ ডাক্তারের ডায়রার উপযুক্ত করে নিয়ে যাবার প্রয়াসে রয়েছে। অমূল্যের বিবেচনা রয়েছে বটে কিন্তু ঐ শালখানাই শুধু উপযুক্ত বটে, নিজের দামের কাছে অন্তত। বাকি সবের উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা—

[অবান্তর]

বিরাজদের মস্তবড় কম্পাউণ্ডের শামিয়ানার নীচে সন্তোষের কোনো অস্তিত্ব নেই—হলের পর হল, হলের পর হল, হলের পর হলের সুগন্ধি মানুষ ও মেয়েমানুষদের অপর্যাপ্ত রূপ রস ও সম্ভোগের প্রচুরতার ভিতরেও সন্তোষ নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। কী করে সে এখানে এসে পড়ল স্তম্ভিত হয়ে চোখ পাকিয়ে এ প্রশ্ন ভিড়ের যে-কোনো মানুষ তাকে করলেও সেটা মোটেই অন্যায় হত না। কিন্তু আশ্চর্য এদের উদারতা—সুন্দরী-সুন্দরী মেয়েদের হাত-পা-গা ঘেঁষে গেলেও তারা কোনো উচ্চবাচ্য করছে না— না আছে তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ।

চুরুট, মদ, পদস্থতা, মর্যাদা, রূপ—এবং পুরুষ-মেয়েমানুষের চামড়ামাংসের

প্রাণে জীবন এখানে উপভোগের যে কোন শিখরের উচ্চতায় পেঁছিছে সন্তোষ খানিক গিয়ে আর অনুসরণ করতে পারে না; উপলব্ধি তার স্থগিত হয়ে স্থূল হয়েই যেন মাটিতে নেমে আসে। ভাবে (হয়তো) পূর্ণিমা উঁচু পেটে দুই পা ছড়িয়ে বেড়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছে, এক জন পুরুষমানুষের অপেক্ষা করছে, কিংবা নিঃসহায় প্রসবের কিংবা মৃত্যুর।

এই সমস্ত স্থূলতার ভিতর গিয়ে অনুভব কর্দমাক্ত হয়ে পড়ছে সন্তোষের। চোখ মেলে হলের পর হল দেখা যায়—হলের পর হল—হলের পর হল—ওপরে নীচে দোতলায় তেতলায় একতলায়—আসবাব ও উপকরণের দুরন্ত বস্তুসত্যের পায়ের নীচে, কল্পনা, মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রকৃত স্বপ্ন ও প্রকৃত সাধ আহরণ করবার জন্য আকুতি জানিয়ে পাঠ নিতে চায়--লণ্ডভণ্ড হয়ে হয়ে ফিরে আসে—সন্তোষদের স্থূল কল্পনা—সন্তোষের ও পূর্ণিমার। কিন্তু বিরাজ ও চামেলির কাছে এ সমস্তই অন্ধত্ব—এ সবই সাধারণ; কল্পনা ও চিন্তার সঞ্চয় মাধুর্যের দিক দিয়েও ওরা উচ্চস্তরের লোক।

সন্তোষের মনে হচ্ছে এই সবের ভিতরে থেকে থেকে, আরো সব বিচিত্রতার ভিতর দিয়ে গিয়ে-গিয়ে ওদের মাথার পরিকল্পনা, ছবি-কবিতা-গান, জীবনের সমস্ত রূপ, রস, পুলক ও উপভোগের দিকটা যে-রকম ফুটিয়ে তুলতে পারবে, সন্তোষ ও পূর্ণিমার প্রয়াসের থেকে তা সব সময়ই ঢের বেশি আশাপ্রদ হবে। নিজেদের শরীরের স্থূলতা সব দিক দিয়েই ধরা পড়ে যাচ্ছে। একদল রূপসীর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না সন্তোষ—অবাক হয়ে ভাবছে এত সব সুন্দরীরা এমন ভরসাজনক ঘনিষ্ঠতার ভিতর থাকতেও বিরাজ কেন মামাবাবুর ভাগ্নীকেই নিকটতম বলে মনে করল? সে অদ্ভুত খোঁজই-বা পেল কোথায় সে?

বৌ-ভাতের রাত চলেছে।

চামেলি কখন কোথায় কাদের দেখা দিয়ে বৌ-ভাতের কাজ শেষ করে গেছে জানা গেল না।

চামেলিদের জন্য পূর্ণিমার ও নিজের উপহারটাও, একটা উপহারেরই হয় তো, স্তূপীকৃত মেহগিনির টেবিলের ওপর রেখে এল সন্তোষ।

দেউড়ির পাশে কয়েকজন ব্যারিস্টার ও অফিসার কথা বলছিল—চামেলি ও বিরাজ দু জনে প্রেসিডেন্ট লাইনারে চেপে ইউরোপে যাবে না আমেরিকা,

আর দু-চার দিনের ভিতরেই।

প্রেসিডেন্ট লাইনারের গল্প হচ্ছিল।

সন্তোষ একটু থেমে দাঁড়িয়ে শুনছিল।

প্রেসিডেন্ট লাইনারের বিশেষত্ব হচ্ছে, ক্যালিফোর্নিয়ার ফল-সবজি-সুপ ইত্যাদি আগাগোড়া সমস্ত যাত্রায়, প্রত্যেক মিলের সঙ্গেই, dairy product—all outside state room, twin beds ইত্যাদি, গরম জল ঠাণ্ডা জলের পাইপ, থারমস বট্‌ল্, রিডিং ল্যাম্প, স্যুইমিং বাথ, কটেজ অরর্কেস্ট্রা, টি-ডানস্, ডিনার ও ইভনিং পার্টি সব সময়ই। মাঝখানে মিশরে তিন দিন জাহাজ থাকে—পিরামিড-নাইল—

সন্তোষ রাস্তায় নেমে পড়েছে।

অমূল্য বললে—'কই, চামেলিদির সঙ্গে দেখা না করেই চললে?'

সন্তোষ বললে—'আজ তার মোসাহেব ঢের—নিজের পরিচয় দিয়ে বিরাজ ও চামেলিকে লজ্জিত করা মাত্র।'

অমূল্য বললে—'পূর্ণিমা যদি একটু দাঁড়িয়ে বিয়ে করত।'

সন্তোষ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে পিছনের বাড়িটার দিকে একবার তাকালে, এমন ঐশ্বর্য ও রসোন্মত্তার ভিতর কোনোদিনও সে আর প্রবেশ করে নি—দূর থেকে এ সব উপভোগ করবার রুচিও ভবিষ্যতে কোনোদিন আর যোগাড় করে উঠতে পারবে কি না সন্দেহ।

বিরাজ ও চামেলির জীবনের একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের দিকে তাকালেও কোন দূর দূরান্তরের পাত অন্ধকারের খোড়ো ঘরের ভিতর পূর্ণিমার উঁচু পেট ও ছড়ানো পা দুটোর কথা জেগে ওঠে যে।

প্রতি পদে-পদে এমন অপরিহার্য তুলনা নিয়ে কোথায় যাবে সে? এর অবিচার, অপরাধ, অক্ষমতা ও বেদনার ভার সমস্ত জীবন নিজেকেই শুধু বহন করতে হবে তার—এমন সামর্থ্য নেই যে খোড়ো ঘরকেও সোনার প্রাসাদে দাঁড় করায়। তা হলে সে শক্তিকেই সাহায্য করতে ডাকত সে। কিন্তু কিন্তু নিজে কী নিদারুণ অক্ষম সন্তোষ।

এমন কোনো সমর্থ লোকও কি কোথাও আছে যে সন্তোষের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়ে যায়? সন্তোষের নিজের উপভোগের জন্য নয়, নিজে সে শীতের রাতে গরুর ঘরে খড়গাদার ওপর শুয়ে থাকতেও রাজি আছে—

সন্তোষের জন্য নয়—কিন্তু পূর্ণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

জীবনের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থার সামঞ্জস্যের দিক দিয়েও ব্যবধানটা এমন অসংলগ্ন হয়ে পড়েছে। যে-সৃষ্টিতে নক্ষত্রেরা থাকে কিন্তু তাদের অপর্যাপ্ত নীচে কোনো দিকেই কারো কোনো সহানুভূতি নেই, কোনো জ্রক্ষেপ নেই, কোনো সাহায্য নেই, নিজের কোনো শক্তি নেই, কোনো আকস্মিক যাদু বা ভেল্কির পৃথিবী ও যুগ নেই, বিধাতা, ধর্ম বা সন্ন্যাসেও কোনো বিশ্বাস নেই : তা থাকলেও একটা সম্বল শান্তি থাকত বটে। এর যে-কোনো একটা জিনিশ যদি জীবনে থাকত—পূর্ণিমা যে-উপলব্ধি জাগায় (যার থেকে কোনো নিস্তার নেই আর) তার থেকে ত্রাণ না পেলেও অনেকটা উপশম পাওয়া যেত। কিন্তু কোথাও যে কিছু নেই।

অমূল্য বললে—'পূর্ণিমা বিরাজের চেয়েও ভাল জামাই পেত, আহা, একটু অপেক্ষা করত যদি।'

অমূল্য সবটুকুই বোঝে—এ জন্যই ওকে ভাল লাগে সন্তোষের।

অমূল্য একটা সিগার জ্বালিয়ে বললে—'তুমিও চেষ্টা করো না সন্তোষ উপযুক্ত জামাই হতে? বিরাজের মত? তা পারবে না, কিছুতেই না; শুধু কি এই আই-এম-এস ডাক্তারের দৌলতেই এই সব? ওদের সাত পুরুষের বনিয়াদি, কলকাতায় কে না চেনে ওদের?'

—'কিন্তু বিরাজের মত না হলে কিছুই যে হওয়া গেল না অমূল্য।'

অমূল্য বিস্মিত হয়ে বললে—'কেন?'

সন্তোষ বললে—'চামেলি যা পাচ্ছে—পূর্ণিমাকে সবটুকুই দিতে হবে তো। আমি ওর জীবনে হঠাৎ ঢুকে পড়ে মেয়েটাকে এমন না খুইয়ে বসতাম যদি, ও সমস্তটুকুই তো পেত—হয় তো বেশিও পেত।'

—'তা হত হয় তো—হয় তো হত না; কিন্তু এখন কিছুই যে পাচ্ছে না।'

—'পাক না পাক—তাকে মরতে দাও।'

অমূল্য বললে—'একটা বৌ-ভাতে এসেই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। মানুষের জীবন ঢের বিস্তৃত। অর্জন করবার ইচ্ছা চেষ্টা ও নিজেকে অশ্রান্ত ব্যবহার করবার একটা পুরস্কার পাওয়াই যায়।'

সন্তোষ বললে—'বড়জোর একটু সাধারণ সচ্ছল জীবন পাওয়া যাবে। আমার নিজের পক্ষে তা ঢের তৃপ্তির বটে, জীবনের ঘরোয়া স্ত্রীদের পক্ষেও এ জিনিশ

খুবই কামনারই জিনিশ বটে ; পূর্ণিমাও তার সমস্ত রূপগুণ সত্ত্বেও এতদিন গরিবের ঘরের মেয়েই ছিল ; জীবনের সাধারণ একটা স্বচ্ছন্দতা পেলে এখনও সে খুশিই হবে। আমিও সেই ব্যবস্থার চেষ্টাই করেছিলাম এতদিন। কিন্তু বিরাজ এসে একটা ভণ্ডুল লাগিয়ে দিল।'

অমূল্য বললে—'কই, চুরুটটা জ্বালালে না।'

সন্তোষ অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল। চুরুটটা কোথায় রাস্তায় হাত থেকে পড়ে গেছে তার। বাসের দোতলার একটা নির্জন কোণায় বসে সন্তোষ বলছে—'আমার যদি প্রতিভা থাকত তার বেগে আমি উৎরে চলে যেতাম—পূর্ণিমাকেও সঙ্গে-সঙ্গে উঠিয়ে নিতাম। কিন্তু অত্যন্ত সামান্য শক্তির মানুষ আমি—একটা সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবস্থার পথ খুঁজছিলাম মাত্র—তারই ভিতর আমার মুগ্ধতা ছিল। কিন্তু বলছিলাম যা ভণ্ডুল লাগিয়ে দিল বিরাজ ; কিন্তু তারই বা দোষ কি ? রূপসীকে পছন্দ করে বিয়ে করেছে—অস্বাভাবিক কিছু করে নি। কিন্তু মনে হয় পূর্ণিমার বোনকেই বিয়ে করবার কী দরকার ছিল বিরাজের ? পৃথিবীতে সুন্দরী কি আর ছিল না ? কিংবা রূপসী বুদ্ধিমতী মেয়ে দেখে বিয়ে করবারই বা কী দরকার ছিল আমার ? আমার জীবন যা—আমার জীবনের গভীর প্রয়োজনের নিকট রূপ ও তীক্ষ্ণতার কী মূল্য রয়েছে ? কতটুকু ? নম্র মমতাময়ী সহিষ্ণু সাধারণ মেয়ে পৃথিবীতে কি ছিল না আর ? তেমনই কোনো একটিরই যে বড় দরকার ছিল আমার। কিন্তু যা হয়েছে—তা হয়েছে। এই সব বিশৃঙ্খলার ভিতরেও প্রেমকে আমি হারাই নি।'

প্রেমের তার নিজস্ব সংজ্ঞা অমূল্যকে বুঝিয়ে দিচ্ছে সন্তোষ। বলছে—'একে প্রেম বলতে পারো, করুণা মমতা বলতে পারো, কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে আদরের বা কৃপার পাত্রের চেয়ে ঢের বেশি করে পূর্ণিমাকে এই জিনিশ আমি দিয়েছি। একা তাকেই আমি ভালবাসি—এই পৃথিবীতে নানা জায়গায় নানা রকম দুঃস্থতা ও দুরবস্থা থাকলেও একা পূর্ণিমারই এই জিনিশটা সবচেয়ে আগে ও গভীর করে বুকে গিয়ে লাগে। কর্তব্য বোধে নয় অমূল্য—জীবনের স্বাভাবিক নিয়মের গতিতেই। কিছুতেই এই মমতা, ভালবাসা, দয়ার ফাঁদ থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিতে পারছি না আমি। বিয়ের আগে মেয়েমানুষের ভালবাসা বলো, করুণা মমতা বলো, পুরুষ যতটুকু মাধুর্য তার

জীবনের থেকে বের করতে পারে—তার বিবাহিত স্ত্রীটিকে নিয়েই সব। জীবনের দিনরাত্রির সংসর্গের এমনই একটা জোর, স্বামী-স্ত্রীর জীবনের অজস্র খুঁটিনাটির ভিতর মোহ এত কম, লালসা এত কম, অনুকম্পা এত বেশি, এবং পৃথিবীটা যতটুকু স্থির হয়ে বেঁচে রয়েছে, তুমি ভেবে দেখো, তা অনুকম্পারই অতি তুচ্ছ খণ্ডাংশ নিয়েই, লালসা বা মোহ, উত্তেজনা, ক্ষুধা বা হিংসার জোরে নয়—এ জিনিশটা এত বেশি শক্তিশালী! তোমাদের বিধাতাকেও তোমরা এই দিয়েই সৃষ্টি করেছ—দাম্পত্য জীবনেও স্বামীও স্ত্রীর প্রতি উদাসীন হতে গিয়েও এরই আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারে না—যে স্ত্রীর সঙ্গে সাতটি দিনও ঘর করেছে সে অনুকম্পায় করুণায় তারই জন্য অভিভূত হয়ে পড়ে।
নইলে, জীবনের সব জিনিশের প্রতিই তো শেষ পর্যন্ত গিয়ে বিমুখই ছিলাম—স্ত্রীর রূপ ও মোহও এক দিন লালসার খাদ্য জোটাল না আর, জীবনের অশ্রুমমতার ভিতর তলিয়ে গেল। এই অশ্রু মমতাই সত্য—দাম্পত্য জীবনে বধূকে নিয়ে এই মমতা ও অশ্রু।

সাত-আট দিন কেটে গিয়েছে।
সন্তোষের চোখে সমস্ত পৃথিবী যেন নরম, কোমল, মধুর ও নিবিড় হয়ে উঠেছে: পূর্ণিমা সেই খোড়ো ঘরের ভিতর পা ছড়িয়ে বসে রুদ্ধ হয়ে নেই আর। প্রসবের ভোরের মৃত্যুর ভিতর দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর ভিতর সে ছড়িয়ে পড়েছে—সমস্ত পৃথিবীর ভিতর সে ছড়িয়ে পড়েছে।

গল্প

মেয়েমানুষ

বৈশাখের দুপুরবেলা।

চপলা আধ ঘণ্টা না ঘুমোতেই জেগে গেল। জানালার ফাঁক দিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো দেখা যায়—ফুল ঝরছে।

পাশের রুমে কড়া চুরুটের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে—স্বামী অফিস থেকে ফিরে এসেছে তা হলে?

চপলা উঠে দাঁড়াল; চুরুট হাতে হেমেন্দ্র ঢুকলে; চপলার দিকে একবার তাকিয়ে বললে—'মোটর ফিট করতে বলে দিয়েছি।'

চপলা আড়মোড়া দিয়ে বললে—'থাক, আজ আর যাব না।'

—'বাঃ তুমিই তো বলেছিলে আজ শনিবার আছে।'

—'বলেছিলাম তো; কিন্তু কোথায় যাব? সিনেমায়? কী হচ্ছে আজ?'

হেমেন বললে—'দেখি, কাগজটা নিয়ে আসি।'

কাগজ নিয়ে হেমেন ঘরে ঢুকতেই চপলা বললে—'থাক, সিনেমা ভাল লাগে না।'

হেমেন ঈষৎ হতাশ হয়ে বললে—'মনসুনের আগে রেস তো আর শুরু হবে না—'

—'থাক রেস-ফেসে আর দরকার নেই—অনেক টাকা খুইয়েছ—দেখি কাগজটা।'

হেমেন কাগজটা স্ত্রীর দিকে ঠেলে দিয়ে অবসন্ন হয়ে একটা কুশনের ওপর বসে চুরুটটা হাতে করে হাঁফাতে লাগল। একটা কোলা ব্যাং যেন টাই

বেঁধে ছিটের কোট ঝুলিয়ে বসেছে।

চপলার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে—হেমেনের উনপঞ্চাশ। দু জনেরই শরীর মোটা হয়ে চলেছে—মাথার চুল পাতলা হয়ে আসছে।

হেমেনের প্যান্টের বেল্ট তার ভুঁড়িটাকে যেন আর সামলাতে পারে না; হেমেনের মুখও যেন তার ভুঁড়ির মতই: চপলার মুখও হেমেনের মতই যেন—কল্পনা বা স্বপ্নের কোনো চিহ্ন যেন এদের মুখাবয়বের ত্রিসীমানায়ও কোনোদিন ছিল না। হেমেনের নিজের অফিস। কয়েকখানা মাঝারি গোছের ট্রাক। ইট, সুরকি ও সিমেন্ট নিয়ে কলকাতার শহরে ছোটাছুটি করছে দশ বছর ধরে। আরো নানারকম ব্রাঞ্চ বিজনেস আছে। সামান্য কনট্রাকটর হয়ে চব্বিশ পরগনায় জীবন শুরু করেছিল সে। এখন তার সমস্ত ব্যবসার হেড অফিস কলকাতায় দু-তিন লাখ টাকা খাটছে।

চপলা কাগজখানা দেখছিল।

ঢনঢনিয়া মাড়োয়াড়ি মস্ত বড় এক ভোজ দিয়েছে; নিমন্ত্রিত লোকজনের ভিতর প্রায় শতখানেক নাম উঠেছে; চপলা অত্যন্ত গভীর অভিনিবিষ্ট হয়ে একটি-একটি করে নাম দেখছিল—সমস্তটুকু দেখতে তার আধ ঘণ্টা লাগল। হেমেনের চুরুট ফুরিয়ে গেল; চপলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাগজটা রেখে দিলে। না, এখনো তারা এত বড়লোক হয় নি যে ও-সব কলমে নাম তাদের উঠবে কিন্তু ঢনঢনিয়ার বাড়ির ভোজে তার স্বামীও তো গিয়েছিল, চপলা নিজেও তো গিয়েছিল। না—নিজেদের যতটা তারা মনে করে ততটা নয়, এখনো তার ঢের পেছনে। একশটা নামের লিস্টের ভিতর তাদের নাম কোথাও নেই, আজও নেই—এখন তাদের বয়স প্রায় পঞ্চাশ হতে চলল।

চপলা ঈষৎ অস্থির হয়ে উঠল। চুপচাপ বসে থাকলে মনটা কেমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে মানুষদের ওপর, পৃথিবীর ওপর, নিজেদের জীবনের অকৃত-কার্যতার ওপর।

চপলা নড়েচড়ে উঠে-বসে বললে—'চলো, লীলাদের বাড়ি যাই।'

—'বেশ টয়লেট করে এসো।'

আধ ঘণ্টার ভেতর টয়লেট সেরে সাজসজ্জা করে চপলা এসে বললে—'চা খেয়েছিলে?'

হেমেন মাথা নেড়ে বললে—'না।'

—'তা হলে ইয়াসিনকে বলি ; একটু করে দিক।'

—'থাক, আমি আর-একটা চুরুট জ্বালাই তার চেয়ে, কোথায় যাবে?'

—'চলো, লীলাদের ওখানে যাই।'

—'লীলা? দ্বিজেন ওকে নিয়ে চলে যাবে শুনেছিলাম।'

—'কোথায়?'

—'শিলঙে।'

—'কেন?'

—'কলকাতায় এই গরমে আমরাও তো দু-চার দিনের জন্য কোথাও গেলে পারতাম ; সবাই তো যাচ্ছে।'

—'একটু চেপে থাকো, কয়েকটা বড় অর্ডার এসেছে—ভাল ছেলেটির মতো এখন একটু চেপে থাকো তো লক্ষ্মীটি। কিন্তু লীলাকে নিয়ে দ্বিজেন যাচ্ছে? সত্যি!'

হেমেন একটু হাসল।

চপলা বললে—'ওদের দু জনে তো একদম বনে না—জানো?'

দ্বিজেনের জন্য দুঃখ করতে লাগল চপলা। হেমেনেরও দুঃখ—দ্বিজেনের জন্য।

মোটর কারটা কেমন বিগড়ে গেছে ; হেমেন হতাশ হয়ে কারটার দিকে একবার তাকাল.—'মোটর কার-এর কী হয়েছে যেন!'

চপলা বললে—'এই যা—তা হলে আর—, চলো ওপরে চলে যাই—'

হেমেন যন্ত্রপাতিগুলো পরিষ্কার করে ঘাঁটিয়ে দেখল, মোটর কারটার দিকে হাঁ করে একবার তাকাল, পাঁচ মিনিটের মত নটখটি করলে সে, কিন্তু গাড়ি একচুলও নড়ল না।

ড্রাইভারের হাতে গাড়িটা ফেলে দিয়ে হেমেন বললে—'চলো, বাসে যাই।'

বাসেই গেল তারা।

হেমেন বাসা করেছে বালিগঞ্জ অ্যাভিনিউতে—দ্বিজেন এখনও সেই সাবেকি শ্যামবাজারে থাকে ; অনেক বলে-কয়েও তাকে অ্যাভিনিউর দিকে টেনে আনা গেল না ; সে কেবল বলে, আচ্ছা আসছি আসছি ; কিন্তু আসে না, এই দশ বছরের ভিতরেও সে আসতে পারল না ; টাকা দ্বিজেনের কম

কী? কখ্খনো সে একেবারেই না—লীলাও না। কিন্তু আসলে এদের বনে না। কেন যে পরস্পরের ভিতর এ-রকম বনে না, স্বামী-স্ত্রীতে, হেমেন বুঝে উঠতে পারছিল না। কেন যে এরা পরস্পরকে আঘাত করে শুধু?

বাস ভর্তি, চপলাকে দেখে কেউ উঠে দাঁড়াল না। পরের স্টাণ্ডে একজন উঠে গেল—হেমেন চপলাকে সেই দিকেই পাঠিয়ে দিল। দু-এক মিনিট পরে যখন তার বোধ হল যে একটা কুলি না কী চপলার পাশে বসে আছে তখন তাড়াতাড়ি স্ত্রীর হাত ধরে তাকে বাস থেকে নামিয়ে ছাড়ল হেমেন।

এরপর এরা ট্যাক্সি করল।

তেতলায় না-পৌঁছতেই লীলার গলা।

হয় তো চাকরবাকর ধমকাচ্ছে। খুব বেয়াড়া বেয়াদব চাকরই বটে—লীলার আওয়াজও তেমনি খনখনে। হেমেনের মনে হল এই হচ্ছে জাঁদরেল আওয়াজ—তার স্ত্রীর যা নেই। এ না হলে ঘরের চাকরবাকরগুলোই লাই পেয়ে যায়, দাবড়ে রাখতে পারা যায় না। কিন্তু তার নিজের এ-রকম গলা নেই। পদে-পদে কত ব্যবসার কাজ জলের মত হাসিল হয়ে গেছে। এ-রকম ভাবতে-ভাবতে হেমেন তৃপ্তির সঙ্গে দোতলায় পা-পোষে নিজের বুটজোড়া ভাল করে ঘষে নিলে, চপলা হাই ছিল ঘষলে।

চপলাকে বললে—'লীলার সঙ্গে খবরদার লেগো না কিন্তু। ফর্ম ঠিক রেখো কিন্তু, বুঝলে?'

চুরুটটা জ্বালাবে কি না বুঝতে পারলে না সে; পকেটের থেকে বের করলে অন্তত; কিন্তু তেতলায় উঠতে না-উঠতেই সেটা পকেটের ভিতর ফেলে দিল। লীলার গলার আওয়াজ ডাইনিং রুমের দিক থেকে আসছে—হয় তো চাকর-বাকর নিয়ে কী-না-কী—হেমেনরা সেদিকে গেল না। দ্বিজেনটা হয় তো ড্রয়িং রুমে আছে—চপলাকে নিয়ে ড্রয়িংরুমের ভিতর ঢুকল হেমেন। কিন্তু কই, কেউ তো এখানে নেই।

—'দ্বিজেন—'

কোনো শব্দ নেই।

ঘড়িতে পৌনে তিনটে।

বেডরুমেও কেউ নেই।

অগত্যা ডাইনিং রুমের দিকে গেল তারা। ঢুকে দেখল ডিনার টেবিলের ওপর লীলা বসে—এ কী দারুণ রণচণ্ডী। হাতে তার দুখানা রুটিকাটা ছুরি নাচছে। দ্বিজেন এক পাশে একটা চেয়ারে বসে এক স্লাইস পাঁউরুটি হাতে করে চুপ করে রয়েছে।

—'দ্বিজেন।'

—দ্বিজেনবাবু।'

লীলা আগবাড়িয়ে বললে—'হয়েছে-হয়েছে, ওকে আর আশকারা দিতে হবে না।'

একটা রুটিকাটা ছুরি ডিশের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল লীলা; আর-একখানা নিজের হাতের ভিতর রেখে বললে—'এই আমাদের চা খাওয়া শেষ হল।'

চপলা বললে—'ভালই।'

হেমেন একটা চেয়ার টেনে এনে দ্বিজেনের গলায় হাত জড়িয়ে ফিসফিস করছিল।

লীলা বললে—'ওকে আর আশকারা দিও না ঠাকুরপো।'

চপলা বললে—'আহা বেচারা সারাদিন খেটেখুটে আসে—'

লীলা চোখ গরম করে বললে—'বেচারা মানে?'

—'আমি বলছিলাম, দ্বিজেনবাবু—'

—'দ্বিজেনবাবু বেচারা, আর আমি?'

চপলা কোনো কথা বললে না।

—'বেচারা সারাদিন খেটেখুটে আসে—তারপর?'

চপলা চুপ করে রইল।

লীলা বললে—'সারাদিন খেটেখুটে আসে বলে তাকে নিয়ে কী করতে হবে ঠাকুরঝি?'

চপলা বললে—'তোমরা না কি বেড়াতে যাচ্ছ?'

ছুরিটা দিয়ে নখ কাটতে-কাটতে লীলা বললে—'কে বলেছে? কোথায়?'

দ্বিজেন বললে—'ছুরিটা দিয়ে নখ কেটো না।'

লীলা দৃঢ়মুষ্টিতে ছুরির বাঁটটা ধরে দ্বিজেনের দিকে তাকাল—হেমেনের প্রাণ কেঁপে উঠল; দ্বিজেনের গলার থেকে হাত তুলে নিয়ে অত্যন্ত দাক্ষিণ্যের সঙ্গে লীলার দিকে তাকাল সে।

দ্বিজেন বললে—'এটা রুটিকাটা ছুরি নয় ? ভুলে যাও কেন ?'

হেমেন দ্বিজেনের কাঁধ আস্তে চাপড়ে দিয়ে বললে—'আহা থাক, থাক না।'

—'থাকবে ? কেমন থাকবে দেখাচ্ছি আমি !'

দ্বিজেনের কপাল লক্ষ্য করে লীলা হঠাৎ ছুরিটা ছুঁড়ে মারল। ছুরিটা ফসকে দেওয়ালে গিয়ে লাগল।

কয়েক মিনিট সকলেই স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল।

আরো একটা ছুরি ছিল টেবিলে—কিন্তু লীলা সেটা আর তুললে না। দ্বিজেন চশমাটা চোখ থেকে খসিয়ে নিয়ে মুছতে-মুছতে বললে—'ভোঁতা একটা রুটিকাটা ছুরি কপালে লাগলেও বা কী হত ?'

লীলা বললে—'কিন্তু চোখে লাগত যদি।'

—'তা হলে কী হত ?'

—'কী হত—ডিম বেরিয়ে যেত, আর কী হত !'

হেমেন বললে—'ছি !'

চপলা বললে—'তোমার স্বামীর ও-রকম হলে তোমার ভাল লাগত না কি লীলা ?'

লীলা বললে—'স্বামী আমার ! বড্ড স্বামী !'

হেমেন আশ্চর্য হয়ে বললে—'বলে কী ?'

চপলা হেমেনকে চোখ ইশারা করে বললে—'চুপ'।

দ্বিজেন মাথা নিচু করে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল। লীলা খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে চুপ করে রইল। তারপর বললে—'সকলে মিলে ছোটছেলের মত তুইয়েবুইয়ে নজর দিয়ে মাথা একেবারে খেয়ে ফেলেছে।'

হেমেন বললে—'কার মাথা ? দ্বিজেনের ?'

—'আর কার !'

—'কে খেয়েছে ?'

—'কেন তুমি—আর তোমার স্ত্রী।'

হেমেন রক্তাক্ত জমাট মুখে লীলার দিকে তাকাল। সেও হয় তো একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে, চপলা সভয়ে হেমেনের দিকে তাকিয়ে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দ্বিজেন হেমেনকে একটা ঠোনা দিয়ে বললে—'চা খাবে না কি ?'

চপলা বললে—'দ্বিজেনবাবুর ভাল খাওয়া হয় নি বুঝি ? আচ্ছা আমি তৈরি করছি।'

লীলা আগুন হয়ে বললে—'কেন ? তুমি তৈরি করে দিলে ভাল খাওয়া হবে আর আমি তৈরি করে দিলে হবে না ?'

চপলা সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে স্টোভ জ্বালাতে গেল।

লীলা চপলার কব্জি চেপে ধরে বললে—'জ্বালাও তো দেখি স্টোভ—জ্বালাবে ! হ্যাঁ ?'

দারুণ মোচড় খেয়ে চপলা টপকাতে টপকাতে নিজেকে সামলে নিয়ে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল—সমস্ত শরীর তার রিমঝিম করে উঠেছে যেন।

দ্বিজেন ফ্যানটা খুলে দিয়ে চেয়ারশুদ্ধ চপলাকে তুলে নিয়ে ফ্যানের নীচে বসালে। তার পর আস্তে-আস্তে চপলার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। লীলা বললে—'জানি নে আবার ! এই সবই তো করো তুমি !...সাধে কি আমি চটি তোমার ওপর—যেই একটু নজর দিতে ভুলেছি—'

লীলা উঠে দাঁড়াল।

দ্বিজেন আস্তে-আস্তে সরে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

লীলা বললে—'তোমার লজ্জা করে না ? চপলার সঙ্গে তোমার রক্তের কোনো সম্বন্ধ নেই—কী করে চেয়ারশুদ্ধ তুমি তাকে টেনে নিলে ? তার গায়ে হাতই-বা দিলে কী করে !'

হেমেন নড়ে চড়ে উঠল ; চপলা চোখ ইশারা করে তাকে থামতে বললে।

লীলা বললে—'আর যদিও-বা কোনো আত্মীয়তা থাকত, সে তো তোমার স্ত্রী নয়, বোনও নয়, কী করে তার গায়ে হাত দিলে তুমি ? আমার চোখের সামনেই এত ; চব্বিশটা ঘণ্টা হাইকোর্টের নাম করে তুমি কী কর জানি না ?'

হেমেন বললে—'কী করে ?'

লীলা বললে—'এর ওপর আবার বিজনেস ফেঁদেছে—'

হেমেন বললে—'বিজনেস করেই তো—'

চপলা বললে—'কীসের বিজনেস ? দ্বিজেনবাবুর ?'

—'কেন জে-বি-এ্যাণ্ড কোং—তুমি জানো না ?'

এতক্ষণ পরে কথাবার্তা ব্যবসার দিকে মোড় নিয়েছে দেখে হেমেন যথেষ্ট শান্তি বোধ করল। সে চুরুটটা এতক্ষণ পরে বের করলে ; জ্বালিয়ে নিয়ে

একটা টান দিয়ে অত্যন্ত আয়েসের সঙ্গে বললে—'জে-বি-এ্যাণ্ড কোম্পানি হচ্ছে—'

লীলার মুখের দিকে তাকিয়ে চপলা বললে—'থাক—'

হেমেন বললে—'বাঙালি ফার্ম ; এর ভেতর এক জনও বিলেতি মানুষ নেই, না ইওরোপের না আমেরিকার, এমন-কি মাড়োয়াড়ি অব্দি নেই।'

হেমেনের মনে হল সকলকে সে কোম্পানির রহস্য উদ্‌ঘাটন করে স্তম্ভিত করেছে ; কিন্তু কেউই স্তম্ভিত হয় নি ; কেউ তার কথা শুনছিল না।

হেমেন বলে চললে—'মাড়োয়াড়ি নেই, ভাটিয়া নেই, পশ্চিমা মুসলমান নেই—শুধু বাঙালি হিন্দু—ব্যস্‌!'

হেমেন বললে—'ওয়ার-এর সময় এই কোম্পানি স্টার্ট করা হয় ; প্রথম হয় রেঙ্গুনে, তখন অনেক কিছুই বুজরুকি হয়েছিল বটে, কিন্তু এটা বুজরুকি নয়, তখন দ্বিজেনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না।'

দু মিনিট গভীর আনন্দের সঙ্গে চুরুট টেনে পরম পরিতৃপ্ত হয়ে হেমেন বললে—'দ্বিজেন তো এর গুডউইল কিনেছে তিন বছর আগে'—লীলার দিকে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাকাল হেমেন।

বললে—'প্র্যাকটিস শিগগিরই ছেড়ে দেবে।'

চপলা বললে—'কেন ?'

হেমেন জ্বলন্ত চুরুটটার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললে—'এই বিজনেসের কাছে প্র্যাকটিস আবার কী ?'

লীলা বললে—'বিজিনেস করে টাকা জমিয়ে হবে কী ?'

হেমেন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে লীলার দিকে তাকাল।

লীলা বললে—'এই তো চোখের সামনে দেখলাম চপলার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করল। চপলা তার কেউ না—মাথায় হাত রেখে পিঠ বুলিয়ে ফিস-ফিস করে কানে-কানে কথা বলে কী নোংরামির পরিচয় দিল, বলো তো ঠাকুরপো ? আমার চোখের সামনেই এই—বাইরে কী করে কেউ কি জানে ? আমি ঘড়ি ধরে দেখেছি এগার-বার ঘণ্টা বাইরে থাকে।'

হেমেনের মন গজগজ করে উঠছিল—লীলার কথা ফুরতে না-ফুরতেই ফুক ফুক করে হেসে উঠল।

চপলা বললে—'উনি তো আঠার ঘণ্টা বাইরে থাকেন।'

লীলা বললে—'হ্যাঁ উনি—তোমার ওঁর ঐ টেকো মাথা আর বোঁদা চেহারা দেখে কোনো মেয়ে ওর সঙ্গে গাঁট বাঁধতে আসবে?'

হেমেনের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে লীলা বললে—'ঠাকুরপো, তোমার নাক যেন বুড়ো আঙুলের মত উচিয়ে আছে—বাপরে বাপরে!'

লীলা হো-হো করে হেসে গড়াতে লাগল—'ট্যাবা-ট্যাবা মুখ, নাক টেবু-টেবু, চোখ দুটো প্যাঁট-প্যাঁট করছে, কোনো মেয়ে এসব দেখে এগোয়?'

হেমেন লাফিয়ে উঠে বললে—'বটে। খুব দমফাট হচ্ছে বুঝি? আজও যদি চোখ মারি তো কুড়ি-পঁচিশটা মেয়ে এমন ফ্যা-ফ্যা করে আমার পায়ের কাছে এসে গড়াবে।'

লীলা হেসে কুটকুটি হয়ে বললে—'চোখ মারি! ঠাকুরপো মারবে আবার চোখ—তা হলেই হয়েছে।'

চপলা বললে—'ছিঃ! চোখ মারাটারা আবার কী। তুমি কক্ষনো যা কর না সেই সব নিয়ে আবার বড়াই করে বলো কেন?'

লীলাকে বললে—'না, কক্ষনো না, বুঝলে দিদি, এই কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে ওঁর সঙ্গে আছি, এক দিনের জন্যও কোনো মেয়েমানুষের দিকে উনি ফিরেও তাকান নি, ওঁর ব্যবসায়ের সমস্ত লোক জানে যে ওঁর কী রকম অকলঙ্ক চরিত্র, কলকাতা শহরের সমস্ত লোক জানে—'

হেমেন অত্যন্ত অপমানিত হয়ে রয়েছিল—চপলার কোনো কথা তার কানেও গেল না। লীলা তার পুরুষত্বকে কী কঠিনভাবেই না আঘাত করেছে! আপাদমস্তক গা জ্বলে যাচ্ছিল তার। রাগে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর দড়াম-দড়াম করে ঘুঁষি মারতে-মারতে হেমেন ক্রোধান্ধ হয়ে বললে—'চুলোয় যাক চরিত্র! মেয়েরা আবার আমার ফোঁপর দালাল আছে না? আমার সমস্ত হাঁড়ির খবর আমি বের করে দিচ্ছি।'

চপলা বললে—'তুমি পাগল হলে না কি?'

হেমেন হুংকার দিয়ে বললে—'কলকাতার সমস্ত বড় ঘরের মেয়েদের আমি পথে দাঁড় করাতে পারি, জানো লীলা?'

চপলা বললে—'দ্বিজেনবাবু।'

দ্বিজেন বললে—'চলো, তোমাদের মোটরে দিয়ে আসি।'

হেমেন এক ঝটকায় দ্বিজেনকে ঠেলে দিয়ে বললে—'ভেবেছ একেবারে চরিত্র

হাতে ধরে বসে আছি, হেমেন খুব সচ্চরিত্র ছেলে, মেয়েরা তাকে একটা গয়ারাম বলে ভাবে—কলকাতার শহরে তিন দিন পরে সাঁওতাল পরগনা বানিয়ে দিতে পারি।'

কাঁপতে-কাঁপতে বললে—'কলকাতা তো কলকাতা…লীলার মত যত সব প্যাঁচা-পেঁচি, চপলার মত যত সব প্যাঁচা-পেঁচি—সেবার যখন জয়পুরে গেলাম পাথরের বাড়ি দেখতে – ফিরছি, এমন সময়—'

কিন্তু রাজপুতবাঘিনী দেবলা দেবী-চঞ্চলকুমারীদের সঙ্গে রোমান্সের কথা শেষ করলে না আর হেমেন ; শুরুই শুধু করে রাখল। কেউ কোনো জবাবও দিচ্ছে না দেখে, লীলাকেও যথেষ্ট প্যাঁদানি দেওয়া হয়েছে বলে, মনটা তার নিরস্ত হয়ে আসছিল।

নতুন একটা চুরুট বার করে হেমেন শান্তি পাচ্ছে। চুরুটটা জ্বালিয়ে, টেনে, মনটা তার ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে, চপলার প্রতি, দ্বিজেনের প্রতি, এমন-কি লীলার প্রতিও অনুকম্পায় তার সমস্ত প্রাণ ভরে উঠল।

বললে—'চলো দ্বিজু, চলো লিলি, বায়োস্কোপ দেখতে যাই।'

কিন্তু ঘড়িতে তখন চারটে বেজে গেছে ; প্রথম শোতে গিয়ে আর লাভ নেই। ছটার পারফরমেন্সের জন্য এদের সবাইকে সে তৈরি হতে বললে। তারপর নিজেই স্টোভটা টেনে নিলে।

লীলা বললে—'কেন ?'

—'গরম জল করব।'

—'কেন ?'

—'বাঃ, দ্যাখো না ? তোমরা মেয়েরা তো আর করবে না, এখন পুরুষদেরই মশলা পিষতে হবে, চা বানাতে হবে, দেখো, কী রকম খাশা চা করি।'

কিন্তু লীলার কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি বা আশ্বাস পেলে না হেমেন।

চপলা বললে—'এখন আবার চা খাবে কে ? কারো খাবার দরকার নেই।'

হেমেন বললে—'আলবাত খাবে।'

চপলা বললে—'কেউ খাবে না—তুমি স্টোভ নিবিয়ে ফেলো।'

হেমেন একটু চোখ টিপে মুচকি হেসে বললে—'দিদিমারা খাবে।'

চপলা বললে—'কারা ?'

স্বামীর দিকে তাকিয়ে দেখল সে—বাস্তবিকই হেমেনকে সুন্দর দেখাচ্ছে না

মোটেই—টেবু-টেবু নাক, ট্যাক-ট্যাক মুখ, চোখ প্যাট-প্যাট করছে।

হেমেন বললে—'তুমি আর লীলা।'

লীলা বললে—'আমরা দিদিমা ?'

হেমেন বললে—'জানলে দ্বিজেন, এরা আবার আমাদের চেহারা নিয়ে ঠাট্টা করে, কে বলবে এরা আধবয়েসি মেয়েমানুষ ? একটু হ্যাঁচকা দেখলেই মনে হবে বাপরে বাপ, ঠানদিদি-ঠাকমা এল আবার, মনে হয় না দ্বিজেন ?'

কিন্তু দ্বিজেন কিছু বলবার আগেই লীলা এক ঝটকায় স্টোভসুদ্ধ প্যান উল্টে ফেলে দিল। গরম জলটা হুস করে চারদিকে ছিটকে পড়ল। হেমেন পুড়তে-পুড়তে বেঁচে গেল। স্টোভটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। দ্বিজেন, আর প্যানট্রির থেকে ননকু এসে সমস্ত নিভিয়ে নিস্তব্ধ করে দিল।

সিনেমায় আর যাওয়া হল না।

দিন তিনেক কেটে গিয়েছে।

জে-বি-আর্মস্ট্রং কোম্পানির পাশ দিয়ে হেমেনের মোটর আস্তে-আস্তে চলছিল ; একবার ভিতরে ঢুকে শ্রীমানকে দেখে যাবে না কি ভাবছিল হেমেন। বড় রাস্তায় একটা গলির কাছে মোটর থামিয়ে আর্মস্ট্রং কোম্পানির দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল হেমেন। ব্যবসায়ের যে-কোনো পত্তনের দিকে তাকাতে গিয়েই সে কোমল সবুজ হয়ে ওঠে—তার জীবনের সমস্ত কল্পনা ও কুহক পৃথিবীর সমস্ত সওদাসদায়ের রাজ্যের ভিতরে শুধু।

হেমেনের মনে হল আর্মস্ট্রং-এর ফ্ল্যাট এমন বড় না কিছু—'স্টিফেন হাউসের কিংবা একশ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রিটের একটা কামরার মত শুধু যেন।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল হেমেন ; তার নিজের অফিসটাই-বা কতটুকু ? কিন্তু চুনকাম করে নিয়েছে সে, হুইটলি আর্মস্ট্রং-এর মত একটা বাঙালি কোম্পানি এসে কাজ করে দিয়ে গেছে—কিন্তু আর্মস্ট্রং এখনো তেমনি বিবর্ণ, জায়গায় জায়গায় চুনবালি খসে পড়ছে ! মোটর থেকে নামল হেমেন।

হাঁটতে-হাঁটতে মনে হল সমস্ত ব্যবসাই আজকাল বসে যেতে বসেছে—গত দেড় বছর ধরে ক্রমাগত ক্ষতি দিয়ে আসছে সে। আর কিছু কাল এ-রকম চললে ব্যবসা বন্ধ করে দেবে সে। ব্যাঙ্কে এখনো যা টাকা আছে তার সুদ

দিয়ে তাদের দু জনার এখনো বেশ চলবে। কোনো ছেলেপিলে হয় নি তাদের। একটা অপরিসীম শান্তিতে চুরুটটাকে জ্বালাল।

দ্বিজেন উঠে পড়বে ভাবছিল।

'হ্যালো খাস্তগির'—অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে হেমেনের দিকে তাকাল সে।

আজ শুধু ব্যবসায়ের কথাই হল, তিন দিন আগের ঝক্কি ঝকমারির বেদনার নিরাশার কেউ কোনো উল্লেখই করল না। ব্যবসায়ের দুর্গতিই দু জনকে সব থেকে বেশি বিষণ্ণ করে দিয়েছে, ব্যর্থ করে ফেলেছে।

চার-পাঁচ দিন পরে হেমেনের অফিস থেকে তাকে নামিয়ে নিয়ে গেল দ্বিজেন। সাহেবপাড়ার একটা গ্রিল-ফিলের দিকে মোটর ঘুরিয়ে চলল দু জনে।

—'নাঃ, ঢুকেই পড়া যাক।'

গিয়ে বসল। শুয়োর, ভেড়া, মুরগির মাংসের নানা রকম জিনিশ, কফি, কিছু পুডিং, ফল, আইসক্রিম একে-একে আসছিল। হেমেন বললে, 'ব্যাপারটা কী জানলে দ্বিজেন, ব্যাঙ্কে এখনো লাখ দেড়েক রয়েছে।'

দ্বিজেন বললে—'লাখ দেড়েক!'

হেমেন বললে—'এখনো ট্রাকগুলো দস্তুর মত অর্ডার নিয়ে কলকাতা শহরে ছুটে বেড়াচ্ছে।'

হেমেন বললে—'এই দেড় লাখ টাকার ইন্টারেস্টে, আমি আর চপলা দু জন মানুষ তো শুধু, এলাহি চালে থেকে যেতে পারি—বালিগঞ্জের বাড়ি তো রয়েইছে।'

একটু থেমে—'করবও তাই। ব্যবসা—কী হবে ব্যবসা করে আর? ভাল লাগে না কিছু—সত্যি।'

দ্বিজেন জিজ্ঞেস করতে গেল না, কেন ভাল লাগে না। ব্যাঙ্কে দ্বিজেনেরও লাখখানেক রয়েছে। বালিগঞ্জে না হোক, শ্যামবাজারে তারও বাড়ি রয়েছে। বেশ ভাল বাড়িই। কিন্তু তবুও কেমন একটা বিমর্ষতা নিরর্থকতা পেয়ে বসেছে তাকে। অনেক দিন ধরে। হেমেনের এই সদ্যোজাত ভাল না লাগার চেয়ে সে ঢের আলাদা জিনিশ।

হেমেন বললে—'সত্যি কিছু ভাল লাগে না কেন, বলো তো দ্বিজু?'

—'কেন ভাল লাগে না বলো তো হেমেন?'

—'কী যেন, মনটা কেমন টসকে গেছে—'

—'কেন ?'

–'বাস্তবিক, টাকাই কি সব দ্বিজু ?'

দ্বিজেনের কাছ থেকে কোনো জবাবের অপেক্ষা না করেই হেমেন বললে—'বাস্তবিক, লীলা যা বলেছিল ঠিকই, আমাকে একটা খটকা লাগিয়ে দিয়েছে—'

দ্বিজেন ঘাড় হেঁট করে খাচ্ছে।

হেমেন বললে—'এই ভুঁড়ি, টাক মাথা, ট্যাবা-ট্যাবা মুখ, টেবু-টেবু নাক, চোখ দুটো প্যাট-প্যাট করছে, বাস্তবিক আমি কী হয়েছি বলো তো ?'

দ্বিজেন বললে—'একটু হালকা হয়ে নাও না !'

– 'হালকা হয়ে কী হবে, চেহারাই অত্যন্ত বদ নজরের। সেদিন এক জন মেয়ের পিছনে লেগেছিলাম।'

—'সে কী !'

–'মেয়েদের ফেরে-ফেরে আমি না থাকি যে তা নয়। কিন্তু চপলা তা জানে না। কিন্তু এদ্দিন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছুঁড়িদেরকে এনে বায়স্কোপ দেখিয়ে ভাবতাম সব সাধ মিটল বুঝি। কিন্তু তাতে শুধু হয় না—আরো কী একটা জিনিশের প্রয়োজন যেন।'

দ্বিজেন বললে —'কেন চপলাই তো রয়েছে।'

—'কিছু না।'

রোস্ট খেতে-খেতে ছুরিটার দিকে একবার তাকাল।

হেমেন বললে—'না চপলা তো রয়েইছে ; এমন চমৎকার গিন্নি, ও না থাকলে কি আর চলত, এ-সব মেয়েদের নামে কোনো নালিশ চলতে পারে না।'

একটু থেমে 'কিন্তু আমি চাই কী জানো ?'

দ্বিজেন মুখ তুলল, একটা ভাল ছুরি বেছে নিলে।

হেমেন বললে—'মেয়েরা আমাকে দেখে ভুলে যায়, আমার কাছে এসে নিজেদের নিবেদন করে—এসব কোন পুরুষ না চায় দ্বিজেন ?'

এরপর দু-তিন মিনিট স্তব্ধ হয়ে খুব তাড়াতাড়ি করে কাঁটা-ছুরি চালিয়ে নিতে লাগল হেমেন।

হেমেন তারপর বললে– 'কিন্তু লীলা যা বলেছে—ঠিকই। সে পুরুষ আমি

নই যার পেছনে মেয়েরা পইপই করে ঘুরবে। কেন ঘুরবে? আমার পেছনে? আমি কী?'

দ্বিজেন বললে—'আমিই-বা কী?'

—'নাও-নাও—তোমার সুন্দর চেহারা আছে! আমি আমার গুডউইল দিয়ে দিতে রাজি, তোমার চেহারা যদি পাই।'

হেমেন বললে—'তুমি তো বরাবরই মেয়ে পটকে এসেছ, আমি জানি না না কি! বিলেতে, ইণ্ডিয়ায়। বড়লোকের ছেলে, নিজে রোজগার করেছ, তার ওপর এই এমন চেহারাখানা। সে আমি জানি—তুমি ঢের মেয়ে পটকে এসেছ!'

হেমেন কিছুতেই এই ব্যথা উতরে উঠতে পারছিল না আর, এ বেদনা তাকে অভিভূত করে ফেলেছে।

দ্বিজেন বললে—'মেয়ে পটকানোই কি সব?'

—'এসেছ তো পটকে—অনেক মেয়ে!'

—'মেয়ে পটকে আর কী হয় হেমেন?'

—'ও:, অনেক হয়; জীবনে অনেক ফুর্তি করেছ! এখন তুমি চোখ বুজে তৃপ্তিতে মরতে পার, পার না কি?'

হেমেন বললে—'পার না কি।'

কোনো জবাবের প্রতীক্ষা না করেই বললে—'পারা উচিত তোমার; আমি হলে তো পরম শান্তিতে চোখ বুজতে পারতাম।'

গভীর ক্ষোভে হেমেন কফির পেয়ালা ধরল।

বললে—'এই যে এখনো আধবুড়ো হয়ে গেছ, চার-পাঁচ জন ব্যারিস্টার গিন্নির সঙ্গে এখনো তোমার ইয়ার্কি চলে, আমি দেখেছি না নিজের চোখে?'

দ্বিজেন বললে—'ইয়ার্কি শুধু, আর কিছু না হেমেন?'

—'কিন্তু ইয়ার্কিটাই ঢের মিষ্টি। আমি তো নিজেই চেয়ে-চেয়ে কতবার দেখলাম। আমাদের সঙ্গে ও-রকম ইয়ার্কিই-বা কে করতে আসে?

—'কেন, চপলা?'

—'ঠাট্টা করো না দ্বিজেন।'

দ্বিজেন বললে—'নিজের বধূর সঙ্গে হাসি-তামাশাই তো সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে।'

হেমেন একটা চুরুট ধরিয়ে বললে—'অবিশ্যি সেখানে তুমি ঠকেছ।'
দ্বিজেন কোনো এক জায়গায় খানিকটা ঠকে গেছে বলে কয়েক মুহূর্ত যেন তৃপ্তির সঙ্গে হেমেন চুরুট টেনে নিল।
কিন্তু তারপরেই দ্বিজেনের সুন্দর মুখ, চমৎকার টাই ও সুন্দর-সুন্দর ব্যারিস্টার বধূদের সঙ্গে এর ছেনালির কথা ভেবে হেমেনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। মনের ভিতর একটা আঘাত পুষে খানিক ক্ষণ সে চুরুট টেনে গেল। তারপর বললে—'তোমার ব্যবসা গেলেই-বা তোমার কী হয় দ্বিজেন? মানুষের জীবনের আসল জিনিশটাই তো তুমি পেয়েছ—মেয়েরা তোমাকে ভালবাসে। নিজের সেন্টিমেন্টালিজম তুমি কত জায়গায় গিয়ে মেটাতে পার।'
দ্বিজেন সিগারেট কেস বের করলে।
হেমেন বললে—'তোমার বেশ মজা, লীলা তোমার মনটাকে দিয়েছে খিচড়ে—ওদিকে তাই তোমার জমে ভাল। লীলা যদি ভাল গিন্নি হত তাহলে মেয়েদের সঙ্গে ছেনাল করে বেড়াবার তাগিদও থাকত না তোমার। সেটা তেমন ভালও লাগত না হয় তো। লাগত?'
একটু পরে—'অবিশ্যি ছেনালপনা সব সময়ই ভাল লাগে, বিশেষত যে-রকম বাগিয়ে নিয়েছ চারদিকে। কিন্তু এখন যেমন লীলার ওপর বিমুখ বৈরাগ্য করে একা মোটরখানা নিয়ে বিরহীর মত ঘুরে-ঘুরে উচ্ছ্বাস করবার সুবিধে পাও, লীলা অন্যরকম হলে কি পেতে?'
ক্ষোভ-আকাঙ্ক্ষায় হেমেনের মন ভরে উঠল। দ্বিজেনের একদিনের জীবনও যদি সে পেত। হলই-বা দ্বিজেনের নিজের স্ত্রী ফটফটে—পরের স্ত্রীদের এমন হাতে পায়ে গুছিয়ে রাখতে ওর মত কে পেরেছে!'
হেমেন বললে—'সেন্টিমেন্টালিজম শুধু? ওদের সঙ্গে তুমি কী কর না কর—আজীবন তুমি পথেঘাটে কত বাড়ি ভেঙে এসেছ কেউ কি তার খবর রাখে?'
একটু থেমে—'আমি যদি সমস্ত জীবনও ক্ষয় করি তবু একটি মেয়ের সাচ্চা খাঁটি ভালবাসা পাব না, আর তোমাকে কত মেয়ে যেচে ভালবাসতে আসে—'
একটু পরে—'কেন এমন হয় দ্বিজু?'
হেমেনই বললে—'অবিশ্যি আমার চেহারাটা! এ নিয়ে মেয়ে পটকানো যায় না দ্বিজেন।'

নিরাশার অতল অন্ধকূপের ভিতর ডুবে গিয়ে হেমেন স্তব্ধ হয়ে চুরুট টানতে লাগল। জীবনে প্রেম হল না, প্রণয় হল না, ছেনালি অব্দি হল না। এক জন পরের স্ত্রীকে আটকে রেখে মোকদ্দমায় যদি সে পড়ত তাহলেও যেন একটা ক্ষোভ মিটত। এখন যেন রক্ত মাংস বিবেচনা বুদ্ধি বিবেক সমস্তই কামড়াচ্ছে তাকে—হালু-হালু করে কামড়াচ্ছে। কেন এমন হল? সারা জীবন, জীবন বলে জীবন, এমন গয়ারাম সেজে গেল কেন সে! মেয়ে পটকানোর একটা সময় থাকে; ত্রিশের পর ও-সব কথা আর না।

হেমেনের সমস্ত মুখ, মাথা, টাক টস-টস করে ঘামতে লাগল।

ভুল করে চুরুটের জ্বলন্ত দিকটা একবার কামড়ে ধরে হেমেন শরীরের যন্ত্রণাও যথেষ্ট পেল। সব রকম যাতনার একশেষ হল তার।

দ্বিজেন বলে—'বলাই ভাল, আমরা বুড়ো হয়ে গেছি, ও-সব দিয়ে আমাদের আর কী হবে—'

—'কে বুড়ো? তুমিও না—আমিও না।'

—'পঁচিশের পর সকলেই বুড়ো—মেয়ে-মানুষ নিয়ে খেলা করবার দিক দিয়ে সতের-আঠার, কুড়ি-বাইশ এই হচ্ছে বয়স।'

হেমেন হাঁ করে তাকাল।

দ্বিজেন বললে—'আমারও যা হয়েছে—এই বয়সেই।'

—'কেন, এখনও তো—'

—'কিছু না, কিছু না, আমি তোমার হাত ছুঁয়ে বলছি—আমি এখন শুধু একটু শান্তি চাই—মেয়েদের পিছু-পিছু ঘুরে নয় হেমেন, নিজেরই ঘরে, নিজের স্ত্রীকে নিয়ে, জানো না তুমি, কেউ আমাকে ভালবাসে না!

—'কেউ না?'

—'না।'

হেমেন হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

দ্বিজেন বললে—'কুড়ি বছরের মেয়েরা আমাকে ভালবাসবে কেন—আমার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হতে চলল। সে ভদ্রলোকের মেয়েরাই হোক বা আংলো ইণ্ডিয়ানই হোক! আঠার-কুড়ি-বিশ-বাইশ বছরের মেয়েদেরগুলো হৃদয়ের ওপর কোনোরকম কিছু দাবি আমরা অনেক দিন হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের তারা জ্যাঠামশাই ভাবে; হয় তো ঠাকুদ্দাও।'

হেমেন আমোদ পেয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল। দ্বিজেনের এই সব সাফ কথা শুনে মনের ভারটা যেন তার অনেকখানি কমে গেছে। বাস্তবিক দ্বিজেন যা বলে তাই। না হলেও ব্যারিস্টার তো। এমন মিঠে করে জিনিশের আঁশটি বার করে নিয়ে আসে!

একটু পরে হেমেন খুব অভিনিবিষ্ট হয়ে বললে—'কুড়ি না-হোক, পঁচিশ না-হোক—অন্তত ত্রিশ বছরের মেয়েরা?'

—'তাও না। তাদের জন্য ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছরের ছোকরারা রয়েছে। পৃথিবীতে সৌন্দর্যেরও অভাব নেই। আমি ঢের দেখেছি। এমন-কি কুড়ি-পঁচিশ বছরের ছোকরাদের সঙ্গেও তারা প্রেম করবে—প্রেম করবে একেবারে মরিয়া হয়ে। আমি দেখেছি—ঢের।'

দ্বিজেন বললে—'একজন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের গিন্নি হয় তো এক-আধ মুহূর্তের জন্য তোমার প্রতি একটু নরম হতে পারে, তুমিও যেমন একটু গদগদ হয়ে উঠতে পার তাকে দেখে—কিন্তু তা ভালবাসা নয়, কিছুই নয়, একেবারে রাবিশ।'

দ্বিজেন মাথা তুলে বললে—'ভেবে দেখো, হয় তো মোটরে চড়ে চলেছি, একটি বিশ আর একটি ত্রিশ বছরের ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে। আঠার বছরের, চল্লিশ বছরের, পঞ্চাশ বছরের তিনটি মেয়েমানুষ দেখলাম পাশের মোটরে; ধরো, তিন জনেই বেশ দেখতে। কিন্তু, তবুও, হয় তো আঠার বছরের দিকেই আমার মন যাবে।'

হেমেন বললে—'তা যাবে।'

—'কিন্তু সেই মেয়েটির মন কি এই পঞ্চাশ বছরের বুড়োর দিকে আকৃষ্ট হবে—সমস্ত পৃথিবী বিকিয়ে দিলেও?'

হেমেন হাঁ করে তাকাল।

তারপর হি হি করে হাসতে লাগল।

দ্বিজেন বললে—'আমার ভাইপোকেই সে ভালবাসবে না হয় আমার ছেলেকে—আমাকে কিছুতেই নয়। ভালবাসা, রোমান্স, এমন-কি কামনার কথাও আর বলো না হেমেন! ও-সব ভাবতে গেলেও ঢের ব্যথা।'

পকেটের থেকে দেশলাই বের করে দ্বিজেন বললে—'আমাদের এই পড়ন্ত বয়সে সৌন্দর্য আর ভালবাসার কথা চিন্তা করতে গেলেও জীবনকে এমন

থুককুড়ি মনে হয় !'

সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল ; জ্বালিয়ে নিয়ে দ্বিজেন বললে—'আমাদের পকেটে এখন আর কিছু উঠবে না, শুধু ঘরের বধূ ছাড়া, আমাদের জন্য আর-কিছু নেই।'

দ্বিজেনের সেই ঘরের বধূ যে লীলা এবং নিজের চপলা—এই ভেবে হেমেন ঢের পরিতৃপ্তি পেলে।

বিল সে নিজেই মিটিয়ে দিল।

দ্বিজেন বললে—'খোকা তুমি, আহা তোমার মা নেই বোন নেই—তোমার জন্য ভারি কষ্ট হয়।'

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। হেমেন বললে—'দ্বিজু, চলো আমরা টালিগঞ্জ, আলিপুর, চেতলা, বেহালা বেড়িয়ে আসি।'

—'সত্যি এত সব জায়গা ঘুরবে তুমি ?'

—'নিশ্চয়ই।' হেমেন সজোরে মাথা নেড়ে বললে।

—'কেন ?'

—'এমনিই।'

—'কোনো ব্যবসা-ট্যাবসার সুবিধের জন্য ?'

—'না।'

—'এমনিই ?'

—'অনেক বদভ্যাস বসেছিল মনের ভিতরে—'

—'ফিরতে যে অনেক রাত হয়ে যাবে।'

—'হোক।'

দ্বিজেন বললে—'তুমি যাও ; আজ আমার দরকার আছে।'

বিজনেস ! তা হলে দ্বিজেনকে ছেড়ে দিতে পারে সে। হেমেনের সমস্ত মন এখন প্রেম, কামনা ও মেয়েমানুষের থেকে উঠে এসে আবার ব্যবসার গদিতে পরম আরামে ও নিবিড় শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছে গিয়ে। জীবনটা তার কাছে ব্যর্থ নয় আর, প্রাণের ভেতর কোনো খোঁচ নেই, সমস্ত পৃথিবী অসীম অর্থে ভরা।

হেমেন আকাশটার দিকে তাকাল—আতার বিচির মত অন্ধকারে সমস্ত কলকাতায় আকাশটা গেছে ভরে ; মেঘের অন্ধকার—টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। তার এখন ভাল লাগল, চপলার কথা মনে হল। বধূর মমতা ও ভালবাসায় তার সমস্ত মনটা ভরে উঠল। হেমেনের মতন এমন নিবিড় পরিতৃপ্ত মানুষ কলকাতার রাস্তায় আজ আর-একটিও নেই যেন। আজ সমস্ত রাত চপলাকে ভালবাসবে সে—আজ সমস্ত বাদলের রাত ভরে এমন একটা অপরিসীম শান্তি পাবে সে।

কিন্তু তবুও এখনই চপলার কাছে যাবে না সে।

বিজনেস ইজ বিজনেস। সে বিজনেসের মানুষ। সে সঙ্কল্প করেছে, দ্বিজেনের কাছে স্বীকার পেয়েছে যে টালিগঞ্জ, আলিপুর, চেতলা, বেহালা বেড়িয়ে আসবে। বেড়ানোটা এমনিই—কোনো ব্যবসার উপলক্ষ নিয়ে না, হোক তাই। ফিরতে-ফিরতে রাত এগারটা বাজবে ; বাজুক। কিন্তু দ্বিজেনকে বলেছে সে যে টালিগঞ্জ, আলিপুর, চেতলা বেড়াবে। বলেছে যখন নড়চড় নেই, সেটা দুর্বলতা ; এক জন ব্যবসায়ীর পক্ষে সে-রকম ঢিলেমি ব্যবসাপথটাই অপরিষ্কার করে দেয়।

স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে হেমেন চলল।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে দ্বিজেন পিছু-পিছু চলল।

বালিগঞ্জ অ্যাভিনিউ-এর দিকে দ্বিজেন যখন মোড় নিল—হেমেন তার ঢের আগেই টালিগঞ্জের দিকে ছুটে চলেছে। দ্বিজেন এ-গোঁয়ারকে খুব ভাল করেই চেনে ; রাত বারটার আগে ও আর ফিরবে না।

দ্বিজেন তেতলায় উঠে দেখল চপলা—গড়াচ্ছে।

এই বিরাট মেদকে দেখে প্রথমটা তার মন কেমন কুঞ্চিত হয়ে উঠল ; কিন্তু তবুও এই মেদের নীচে যে হৃদয় রয়েছে তা এমন চমৎকার—এত নমনীয়। এই মেয়েটিকে নিয়ে আধ ঘণ্টা-এক ঘণ্টা-দু ঘণ্টা কাটল দ্বিজেনের। কিন্তু তার পরে - রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে—বুকটা কেমন ঢিব-ঢিব করতে লাগল দ্বিজেনের। হেমেন যে কোনো মুহূর্তেই এসে পড়তে পারে—খট-খট খট-খট করে—একটা বেতো টাট্টুর মত।

এমন বিরক্তি লাগতে লাগল তার।

কিন্তু তবুও বেরিয়ে যেতে হবে—। ড্রয়িং রুম থেকে ড্রয়িং রুমে অনেক

ঘোরে সে বটে, কিন্তু তবুও তারপর বেরিয়ে যেতে হয়। গিন্নিরাও চায় যে তাদের স্বামী আসুক—এ অতিথি বেরিয়ে যাক, বেরিয়ে যাক। বেরিয়ে সে গেলই।

হিসেব-নিকেশ

রাত তিনটে বেজে গেছে— অবনীশের ঘুম ভেঙে গেল।

এরই মধ্যে জীবনের পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে। এই সেদিনও সে যেন ইস্কুলে পড়ছিল। কিন্তু ইস্কুলের কথা ভেবে তার মনের ভিতর কোনো খাদ নেই ; কিশোর দিনগুলো হারিয়ে গেছে, যৌবন সে আর ফিরে পাবে না এ-সব ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাতে যায় না অবনীশ।

এই পঞ্চাশ বছর কেটে গেল বলেই না ব্যবসা তার আস্তে-আস্তে এত উন্নত হয়ে উঠতে পারল। বছরের বোঝা এমনি করে তার কাছে খুব সহজ হয়ে ফেঁসে গিয়েছে, বর্তমানটা এমনি ভারহীন, ভবিষ্যত কোনো বোঝা নয়।

অবনীশের ছেলেটি কলেজে পড়ছে—মেয়েটি পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশে। ছেলেমেয়ে এই দুটিই ; অনেক চেষ্টা করেও আর হল না। হয় তো হবে—ষাট সত্তর বছর বয়সেও মানুষের ছেলেপুলে হয় না কি ?

অবনীশের একটা ফার্মেসি ছিল কিন্তু সেটা তিন বছর হল উঠিয়ে দিয়েছে সে। আরও আগে সে চামড়ার ব্যবসায় হাত দিয়েছিল। কিন্তু কোথায় যেন বাধল। মুর্গি-হাঁস ছাগল-ভেড়ার ব্যবসার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু একদিন অনেক রাতে হঠাৎ উঠে বসে স্ত্রীকে বললে : দেখো এই হাঁস-মুর্গিগুলোর মত আমাদেরও যদি কেউ পুষ্টোলো মুটিয়ে ডিম পাড়িয়ে নিয়ে একসময় খাঁচায় ভরে হাটে পাঠিয়ে দেয় কেমন হয় সেটা ? দুজনেই শিহরিত হয়ে উঠল।

ও সব ছেড়ে দিলে তারা।

তার পর থেকে এই এজেন্সির বিজনেস ; অনেক কিছু ছোট বড় নটবহরের

এজেন্ট সে আজ, ব্যবসা ধাপে-ধাপে চলেছে।

এরই মধ্যে দু-একবার বিলেত ঘুরে এসেছে সে।

অবনীশ উঠে দাঁড়াল।

মাঘের মাঝামাঝিই শীত নেই আর—কেমন বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে; শোবার ঘরের জানালাগুলো যা দু-চারটা বন্ধ ছিল খুলে দিল অবনীশ।

জানালার পাশে গিয়ে তার মস্ত বড় শরীরটাকে বজায় রাখল সে। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, মাথায় টাক পড়েছে, কিন্তু তবুও মুখখানা কেমন ছেলেমানুষের মত, গালফোলা একটি খোকা যেন—এমন নিরীহ! অথচ ব্যবসার মারপ্যাঁচ এর চেয়ে বেশি কেউ জানে কি?

সমস্ত মেদচর্বির শরীরটা যেন একটা তুলোর গদি; গালদুটো তুলোর গদি; পুরু ঠোঁট তুলোর কোলবালিশ; খাঁদা নাক—তুলোর গদি; চোখের বড় বড় ড্যালা দুটোও যেন দুটো গদি—তুলোর অথবা ভুসির।

ত্রিশ বছর হল বিয়ে হয়েছে অবনীশের, সমস্ত গায়ের থেকেই মজে যাওয়া বিবাহের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে যেন; এক-এক সময় সেটাকে কেমন দুর্গন্ধের মত মনে হয়। কিন্তু তবুও সবসময়ই স্ত্রীই সব নয় এমন এক-আধ মুহূর্ত আসে জীবনে—হয় তো আজ এই বসন্তের শেষ রাত্রিই এসেছে যখন মনটা একটু উড়তে চায়—কিন্তু কাকে নিয়ে উড়বে? সমস্ত জীবন ঝেড়েও একটি সুন্দরী মেয়েমানুষ খুঁজে পায় না সে। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকে নিয়েই যে সর্বদা তৃপ্ত হয়ে থাকতে হবে শুধু, তাও তো নয়। না, না, তা মোটেই নয়। কী করবে সে? কোথায় সেই মাধুরীময়ীকে পাবে? কিন্তু এ সব খেয়াল তার বেশিক্ষণের জন্য থাকে না। এখনই সে ভুলে গেছে।

রাস্তার মোটরগুলোকে দেখছে সে—এত অন্ধকার থাকতেই এত মোটর বাঁই বাঁই করে ছুটেছে কেন? হয় তো ব্যবসায়ের হিড়িকেই। কী কী ব্যবসার ফ্যাকরায় এগুলো ছুটতে পারে আন্দাজ করে ভেবে দেখছে অবনীশ—মস্ত বড় এক লিস্টি হয়ে গেল—সেই পুরনো লিস্টিটা। যখনই রাত থাকতে জেগে উঠে জানালার কাছে এসে এই মোটরগুলোর দিকে তাকায় অবনীশ এক একঘেয়ে নিরবচ্ছিন্ন লিস্টিটাকে কিছুতেই ছাড়াতে পারে না সে। এ তাকে আকাশের তারা দেখতে দেয় না। ভোরের হাওয়াটাকে উপভোগ করতে দেয় না, তার সুন্দরী মেয়েমানুষকেও মাড়িয়ে ফেলে।

মোটরগুলো কী হতে পারে ?

এক-এক করে চিনে নিচ্ছে অবনীশ ।

সব সময়ই যদি এ-রকম মাথা খাটাতে হয় ?

ভোরের বাতাসে মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা করে নিতে পারবে না নাকি ? --এমন দখিনে বাতাস ছেড়েছে আজ ! বিছানাটার দিকে তাকাল অবনীশ ; বিছানাটাকে সে বিশেষ ভালবাসে না। একবার উঠে পড়লে বসতেই চায় না সে—শোয়া তো দূরের কথা।

কিন্তু ক-রাত থেকেই ঘুম ঢের কম হচ্ছে !

বিছানায় গিয়ে বসল সে।

ঘুমোতে চেষ্টা করল ; হয় না। খবরের কাগজের ছোকরাগুলো চিৎকার করছে—বাংলা কাগজ ; বাংলা কাগজই সবচেয়ে আগে বেরুল ? অন্ধকার থাকতেই ? বাঙালির এই ব্যবসাবোধে সে ঈষৎ খুশি হয়ে চিৎ হয়ে শুল। অবিশ্যি বাঙালির একেবারেই কোনো ব্যবসাবোধ নেই—একটা কামড় খেয়ে ডান কাৎ ফিরে শুল অবনীশ।

কার যেন মোটর এসে পাশের বাড়ির দেউড়িতে ঘ্যাড়-ঘ্যাড় করছে ; মোটরটা কী ? ফোর্ড নিশ্চয়ই ; হয় তো পেট্রল ফুরিয়ে গেছে ; ঐ তো পেট্রল ভরছে—ভরছে না ?

মোটরটার আওয়াজ থেকে সেটাকে মনে-মনে অনুসরণ করল অবনীশ।

বেলা দুটোর সময় অফিস থেকে বেরুল সে।

একটা দিকে যাচ্ছিল—অফিস থেকে মিনিট তিনেকের পথ হেঁটে গেলে। যাচ্ছিল মোটরেই, খুব আস্তে-আস্তে চলছিল, এমন সময় রাখালের মোটরটা মুখোমুখি।

আন্তরিক আগ্রহে স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দিয়ে গদির থেকে উঠে দাঁড়াল সে ; মোটরটা ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল অবনীশের—একটা মহিষের গাড়ির চাকায় ঈষৎ টক্কর খেল।

চোখ গরম করে গাড়োয়ানের দিকে তাকাতে না তাকাতেই চোখ নরম হয়ে গেল অবনীশের। মোষটা হয় তো তার নিজেরই—রাখালকে দেখে সে

এমনই বেসামাল হয়ে পড়েছিল। গাড়োয়ানের দিকে হেসে তাকিয়ে তাকে বিদায় দিল অবনীশ—মহিষের গাড়িটার ওপর পাহাড়প্রমাণ চামড়ার দিকে একবার হাঁ করে তাকালে।

এই সবই এক-আধ মুহূর্তের ভেতর।

আসল হচ্ছে রাখাল; রাখালের দিকে বিদ্যুৎ ক্ষিপ্রতায় ফিরে তাকাল অবনীশ; তাকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবেই—হ্যাঁ যাবেই।

মোটর থেকে মুখ বাড়িয়ে ছোকরার (রাখালের বয়স সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ) পাঞ্জাবি চেপে ধরলে অবনীশ।

—'আচ্ছা চলো', অবনীশের নাক বরাবর রাখালও চলল। দু জনেই মোটর বাগিয়ে আস্তে-আস্তে কাছে গিয়ে থামল।

চেহারায় তাগদ রয়েছে—কিন্তু মনে তেমন কোনো ফূর্তি নেই।

সেও ব্যবসায়ী লোক; খুচ-খুচ খুচ-খুচ করে কিসের ব্যবসা করে সেই জানে; কাউকে বড় একটা বলতে চায় না। হয় তো সব কিছুর ব্যবসাই করে, হয় তো টাকার ব্যবসায়ই করে। কারো চেয়ে কম চালে থাকে না তো; জীবনে তার পড়তা ঢের আছে, অবনীশের সঙ্গে এমন বনে?

দিন তিনেক পরে একদিন সন্ধ্যার সময় অবনীশের বাসায় গিয়ে হাজির হল রাখাল।

শীত একেবারে কেটে গেছে। অবনীশ তসরের সুট পরে বেতের ইজিচেয়ার-টায় পা ছড়িয়ে বসে চুরুট টানছিল।

রাখাল আর-একটা ইজি চেয়ারে বসে পা ছড়িয়ে দিলে। সেও সুট পরেছে। শীত যে ফুরিয়ে গেছে মাঘ মাসেই এই তসর তাই প্রমাণ করে—ভাবছিল অবনীশ।

রাখালকে চুরুটের বাক্স ঠেলে দিলে অবনীশ। কিন্তু সে সিগারেটের কেস বের করে বসেছে।'

—'কোথায়, বাড়ি এমন থম থম করছে কেন?'

—'কেউ নেই?'

সিগারেট জ্বালিয়ে রাখাল বললে—'কোথায় গেল?'

—'যেমন যায়—বিকেল হলেই এরা উড়নচণ্ডী সাজে ; সন্ধ্যার সময় আমি অফিস করে ফিরে আসি—সন্ধ্যার ঢের এগুতেই এরা বেরিয়ে পড়ে ; কোনোদিন আমাকে বা একটু চোখ চেয়ে দেখে, কোনোদিন দেখেও না—, আমি যেন কেউ নই।'

—'এত দেরি করেই-বা অফিস থেকে আস কেন ? গোটা তিনেকের সময় ফিরতে পার না ? এরা কটার সময় ফিরবে ?'

—'এম্পায়ারে ছটার পারফরমেন্সে গিয়েছে—সেখান থেকে নিউ এম্পায়ারে নটায়।'

—'এম্পায়ারে কী আজ ?'

দুজনেই হাসল ; প্রাণ খুলে হাসি রাখালের সঙ্গেই হয়।

রাখাল বললে—'এম্পায়ারে ?'

—'নিগ্রো স্পিরিচুয়াল—শুনেছ কোনোদিন ?'

—'না, তুমি ?'

—'না।'

রাখাল বললে—'ওরা বারটা-একটা করে আসবে তাহলে ?'

—'তার আগে কী করে হয় ?'

অবনীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে

—'রোজ হয় এই রকম ?'

অবনীশ ঘাড় নেড়ে বললে—'হঁ্যা।'

—'বড্ড একা—'

অবনীশ গলা খাঁকরে বললে—'কর্পোরেশনের সেই টেণ্ডারটা পেলে ?'

—'না।'

—'আর ই-বি-রেলওয়ের ?'

—'পাগল, ও কি কখনো হয় ?'

—'না ?'

অবনীশ ডান হাতে চুরুটটা তুলে ডান ঘাড়টা নাচাতে-নাচাতে ঠোঁট মুখ কাঁচুমাচু করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলে—রাখালের জন্য সহানুভূতি বোধ করে দুঃখ পেয়ে—প্রায় মিনিট দুই।

তারপর, রাখালের গলার আওয়াজ শুনেই চুরুটটা মুখে তুললে। কিন্তু

ততক্ষণে চুরুট নিভে গেছে।

রাখাল বললে—'ব্যবসায়ের মানে কি জান ?'

অবনীশ জানে না কি ? তবুও কৌতূহলের সঙ্গে রাখালের মুখের দিকে তাকালে।

রাখাল বললে—'তুমি বলবে জোচ্চোরি।'

—'কক্ষনো না—ব্যবসাকে ডাউন করব আমি ? আমার ফার্মকে জোচ্চোর বলব ?'

রাখাল বললে—'ঠিক জোচ্চোরি নয়, কিন্তু বিদ্বেষ—হিংসা, এই দেখ না'—অবনীশের চুরুটটা নিভে গিয়েছিল, কিন্তু সেটাকে সে আপাতত জ্বালাচ্ছে না ; তাজ্জব মেনে রাখালের দিকে তাকাল সে।

রাখাল বললে—'এই দেখ, আমি তোমাকে বলছি। সিমেণ্টের ব্যবসা তো অনেকেই করে, সকলেই বলে আমার চেয়ে ভাল সিমেণ্ট সমস্ত এশিয়ার মার্কেটে নেই। বটে ? কিন্তু তবুও জেতে কারা বল তো ? ভাল সিমেণ্ট যারা চালাতে চায় ? ধুত ! ভাল কোনো জিনিশ কেউ আবার চালাতে চায় না কি ? একি জামাইষষ্ঠী ? চালাতে চাইলেও সে আত্মাক কখনো ব্যবসায়ে জেতে না। জেতে তারাই যারা ভাল-মন্দ পচা-তাজা সমস্ত জিনিশ টিকিয়ে রেখে নিজেদের জাহির করতে পারে। টাকা, টাকা, টাকার জোর আছে যাদের তাদের জিনিশও ক্যাপিটালের জোরে, প্রপাগাণ্ডার চোটে, বড় ফার্মের মার্কা মেরে, সমস্ত বাজার ছেয়ে বসবে। ব্যবসা হচ্ছে এই।'

অবনীশ চুরুটটা জ্বালিয়ে গম্ভীর মুখে বললে—'সিমেণ্টের ব্যবসা আমি কোনোদিন করিও নি, জানিও না।'

রাখাল বললে—'ব্যবসাই হচ্ছে এই সিমেণ্ট আর পাটকেল।'

অবনীশের চুরুটটা ভাল করে জ্বলে নি ; সে আবার জ্বালালে।

রাখাল বললে—'মানুষের ঘরে-ঘরে ভাল জিনিশ পৌঁছিয়ে দেব সে আইডিয়া নিয়ে ব্যবসা চলে না। আমি সিমেণ্টের ব্যবসা করছি, তুমি সিমেণ্টের ব্যবসা করছ, আরো সাতজন করছে। আমরা কে কাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারি এই নিয়ে হচ্ছে কথা। বুঝলে অবনীশ, বাজারে কে কাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি খাশা জিনিশের কেরামতিতে—আর নেহাতই গায়ের জোরে, এই নিয়ে হচ্ছে ব্যবসার জিত। গায়ের জোর আসে কোত্থেকে ?

টাকায়। যাদের ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেছে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা তাই এত শক্ত। তাহলে তুমি সিমেন্টের ব্যবসা করছ না ?'

—'না।'

অবনীশ দু কাঁধ নাচিয়ে চুরুটে একটা টান দিলে। বললে—'কোথাও স্ট্রাইক ফাইক বাধাবে নাকি ? কথাবার্তার ধাঁচ তো সেই রকম।'

—'স্ট্রাইক বাধাবার মত শক্তি আমাদের আছে ?'

—'শক্তি লাগে না কি আবার ?'

—'লাগে না ? সোজা কথা ?'

—'লেবার ইউনিয়নেও তোমার নাম নেই ?'

—'না।'

—'ব্যবসায়ীদের পক্ষে ও-সবের ভিতর মাথা না গলালেই ভাল।'

অবনীশের সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে (বাস্তবিক অবনীশের লেবার ইউনিয়ন-অশ্রদ্ধাকে রাখাল একটুও শ্রদ্ধা করে না) রাখাল বললে—'রোজ তো টোস্ট খাচ্ছ চায়ের সঙ্গে, কিন্তু কার পাউরুটি ?'

—'গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের।'

—'না-হয় অন্য দশ পাঁচটা হোটেলের : কিন্তু এগুলো কোনটা যে কোনটার চেয়ে খারাপ বা ভাল তা ঠিক কি পাও ?'

—'অত ভাববার সময় আছে না কি ? না অত তুলনা করবার সময় আছে ?'

—'তা হলে কেন খাও ? রুটিওয়ালা এসে দিয়ে যায়—তাই না ? এ রুটি চালাতে পারে আর অন্যদেরটা পারে না কেন ? তার পেছনে একটা বড় ফার্মের, তা সাহেবের হোক, মুসলমানের হোক, মাড়োয়াড়ির হোক, যারই হোক না কেন, একটা ফার্মের জোর আছে বলে ? না ? কিন্তু নানা রকম রুটি খেয়ে দেখ, হয় তো কোনো ওঁচা মুসলমানের দোকানের রুটিই ভাল লাগবে—কলকাতার, কিংবা ঢাকার বা বরিশালের। কিন্তু চালাবার জো নেই তার। সে নাজেহাল। যা বলছিলাম। দেখি তো একটা চুরুট।'

—'রুটির ব্যবসা করছ নাকি ?'

—'কে ? আমি ? না।'

—'কী করছ তাহলে ?'

রাখাল চুরুট জ্বালালে।

—'কী করছ আজকাল ?'

রাখাল সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে—'আবার আর-একটা জিনিশ তোমাকে দেখাচ্ছি—এও ঠিক ঐ-রকমই।'

অবনীশ বললে—'চা খাবে ?'

—'না।'

—'কেন, আবদুলকে বলি।'

—'বলো।'

চায়ের অর্ডার গেল।

রাখাল একটা ভারি নিঃশ্বাস ফেলে বললে—'আজ বাঙলা টাইপ রাইটার হয় না কেন ?'

অবনীশ চোখ কপালে তুলে বললে—'সে কী করে হয় ? বাঙলায় ?'

—'কেন হবে না ?'

—'গা-জোয়ারি করো কেন ?'

—'মোটেই গা-জোয়ারি না, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বাধা দিয়ে অবনীশ বললে—বাঙলা রাইটারের দরকারই বা কী ?'

—'খুব দরকার আছে।'

—'ও নিয়ে ব্যবসা চলে না অন্তত।'

—'প্রেস নিয়ে যদি চলে তো এ নিয়েও চলবে।'

—'গেঁজুরি।'

—'মোটেই না, দেখ না বিলেতে—'

—'বিলেত আবার—'

—'কথাটা শোনো, টেলিফোন চলল, রেকর্ড গ্রামোফোন চলল, সাইকেল চলল, ড্যাফোল্ড পার্কার, টর্চ কী না দেশে চলছে ? বাঙলা টাইপ রাইটার চলবে না ? এ জিনিশের একটা দস্তুর মত দরকার আছে তা তুমি বোঝ না হে অবনীশ ?'

অবনীশ একটু ভেবে বললে—'হ্যাঁ, তা চলবে না যে তা নয়; আমি অন্তত একটা কিনতাম। যা হাতের লেখা বাঙলার—বেঁচে যেতাম না রাখাল ?

অমনি অনেকেই কিনত—তা অবিশ্যি রেমিংটনের মত যদি হত।'

রাখাল বললে—'ঠিক তাই; আমারও মতলব ছিল তাই; কিন্তু একদিনেই কি রেমিংটনের মত হয়? আমি যখন প্রথম শুরু করি টাইপ রাইটার বানাতে—'

—'টাইপ রাইটার বানাচ্ছ নাকি!'

—'বছর তিনেক আগের কথা বলছি—বাংলা টাইপ রাইটার বানাব ঠিক করেছি। দু একটা হাঁচকা মেশিন বানানোও হয়ে গেছে এমন সময় খবর পেলাম তিন-লাখ টাকা নিয়ে নাকি কারা বাংলা টাইপরাইটারের ব্যবসায় নেমেছে—ঠিক রেমিংটনের মত কল বের করবে—'

—'বাপরে!'

রাখাল চুরুট টানতে লাগল।

অবনীশ বললে—'বটে? রেমিংটন! কই শুনি নি তো। কী করলে তারা? তাদের কল কোথায় গেল? কিনতে পাওয়া যায়?'

—'ছাই।'

—'বানায় নি?'

—'কী বানাবে? আমাকে চেপে রাখবার জন্য এত সব। আমাকে হাতই দিতে দিলে না; তিন বছর ধরে পাঁচ-পাঁচবার চেষ্টা করলাম—পাঁচবারই মিইয়ে দিলে। একবার আমাকে নিয়ে তো গেল তাদের ফার্ম দেখাতে। দেখলাম। অবিশ্যি তারাও চেষ্টা করছিল কল বানাতে, কিন্তু একটা চমৎকার জিনিশ ঘরে-ঘরে চলতি করে দেবার উদ্দেশ্য ওদের মোটেই ছিল না—ইচ্ছে বাংলা টাইপ রাইটার একচোট করে নিয়ে দো হাতি মেরে নেয়। লাভ-লোকসানের ধন্দ নিয়ে আর্ট ক্রিয়েশন চলে না। একটা নিখুঁত টাইপ-রাইটার আর্ট নয় কি? আমার মন ছিল সেই দিকে, হয়তো বিস্তর লোকশান দিতে হত, লোকশানের কথা আমি ভাবতে যাই নি। ভেবেছিলাম ক্রমে-ক্রমে ক্রমে-ক্রমে ওদেশী রেমিংটন পোর্টেবেলের মত বাংলা পোর্টেবেলের কদর সকলেই একদিন বুঝবে।'

—'ও-রকম করে কি ব্যবসা চলে?'

এর পর অবনীশের সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে কোনো কথা বলবার রুচি ছিল না রাখালের।

তবুও বললে—'বছর পাঁচেক আগে এক জন ইয়াঙ্কি আমার কাছে এসে দুঃখ

করছিল।'

—'ইয়াঙ্কি মানে ?'

—'আমেরিকান।'

—'তোমার কাছে গিয়েছিল দুঃখ করতে কী রকম ?'

—'হ্যাঁ, ব্যবসা করবে বলেছিল বেঙ্গলে।'

—'বাপরে। আমেরিকা ছেড়ে এইখানে ?'

—'ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধার দিয়ে অনেকখানি জায়গা অ্যাকোয়ার করবে ঠিক করেছিল।'

—'কিসের ব্যবসা ?'

—'তেলের।'

—'তেলের ?'

—'হ্যাঁ।'

—'পেট্রল বলো।'

—'নারকোল তেলের।'

—'নারকোলের তেল ?'

রাখাল বললে—'অবিশ্যি এক জন বিদেশী এসে আমাদের দেশী ব্যবসা কেড়ে নেবে এ আমাদের সহ্য হয় না। সে আমাদের খাঁটি তেল দিলেও, খুব শস্তাতে দিলেও সেটা সত্যিই বড় বিশ্রী লাগে, নিজেদের এমন হীন মনে হয়। কিন্তু ব্যবসাকে যদি একটা অ্যাবস্ট্রাকট জিনিশ বলে ধরো, বাস্তবিক বিজনেস একটা আইডিয়াল আর্টের মত একটা আইডিয়াল. এভাবে দেখতে গেলে, এই ভাবেই দেখা উচিত, সেই আমেরিকান বেচারির তিন লক্ষ টাকা সমস্ত লোকে মিলে যে নষ্ট করে দিলে সে জন্য দুঃখ হয় না!'

—'ইয়াঙ্কিটা গাধা।'

—'গাধা তো বটেই।'

—'মাদ্রাজে ফাঁদা উচিত দিল।'

—'তা হলে আরো গাধামি হত।'

—'মাদ্রাজেই তো নারকোলের গাছ।'

—'কিন্তু বাঙালির চেয়ে মাদ্রাজিরা ঢের ছুঁচো। আমার ষোল হাজার টাকার মরিচও একবার ঐ রকম করে নষ্ট হয়ে যায়।'

—'ষোল হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলে মরিচ?' হো-হো করে হেসে উঠে অবনীশ বললে।

রাখাল বললে—'তিন বার কিনেছিলাম; প্রথম দফায় দু লাখ টাকা নেট প্রফিট।'

অবনীশের চক্ষু স্থির হল। বললে—'মরিচ বেচে?'

—'শুকনো মরিচ।'

অবনীশের এক-এক সময় মনে হয় ব্যবসার সে কিছু জানে না—শুধু কলের মত এজেন্সিই করে যাচ্ছে; শুধু বিল কাটছে; নাম সই করছে শুধু। টাকা আসছে অবিশ্যি—টাকা আসছে ঢের। কিন্তু তবুও জীবনটা কি শুধু এই? রাখালের কাছে, ব্যবসা, সে বললে, একটা আর্ট। বাস্তবিক আর্টের মানে কি জানে অবনীশ? পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের স্টুডেন্ট কুন্তলা তার চেয়ে ঢের বেশি জানে; সে প্রায়ই বলে 'আর্ট' কিংবা 'আর্ট মাটি করলে'—এক-একটা গান শুনে, এক-একখানা বই পড়ে। গভীর অভিনিবেশের ভিতর ডুবে যায় মেয়েটি। নিশ্চয়ই খুব নিখাদ রস পায়—নিখাদ—অতল—কিন্তু ব্যবসা করতে গিয়ে এরকম বর্ণনাতীত পরম রস কোনোদিন পেল না তো সে। চুরুটটা জ্বালালে অবনীশ; ব্যবসা তার কাছে বিজনেশমাত্র। লেনদেন, হিশাবপত্র, অনেক খানি পরিশ্রম, ঢের ঝক্কি; কখনো-বা শুধু খোলা পাখার নীচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝিমুতে-ঝিমুতে বসে থাকা। তার ফার্ম না হলে তার চলে না বটে—কিন্তু তাতে পেট-ভাতের প্রশ্নটাই নাড়া দিয়ে ওঠে বেশি। কিন্তু কুন্তলার যেন ভাত-ডাল না হলেও চলে। চলে এমনই সব আর্ট, আর্ট ক্রিয়েশন, আর্ট কনসেপসনের নানা রকম রস।দ.য়। জীবনকে নানা দিক দিয়ে ভরে রেখেছে তারা। এ সব বোঝে না অবনীশ। যদিও সেও গ্র্যাজুয়েট।

কিন্তু তবুও জীবনে তার কোনো আর্ট নেই। রাখাল সেদিন বলেছিল ব্যবসাকে যদি একটা আবসট্র্যাকট জিনিশ বলে ধরো, ব্যবসা একটা আইডিয়াল, আর্টের মত একটা আইডিয়াল।

এ সব বোঝে না কিছু সে।

অনেক দিন হয় নভেল পড়া ছেড়ে দিয়েছে সে।

বই পড়াই এক রকম ছেড়ে দিয়েছে—মাঝে-মাঝে এডনার ওয়ালেসের দু-এক-

খানা চলে, বাস্তবিক, এডনার ওয়ালেসের শ দেড়েক বই তো প্রায় শেষ করেছে সে—এমন চমৎকার, আরো কিছু-কিছু এ ধরনের চমৎকার বই-এর নাম করতে পারে সে।

এই বইগুলো নিয়ে সময় তার বেশ কেটেছে।

কিন্তু কুন্তলা ঠাট্টা করে অবনীশের হাতে এই সব বই দেখলে।

কেন? বোঝে না অবনীশ।

কুন্তলা এসে প্রায়ই এক-একখানা নতুন বই অবনীশের হাতে তুলে দেয়। বলে, 'এবার প্রাইজ পেয়েছে, পড়ে দেখো।'

—'না।'

—'সে আবার কী?'

কুন্তলা এমন ঠোঁট কোঁচকায়! রাখালও বলতে পারে না এ-সবের মানে কী। অবনীশদের এজেন্সির কোনো লোকই জানে না।

কুন্তলাকে সে জিজ্ঞেস করে না।

বইগুলো দু-এক পাতা উল্টে দেখে অবনীশও বোঝে না কিছু। বাস্তবিক কিছু বোঝে না কেন?

সৌমেনও তো বোঝে।

এই কি আর্ট? এই বইগুলো? এই সব বই আর্ট নিয়ে জীবনটাকে খুব মস্ত বড় সাধনায় ভরে ফেলেছে না কি ওরা? অবনীশের চেয়ে কি তার ছেলে-মেয়ে এতই উঁচুতে চলে গেছে?

সকলের চেয়েই উঁচু ওরা? ওদের সাধনা, সাধ, কল্পনা বড়?

হোক তাই।

করুক ঠাট্টা। আজও হুইলারের স্টলের থেকে একটা বই এনেছে সে। পড়ে শেষ করেছে। এ বই যদি আর্ট হয় তা হলে আর্টের রস পেয়েছে সে। আর্টের মানে বুঝেছে সে তা হলে?

অবনীশ চুরুট জ্বালালে। মনে তৃপ্তি পাচ্ছে।

কিন্তু তবুও সে জানে এ আর্ট নয়—অন্তত কুন্তলা-সৌমেনের সাধের জিনিশ এ বই নয়; আগ্রহ করে এ বই কিছুতেই পড়ত না তারা। কুন্তলা ছিঁড়ে ফেলে দিত। —ইস!

মনের ভিতর কেমন উশখুশ করতে লাগল অবনীশের। দু মিনিটে মনের

সন্ধ্যার সময় আজও বাড়িতে কেউ নেই। বইখানা পড়ে সে আরাম পাচ্ছিল অবনীশ। আস্তে-আস্তে তাও নাই হয়ে গেছে।

অমলা তাকে এমন একা রেখে চলে যায় কেন? এই-ই বধূ ভালবাসে যেন। অবিশ্যি অবনীশের জীবনে অমলা যে একেবারে অপরিহার্য তা নয়: বাস্তবিক —দেখতে গেলে অমলার কাছ থেকে কতটুকুই-বা চায় অবনীশ? এই চায় যে সে বেঁচে থাকুক—অবনীশের ঘরে অবনীশের বধূ হয়ে বেঁচে থাকুক সে, এইটুকু মাত্র। এইটুকু ঠিক রয়েছে জানতে পারলে দিনমানের ভিতর স্ত্রীর সঙ্গে একবার না দেখা হলেও চলে যেন তার।

অমলা তার বধূর কর্তব্য করে গেলেই শুধু হয় যেন: স্বামীকে সে না ভালবাসলেও হয় যেন; বাস্তবিক স্বামীকে ভালবাসে কি সে?

নিজেও কি অমলাকে ভালবাসে অবনীশ?

বেশ, বেশ, কেউ কাউকে না ভালবাসলেও চলে: ভালবাসাবাসির বয়স শেষ হয়ে গিয়েছে—দু জনেরই। এখন অবনীশ শুধু চায় যে অমলা অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে ফ্যাকরা না বাধিয়ে বসে—কেলেঙ্কারি না করে। এই-ই কি শুধু চায়? আরও চায়। চায়, অবনীশের অসাক্ষাতে অন্য পুরুষের সঙ্গে অমলা একটু-আধটু উচ্ছ্বাস করলেও করুক—কারো কিছু বয়ে যায় না তাতে; কিন্তু অবনীশের চোখের সামনে তাকে উপেক্ষা করে অন্য কোনো পুরুষের জন্য একটুও আগ্রহ দেখাতে যায় না অমলা। সেটা অবনীশ সহ্য করতে পারবে না—বধূকে সে ভালবাসে বলে নয়, কিন্তু অন্যের সামনে স্বামীর প্রতি তার ভালবাসার নিদর্শন অমলা ক্ষুন্ন করছে বলে। মনে-মনে অবনীশকে যতই অপ্রেম করুক না কেন বধূ, পরের সামনে একচুল ত্রুটিও বড় অপমানজনক।

এমনি করে প্রেম বিসর্জন দিয়ে এরা দু জনে চলেছে—কিন্তু কেউ জানে না। অবনীশ তাই তৃপ্ত।

ব্যাপারটা মোটামুটি এই।

সিগারেট কেস বের করলে অবনীশ।

অমলা আজও হয় তো বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছে, কিংবা থিয়েটারে গিয়েছে, কিংবা কোথাও বেড়াতে গিয়েছে, সিগারেটটা না জ্বালিয়ে দাঁতের ফাঁকের ভিতর অনেক ক্ষণ ধরে সেটাকে চেপে রাখল অবনীশ, ঘরদোরের ভিতর চারদিকে কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই, মনটা তার আজ কেমন গম্ভীর বিষন্ন হয়ে উঠেছে, এমনি হৃদয়ের ভিতরই ভালবাসার জন্ম হয়। হয় তো ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু তবুও মনের এই স্তব্ধতা, বিষাদ নিয়ে কোনো এক জনকে এমন গভীরভাবে ভালবাসা যায়! মনে হচ্ছিল অবনীশের।

কাকে ভালবাসবে সে?

লক্ষ বারের মত আজও একবার মনের অতলে খতিয়ে দেখল সে যে জীবনে তার কোনো ভালবাসার পাত্রী নেই, কোনোদিনই হয় তো ছিল না। কিন্তু এমনি সময় অমলা এসেও যদি পাশে দাঁড়াত, একা, এই অন্ধকারে, এমন নিস্তব্ধতায়, যে-বেনারসি শাড়ি পরে সে বেরিয়ে গেছে সেই শাড়ির গন্ধে এই বাতাসটাকে ভরে ফেলে, তা হলে বধূকে এমন নিবিড়ভাবে ভালবাসাতে পারত, অবনীশ তাকে বুকের ভিতর নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে এমন নিঃসঙ্কোচে বলতে পারত তোমার চেয়ে পৃথিবীতে আর কাউকেই ভালবাসি না আমি অমল—কোনোদিনও বাসিনি!

তিন-চার দিন বিশেষ কারো সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎ হল না অবনীশের। তার পর এক দিন দুপুরবেলা রাখালেরই মোটরটা বোধ হয়—অবনীশের মোটরটাকে কেটে যাচ্ছে।

বাপরে রাখালের কী ব্যস্ততা—'এই।'

অবনীশের ডাক রাখালের কানে পৌঁছল না।

গলা খাঁকরে অবনীশ ডাক দিল—'এই—এই—এইয়ো রাখাল!'

রাখাল হাত তুলে হাসি মুখে বললে—'বড্ড ব্যস্ত; সন্ধ্যার সময় যাব; সন্ধ্যার সময় বাড়ি আছ না কি?'

আজও তসরের সুট পরে পা ছড়িয়ে চুরুট ফুঁকছে অবনীশ। আজও রাখাল এল সেই পামবিচের সুট পরে।

সব দিকেই এমন একঘেয়েমি, এমন বিমর্ষতা, শূন্যতা। শুধু সারা দুপুর

রাখাল কী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ঘুরছে জিজ্ঞেস করতে গেল না অবনীশ। মনের ভেতর তার পরের ব্যাপার নিয়ে বিশেষ কোনো কৌতূহল নেই আজ আর। নিজের অন্তরের ভিতরে ঢুকে আজ বিকেলেও যত ঢুই-ঢুই-ঢুই-ঢুই করে মাথা খুড়ে মরছে সে কিসের জন্য, না জানি কিসের জন্য এই বাতাস, বসন্তের সন্ধ্যা, নিস্তব্ধতা, অন্ধকার, মানুষকে ডেস্কে বসে বাতি জ্বালিয়ে স্বাধীন সহজভাবে কাজ করতে দেয় না, পড়তে দেয় না, কিছু না। অমলা আজও নেই। থাকলেও তাকে দিয়ে কিছু হত না যেনও—কোনো সাহায্য পাওয়া যেত না একেবারেই যেন। তাকে দিয়ে কী আর হত।

গুমরে মন ভরে উঠছে।

আবদুল দুজনের জন্যই ঢের রুটি-মাখন-কাটলেট-মাংস-কলা-আম-কেক-চা নিয়ে এসেছে।

অবনীশই আগে শুরু করল—রাখালও ছুরি কাঁটা ধরল।

অবনীশ বললে—'জানলে রাখাল, বুঝি না কিছু। কেন যে এমন হয়?'

—'কী হয়?'

—'বলছি তোমাকে। উনিশ শ তিন সালে বি-এ পাশ করলাম। সেই থেকে আজ অব্দি ব্যবসা করছি। ব্যবসাতে যথেষ্ট উন্নতি হয় নি খুব? হয়েছে তো হয়েছে। ধাপে-ধাপে উঠে গেছি, উঠে গেছি, উঠে গেছি; এই ট্রেড ডিপ্রেশনের দিনে একটু থমকে গেছি বটে। কিন্তু এ সবে আমার ব্যবসায় কোনো লোকের ক্ষতিও হয় না। দেদার টাকা রোজগার হয়ে গেছে। এখন ছেড়ে দিলেও পারি।'

রাখাল বললে—'ছাড়বে কেন?'

—'না। ছাড়ব না। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই—কেমন ভাল লাগে না যেন।'

—'সত্যি?'

—'কেন ভাল লাগে না বলো তো?'

—'কী ভাল লাগে না?'

অবনীশ সরাসরি কোনো জবাব দিলে না।

সে ভাবছিল।

খানিকক্ষণ পরে বললে, 'আগে এ-রকম ছিল না। অফিসে যেতাম, ফিরে আসতাম, ফুরিয়ে যেত। টাকা ব্যাঙ্কে জমত, পরিবারের রেস্পেক্টিবিলিটি

বজায় থাকত, বাস্ আর চাই কী ?'

রাখাল বললে—'আবার কী চাই ?'

অবনীশ বললে—'তোমার এখনো তাই মনে হয় ? আমার হত। কিন্তু এতদিন ধরে—'

একটু থামলে অবনীশ, তার পর বললে—'দেখো, যতদূর সাধ্য সবই তো করেছি। গরিবের ঘরে জন্মে পরিশ্রম ও চরিত্রের জোরে আজ আমি নানা রকম ফার্মের ফার্মাসির জিনিশের এজেন্ট—হয় তো বেশ বড়ই। কী বলো ? প্রায় দেড়-দু লাখ টাকা ব্যাঙ্কে আছে ; দু-চার বার বিলেত ঘুরে এলাম। একটা পজিশন হয়েছে। কোনো বদ খেয়াল নেই। ছেলেমেয়েদের ভাল এডুকেশন দিচ্ছি ; ওরাও কেউ বিগড়ে যায় নি। সৎ লোকের সঙ্গে মিশি, ওরাও মেশে। সাধুপ্রসঙ্গ করি—ওরাও তাতে যোগ দেয়। সমাজের ভিতর এ পরিবারের আদর রয়েছে ; একটা মোটর গাড়ি আছে, ফোর্ড, সেটাকে বদলে—'

—'হুইপেট কিনো।'

—'তুমি এজেন্ট না কি—হুইপেটের ?'

—'না, তবে সুবিধে করে দিতে পারি।'

—'যা বলছিলাম। ফোর্ডটা পাল্টে একটা অস্টিন কিনব ভাবছি ; মানে অবস্থা আরো ভাল হচ্ছে। বালিগঞ্জে বাড়ি করলাম। শরীর বেশ সুস্থ। ক্লাবে যাই। ব্রিজ খেলায় প্রায়ই রাবার করি। প্রায়ই ব্রিজ খেলি। চুরুট খেয়ে তৃপ্তি পাই। অনেক চুরুট খাই। কিন্তু তবুও এ কয় দিন ধরে কেমন একটা—'

আবদুল এসে বললে—'আর কাটলেট দেব ? গরম ভাজা হয়েছে।'

অবনীশ বললে—'নিয়ে এসো।'

অবনীশ বললে—'কী হল আমার বলো তো রাখাল।'

—'অমলা কী বলে ?'

—'কী বলে তা তো দেখছই, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কত খানি সে বাড়ি থাকে ?'

—'আজও নেই ?'

—'কেন জিজ্ঞেস করছ মিছে ?'

—'এস্পায়ারে ?'

—'কোন ভ্যাম্পায়ারে কে জানে।'

রাখাল অনেক দিন থেকেই এদের দু জনকে আন্দাজ করে আসছিল। এদের সম্বন্ধের মধ্যে যে রাখাঢাকা চমৎকার বিচ্ছিন্নতা আছে তা সে বুঝেছে। অবশ্যি কোন সম্বন্ধের ভিতরই-বা বিচ্ছিন্নতা নেই? ভালবাসা কোথায় আছে জানে না রাখাল। থাকলে ক-দিনই-বা তা টেঁকে? একটা জোড়াতালি দিয়ে চালাতে হয়। নিজেও তাই সে চালাচ্ছে। রাতদিন দিনরাত তেমনি করেই চালাচ্ছে সে। কিন্তু তবুও স্ত্রী তার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু অবনীশ আর অমলা এমন ভাবে চালিয়েছে যে এদের সম্পর্কের ভিতর কোথাও কোনো চিড় কারো চোখে কোনোদিন ফুটতে পারে নি।

—'এ কদিন ধরে?'

—'হ্যাঁ।'

—'আগে ছিল না।'

—'না।'

—'ও কেটে যাবে'

—'সত্যি?'

—'তা না তো কী? এ রকম গজকন্দা চেহারার মানুষের মনের বিমর্ষতা বেশি দিন টেঁকে না।'

অবনীশ ফ্যা-ফ্যা করে হেসে উঠল।

রাখাল বললে—'এদের মনের কথা আহ্লাদি পুতুলের দুঃখ-শোকের মত—আহ্লাদি পুতুল দেখেছ?'

অবনীশ ফুঃ-ফুঃ করে হাসতে-হাসতে বললে—'দেখেছি। বাস্তবিক, আমার মনে হয় গোমড়ামুখো হয়ে থাকব কেন? এ রকম পজিশন, টাকাকড়িও যদি না থাকত, শুধু যদি এই জানতাম যে সারাজীবন ভগবানে বিশ্বাস রেখে, সৎপথে চলে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে এসেছি তা হলেও, ব্যস, আমার মুখের হাসিটি কেউ কাড়তে পারত না—'

কুড়ি-পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনের অপ্রেমটাকে বেশ কৌশলের সঙ্গে ঢেকে দিয়েছে—অমলা। সংযমও যথেষ্ট দেখিয়েছে অবনীশের বধূ। তার নামে

কোনো কলঙ্কের কথা নেই তো—কোনো ইশারা অব্দি নেই। আর অবনীশটা !

এই কোলাব্যাঙ আবার কী কলঙ্ক করবে ?

তত দূর কল্পনা আছে তার ? বুদ্ধি আছে ? শক্তি আছে ? সাহসই-বা কোথায় আছে ?

সংযম ও সহিষ্ণুতার কথা অবনীশের সম্বন্ধে তাই একেবারেই ওঠে না ; অন্তরাত্মার গভীর বেদনা যে কী এ লোকটি জন্মে-জন্মেও তা বুঝবে না। অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে ছুরি কাঁটা ছেড়ে দিল রাখাল। খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। রুমালে মুখ মুছে কী করবে অতঃপর ? অবনীশের সিগারেটের টিনের থেকে একটা সিগারেট টেনে, জ্বালিয়ে, ফুঁকতে-ফুঁকতে সে বিদায় হল। খুব অভদ্রতা হল বটে—কিন্তু তবুও এ লোকটির জন্য কোনো সান্ত্বনা বা কৃতজ্ঞতার কথা মুখ ফুটে বেরুতে চায় না যে !

রাস্তায় নেমে রাখাল ভাবল—এর পর থেকে অমলাকে অবসর মত একটু-আধটু দেখবে সে—না-হলে মৃত্যু অব্দি এমন একাদশী করে মরবে মেয়েটা ?

কথা শুধু—কথা, কথা, কথা, কথা, কথা

ভবশঙ্কর একটা মস্ত বড় বাঙালি লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান কিন্তু প্রত্যেক মিটিঙেই সেক্রেটারি তাকে প্যাঁদায়।

প্যাঁদাবে। বিজনেসের কী জানে সে?

সেক্রেটারি একটা ছোকরা—বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর হবে। কোনোদিন বিলেত যায় নি, কোনো ডিগ্রি নেই। কিন্তু তবুও সবাই তাকে এমন সমীহ করে চলে। আঠার বছর বয়স থেকে সে নাকি ব্যবসা করছে; এমনই চাঁই হয়ে উঠেছে এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সে।

ভবশঙ্কর ভাবছিল এ-রকম সেক্রেটারির তাঁবেদারিতে চেয়ারম্যান থেকে কী হবে? প্রত্যেক মিটিঙেই তার অপমানের আর শেষ থাকে না; সে রিজাইন দেবে ঠিক করেছিল। তিন-চার বছর ধরে সে রেজিগনেশন লেটার পকেটে করে মিটিঙে যায় কিন্তু সেক্রেটারি যখন তার নাক-কান কেটে অপমানের চূড়ান্তও করে তখনও চিঠিখানা সে বের করে না, কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে থাকে, গলা খাঁকরে নিয়ে এই বোধ করে যে তবুও সে-ই তো চেয়ারম্যান। সেই পরম প্রতিষ্ঠার চেয়ারেই বসে রয়েছে তো সে. তাকে রিজাইন দিতে ডিরেক্টর বোর্ডের কেউ কোনোদিন তো ইশারাও করে না। দেশের কাছে এত বড় একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান সে—মৃত্যু অব্দি তাই সে থাকুক। এ সার্থকতার [লোভ] কিছুতেই সে কাটিয়ে উঠতে পারে না। সেক্রেটারির হুমকি হজম করে যায় ভবশঙ্কর।

কিন্তু ভবশঙ্কর যে ব্যবসা না জানে তা নয়—অন্তত তার সমস্ত প্রাণমন এই-ই

বুঝতে ভালবাসে যে ডাক্তারিতে যেমন তার দক্ষতা ছিল, ব্যবসায়ও ঠিক তেমনি মাথা আছে।

গঙ্গাধর মিত্তির, নর্টনের আমলের ব্যারিস্টার, বছর দশ-পনের হল হাইকোর্ট বন্ধ করে ব্যবসা করছে—ভবশঙ্কর,বাবুর দেউড়িতে এসে মোটর থামাল। এই গরমে তসরের সুট পরে বেরিয়েছে মিত্তির। স্টিক ঝুলিয়ে সোজা তেতলায় চলে গেল।

ভবশঙ্কর নাম সাইন করছিল—চোখ বুজে নয়—প্রত্যেকটি চিঠিপত্র, দলিলের প্রতিটি শব্দ, চোখের ফরশেপ দিয়ে বিঁধে-বিঁধে। এ খুব গভীর অভিনিবেশের কথা, মিত্তির তাকিয়ে দেখে একটু হাসল।

মিত্তির এসেছে—তাকে খাতির করে বসালে ভবশঙ্কর।

কথা, সেই পুরোন কথা শুরু হল। মিত্তিরের সঙ্গে ভবশঙ্করের জমে বেশ, একে তো মিত্তির সেই নর্টনের আমলের ব্যারিস্টার, নিজে যেমন ভবশঙ্কর মহেন্দ্র সরকারের সঙ্গেও ডাক্তারি করেছে। এর ওপর ভবশঙ্করের মত মিত্তিরও দু-তিন লাখ জমিয়ে রেখেছে প্র্যাকটিস করে। দু জনেই গরিবের ছেলে ছিল—দু জনেই বড়লোকের বাপ হয়েছে। শেষ বয়সে দু জনেই ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। এত সব তো হল কিন্তু আসল হচ্ছে মিত্তিরের মতন এমন লোক আর নেই। শুধু ব্যবসার দুঃখ-শোকই নয়, শুধু ডাক্তারির দুঃখ-শোকই নয়—ভবশঙ্করের পরিবারের, ব্যক্তিগত জীবনের, যে-কোনো সুখ-দুঃখের কথা এমন নিঃসঙ্কোচে মিত্তিরকে বলতে পারা যায়, সে এমন হাসিমুখে গ্রহণ করে, এমন সহৃদয়ভাবে সান্ত্বনা দেয়, যে মনে হয় পৃথিবীতে আর-কোনো বেদনা নেই যেন!

অথচ সব এমন গোপন রাখতে পারে।

কতকগুলো কপচানো কথা আবার হচ্ছে।

—'ডাক্তারিতে কেমন করে রাইজ করলাম জানো মিত্তির?'

মিত্তির অনেকবার এ কথা শুনেছে তবুও আর-একবার শুনবার জন্য মুখ তার আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল।

ভবশঙ্কর বললে—'বিলেত গেলাম না, কিছু না, এখানেও এম-ডি ডিগ্রি অবদি নিলাম না। ও-সব শুধু ফোঁপরদালালিতে কী হবে? এম-এ-এম-বি-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট—এই নিয়েই—'

ভবশঙ্কর কাশলে।

মিত্তির বললে—'আমিও তো শুধু ডিনার খেয়ে ব্যারিস্টার'।

ভবশঙ্করের মানে একটু আঘাত লাগল, বললে—'না, না। এটা ঠিক যে তোমাদের সাবেকি ব্যারিস্টারি বিদ্যার চেয়ে সেকালের এম-এ-এম-বি-তে কাঠখড় পোড়াতেই হত ঢের!'

মিত্তির স্বীকার করলে, বললে—'তা তো বটেই, তা তো ঠিকই—তাছাড়া তুমি নিজেও স্টাডি করেছ কত, শুনেছি আয়ুর্বেদও পড়ো, নাকি বেদও পড়েছ। চর্মচক্ষেও কোনোদিন দেখলাম না।'

—'বেদ দেখ নি?'

—'না।'

—'কী যে বলে!'

—'কিন্তু কথা হচ্ছে যে মেডিসিনের প্র্যাকটিসেও এম-ডি, এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি-তে যেমন কিছু এগোয় না ব্যারিস্টারিতেও তেমনি ডি-এল, সি-সি-এলে, কুলোয় না কিছু—'

ভবশঙ্কর ঘাড় নেড়ে বললে—'না:'

—'আসল হচ্ছে···মাদার উইট-এর বাংলা কী বলো তো?'

—'কিসের?'

—'মাদার উইটের—'

ঈষৎ অভিনিবিষ্ট হয়ে বললে—'মাদার উইটের?'

—'হাঁা; তোমার তো ঢের দেশী ভাষা জানা আছে। বেদ-টেদও তো পড়েছ।'

ভবশঙ্কর ঘাড় নোয়াল: মাথা চুলকোল, মিনিট পাঁচেক পরে বললে—'ও বিলিতি বুকনি—ওর কোনো বাংলা নেই মিত্তির।'

—'আমিও তাই ভেবেছিলাম—"কাণ্ডজ্ঞান", "বোধ", যাই বলো আর তাই বলো মাদার উইটের মত জোর ও-সব শব্দের ভিতর নেই।'

—'এক হিশেবে; অন্য হিশেবে আবার ও-সব শব্দই মাদার উইটকে মাদার কাটা দিয়ে প্যাঁদাবে।'

এদের দু জনের তফাৎটা শুধু এইখানে। দেশী, দেশজ জিনিশের ওপর ভবশঙ্করের ভয়ানক টান; মিত্তির মনে-মনে এই-ই হৃদয়ঙ্গম করে।

ভবশঙ্কর বললে,—'ছোট একখানা আটচালা ছিল যখন শুরু করলাম।'

—'মফস্বলে প্র্যাকটিস করতে বুঝি?'

—'ফরিদপুরে।'

—'আমারও আলিপুরে প্রথম শুরু।'

—'আলিপুর আর ফরিদপুর? আলিপুর তো একটা জায়গার মত জায়গা।'

—'আ—হা ভবশঙ্কর! তখন শ্যামবাজারের থেকে ঘোড়ার ট্রামে করে নামতাম গিয়ে তোমার—'

—'তবুও তো ট্রাম। আমি কত কাদামাঠ আদার-পাঁদাড় ভেঙে প্র্যাকটিস করেছি তা জানো তুমি?'

সবই জানে সে।

মিত্তির সে-সব ঢের শুনেছে; আরো একবার ভবশঙ্করের জীবনের গোড়া-পত্তনের দুঃসহ দুঃখ ও সংগ্রামের কথাগুলি শুনছে; বাস্তবিকই নিজের জীবনে এত যুদ্ধ করে নি সে: কিন্তু তবুও বিদেশী বড়-বড় লোকদের কাছে ভবশঙ্করের এই দেশী দুঃখকষ্ট এমন চিটে গুড়ের মত মনে হয়। এই ভবশঙ্কর এত টাকা জমিয়েও আজও মোটর করল না—ঘোড়ার গাড়িতেই সে তৃপ্ত, আজীবন গলাবন্ধ গরদের কোট পরেই কাটাল সে, সমস্তটা জীবন কলকাতা শহরের দেশী পাড়ায়ই থেকে গেল। এ সবের জন্য অবিশ্যি ভবশঙ্কর, মিত্তিরের কাছে, কম আদরের জিনিশ নয়। কিন্তু তবুও এ মানুষটির সঙ্গে গলায়-গলায় খাতির জমাতে গিয়ে মিত্তিরের রসপ্রবণ প্রাণ মাঝে-মাঝে কোথায় কেমন যেন একটু হুঁচোট খেয়ে ব্যথা পায়।

ভবশঙ্কর বললে—'কিন্তু চেষ্টাই সব নয়—কপাল বলেও একটা জিনিশ আছে, মিত্তির। এই দেখো, আমার ছেলে এখান থেকে এম-ডি ডিগ্রি নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করল। কত ব্যাক করলাম, কত কী, কিন্তু কিছু না। তার পর দিলাম বিলেত পাঠিয়ে। দু-চারটে ডিগ্রি এনেছে, হার্লি স্ট্রিটের ডাক্তাররা অবদি তারিফ করেছে। কিন্তু কই, সপ্তাহান্তে একটি-দুটি কল টিক-টিক করে কি না সন্দেহ, হয় তো পনের দিন হা করে বসে আছে।'

মিত্তির বলল—'ক-বছর হল প্র্যাকটিস করছে?'

—'এই তো দশ বছর।'

মিত্তির একটা চুরুট বের করে বললে—'ব্যবসাতেও যেমনি, ডাক্তারিতেও

তাই, ব্যারিস্টারিতেও তাই। মেরিটের ওপর বিশেষ কিছু নির্ভর করে না, ভবশঙ্কর। আমি যখন ব্যারিস্টারি শুরু করলাম এটা ঠিক সত্য জেনে নিলাম যে আমি কারো চেয়ে খাটো নই। বাস্তবিক দু-একজন একসেপশনাল লোক ছাড়া আর-সবাই সমান। সবাই যখন সমান তখন এগুতে হলে এদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

—'ঘাড় ধাক্কা কী রকম?'

—'তুমি নিজের জীবনেও যথেষ্ট দিয়েছ।'

—'কাদের?'

—'অন্য ডাক্তারদের।'

উত্তেজিত হয়ে ভবশঙ্কর বললে—'অন্যায়ভাবে কোনোদিনও চলি নি।'

—'চলেছ, কিন্তু বোঝো নি।'

বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভবশঙ্কর মিত্তিরের দিকে তাকাল।

মিত্তির বললে—'বছরের পর বছর প্র্যাকটিস যতই জমতে লাগল ততই বুঝতে পারলাম যে স্তূপীকৃত উকিলের শবের উপর দিয়ে চলেছি; এদের আমিই মেরেছি, স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায়; কিন্তু তবুও মারতে হয়েছে; নিজের জন্য সফলতা পেতে হলে অপরকে না মেরে উপায় নেই।'

ভবশঙ্কর বললে—'ফেরেব্বাজ উকিলদের ধর্ম তো আর আমাদের নয়।'

মিত্তির ঈষৎ হেসে বললে—'হাকিমদের ধর্মই শোনো, লোকে তো তাদের ধর্মাবতার বলে, কী রকম করে তারা তৈরি হয়, শোনো—'

এ ধরনের প্রসঙ্গ শুনবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না ভবশঙ্করের। অন্যায্যতার ওপর খানিকটা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার সম্পর্কে কিছু-কিছু তারও তো মনে হয়েছে। কিন্তু সে জিনিশটাকে এমন উদ্ঘাটন করা কেন? ঘাঁটিয়ে-ঘাঁটিয়ে শোনানো কেন তবে? লোকসমাজে, এমন কি মিত্তিরের কাছেও, নিজের নিছক বৈঠকখানায়ও, নিজেকে একজন ধর্মন্যায়ের চাঁই বলেই তো জানে ভবশঙ্কর! অন্তত অন্যরা তা সম্পূর্ণরূপেই জানুক এই-ই বুঝতে ভালবাসে ভবশঙ্কর।

মিত্তির শুরু করলে—'আমার সেজো ছেলেকে তো হাকিম করেছিলাম—'

—'হাকিম করেছিলে?'

—'মুন্সিগঞ্জে পোস্টেড্; মুন্সেফ—'

—'ওঃ'

—সেকেণ্ড ক্লাস এম-এ ; সেকেণ্ড ক্লাস বি-এল। কত ফার্স্ট ক্লাস বি-এল, ফার্স্ট ক্লাস এম-এদের উত্তরে সে পেলে। হয় বিধাতা মারলেন, না-হয় আমার ছেলে মারল, না-হয় আমি মারলাম। কিন্তু ওদের মরতে হল যে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমি তোমাকে হলপ করে বলতে পারি ভবশঙ্কর, এই যে-ফার্স্ট ক্লাস গ্র্যাজুয়েটগুলো মুনসেফি পেলে না, বুড়ো বয়স অবদি কোনো একটা দেশী স্কুলের হেডমাস্টারিতে ঘষড়াবে আর আমার ছেলে হবে তখন ডিস্ট্রিক্ট জজ—ঘাড়ধাক্কা আর কাকে বলে ?'

ভবশঙ্কর বললে—'কথাবার্তা বড় খারাপ হচ্ছে মিত্তির—'

মিত্তির চুরুট জ্বালিয়ে বললে—'ধড়িবাজ উকিল-মুন্সেফদের ছেড়ে ব্যবসার কথা বলি—অল বেঙ্গল সু ফ্যাক্টরির তুমি চেয়ারম্যান ছিলে, না ?

ভবশঙ্কর অত্যন্ত অপ্রীত হয়ে বললে—'ও কথা আর তোলো কেন, ধরে-বেঁধে আমাকে চেয়ারম্যান করলে—আমি কি কিছু জানতাম ?'

—'না, তোমার কোনো দোষ নেই ভবশঙ্কর। একটা শেয়ার অব্দি তোমাকে দিয়ে না কিনিয়ে ও-রকম একটা নামজাদা কোম্পানির চেয়ারম্যানের জন্য তোমাকে বেছে নিলে সে লোভ তুমি সামলাবে কী করে ?'

চুরুটে একটা টান দিয়ে মিত্তির বললে—'কিন্তু মানুষের জীবনে কী গুখ্‌খুরি, দেখো ! তুমি চেয়ারম্যান হবার তিন মাস পরেই কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেল।'

ভবশঙ্কর দাঁতমুখ খিঁচে বললে—'ও রাস্কেলদের কথা আর বলো না—'

মিত্তির বললে—'জীবনটা এই রকমই, কে কাকে ঠকাবে—কে কাকে ঠকাবে।'

ভবশঙ্কর বললে—'সু ফ্যাক্টারি আমাকে ঠকাতে পারে নি ; আমি আগেই রিজাইন দিয়েছিলাম।'

—'কিন্তু তবুও কত লোককে ঠকিয়েছে !'

—'তা ঠকিয়েছে।'

—অথচ সেই সু ফ্যাক্টরির লোকরাই আবার আইন এড়িয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে।'

—'বসেছে, শুনেছি।'

—'জুতোরই দোকান।'

—'শুনলাম।'

—'এরা প্রত্যেকেই কী রকম বড়-বড় বাড়ি খিঁচে ফেলেছে।'

'—কোথায়?'

—'পার্ক সার্কাসে।'

ভবশঙ্কর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে, সেও পারত, তাকেও অনেক টাকা বলানো হয়েছিল! কিন্তু তাই বলে নিজেকে মিথ্যাচারী দেউলিয়ার দলে ফেলে দেওয়া? আজীবন যে ন্যায়ধর্মের দণ্ড ধরে এসেছে সে তা হলে সেটা তো ভাগাড়ে গোহাড়ে লুটোত; লোকে চোখ পাকিয়ে দেখত। অনেক কথা ভেবে সরে এসেছে সে।

বাস্তবিক এই ধর্মন্যায়ের দণ্ড এমন গুরুভারের। তা ছাড়া, একজন ধার্মিকের দিকে এই পৃথিবীর লোকগুলো এমন প্যাঁট-প্যাঁট করে সর্বদা যদি না তাকিয়ে থাকত তা হলে মাঝে-মাঝে এই সাধুতার বোঝা গর্দানের থেকে নামিয়ে— আঃ—এমন আরাম-আয়েস করে নেওয়া যেত। কিন্তু বাস্তবিক ভবশঙ্কর এতদূর খারাপ লোক নয়—।

পৃথিবীতে যদি সে একা থাকত—তার অন্যায় অন্যায়ভাবে ধরে ফেলবার জন্য আর-একটি লোকও যদি না থাকত তা হলেও, এমনই ধর্মের মুদ্রাদোষ তার, যে বিশেষ কোনো খারাপ কাজ সে করতে পারবে না। মোটামুটি, মিত্তির ঘুঘু—ভবশঙ্কর ঘুঘু নয়: মাঝে-মাঝে ঘুঘু হবার ইচ্ছাটা তার মনের অতি নিভৃত প্রকোষ্ঠে, তার স্ত্রীরও অগোচরে, চুপেচুপে চাড়া দিয়ে ওঠে শুধু। কিন্তু ভবশঙ্কর জানে না যে ও-পাখির জাত আলাদা—এ জন্মে সে আর তা হতে পারবে না।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানির সেক্রেটারির কাছে প্যাঁদানিও খায় এই নিরেট ঘুঘুত্বলেশহীনতার দরুন।

কিন্তু মিত্তির যে ঘুঘু অথচ তবুও ভবশঙ্করের এত অনুগত, ভবশঙ্কর এই জন্যও মিত্তিরকে অত্যন্ত স্নেহ করে, ভালবাসে। ধর্মধ্বজ অনেক বন্ধু আছে বটে ভবশঙ্করের; জীবনের অনেকটা সময় তাদের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে কাটায় বটে সে,

কিন্তু তবুও তার পর এক-এক সময় এই সব ধর্মনীতিবানদের দিকে তাকিয়ে মনে হয় চৈতনের দল যত সব! এদের মিটমিটে মুখের দিকে তাকিয়ে এমন বিরক্তি ধরে যায়। এত হাসি পায়—জীবনের অর্থ এরা এত কম জানে বলে এমন অবজ্ঞা করতে ইচ্ছা করে। মিত্তিরকে তখন ঢের মূল্যবান মনে হয়। কাজেই নানা রকম ঘাটতি-পড়তির ভিতর দিয়েই চল্লিশ বছর ধরে মিত্তিরের সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্ব চলেছে। চরম বন্ধুত্ব মিত্তিরের সঙ্গেই; তার কাছেই ভবশঙ্কর সবটুকু কথা বলে।

সেই মিত্তির যখন দু দিনের কলেরায় মারা গেল ভবশঙ্কর চোখে অন্ধকার দেখল। এই পৃথিবীতে কী নিয়ে থাকবে সে—কী নিয়ে থাকবে সে!

অ্যালবার্ট হলে একটা মস্ত বড় পোলিটিক্যাল মিটিং ছিল। ভবশঙ্কর এসেছে বলে জনসভা বিহ্বল হয়ে উঠল না। ভাবতে গিয়ে নিরাশ হয়ে কী হবে? দু-তিন খানা চেয়ার খালি ছিল। তারই একটায় বসল সে।

জননায়ক সে হতে পারে নি—নাই-বা পারল। কিন্তু জনের হিত তো সে চায়। আজ একটু খুক-খুক কাশি হয়েছিল—কাল সারারাত ঘুম হয় নি। এখানে না এলেও তো সে পারত। দিব্যি বিছানায় পড়ে থাকলে তাকে ঠেকাত কে? কিন্তু তবুও এসেছে সে। খ্যাতি-প্রতিপত্তির উদ্দেশ্য নিয়ে নয়—এই বুড়ো বয়সে তা বাড়বেও না কমবেও না; দেশের লোকের কাছে তার প্রতিপত্তি কদ্দূর, হলে ঢুকেই তা বুঝতে পারা গেছে। সমাদর-অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক—দু-একজন মহিলা ছাড়া কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় নি। কচি-কচি কংগ্রেসের ছোকরারা ডায়াসের সুমুখের দিকের চেয়ার দখল করে বসেছে। সে এতদিনের একটা বুড়ো মানুষ, দেশকে সে নিজের সাধ্য অনুসারে সেবাও তো করেছে কম নয়, তাকে একটা চেয়ার এরা ছেড়ে দিলে পারত না কি? না, লোকের কাছ থেকে মান কুড়ুতে আসে নি সে, এসেছে সে দুটো কথা বলে লোকের কল্যাণ সাধন করতে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে হাঁড়িমুখে, হাঁড়িমুখ কালো করে, ডায়াসের নগণ্য প্রায় এক কিনারে অবহেলায় পিছনে বসে বক্তৃতার পর বক্তৃতা শুনে যাচ্ছে সে। ছোকরারা দিচ্ছে বক্তৃতা।

সে আনন্দমোহনও নেই, লালমোহনও নেই। তাদের সঙ্গে এক প্ল্যাটফরমে একদিন বক্তৃতা দিয়েছে সে, অবিশ্যি সেদিনও তাকে কেউ একটা চিনত না, আজও চেনে না। সে যাক, কিন্তু সে পরিতৃপ্তির দিন চলে গেছে। এসেছে ছ্যাবলামির যুগ—শুধু তেরিয়া হয়ে ওঠা, মানুষকে অবজ্ঞা করা শুধু। কথা শুধু—কথা—কথা—কথা—কথা—কথা।

এরা নিজের কথা নিজের কানে বাজিয়ে নিতে খুব ভালবাসে বুঝি? এই-ই শুধু ভালবাসে, কথাই ভালবাসে শুধু, কথাই ভালবাসে; কথাই ভালবাসে।

না, অমন পিছিয়ে থাকলে চলবে না। ভবশঙ্কর উঠল। হুড়মুড় করে কয়েকজনকে ঠেলে ধাক্কা দিয়ে দু-একটা খালি-চেয়ার ঠকাস-ঠকাস করে আছড়ে ফেলে, ডায়াসের সামনে প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। নার্ভাস হয়ে গেছি? না হলে এমন দুড়দাড় করে এলাম কেন? এটা কেমন বেখাপ্পা হল—এই ভেবে মনে-মনে নিজেকে একটু বকলে সে।

মাথা নুইয়ে ভগবানের কাছে স্থিরতা ও শান্তি ভিক্ষা করলে—আধ মিনিটের জন্য; কিন্তু ততক্ষণে গোলমাল এত বেড়ে গেছে যে তাড়াতাড়ি তাকে শুরু করতে হল। ডান হাত উঁচুতে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে হেঁকে বললে—'মাননীয় সভাপতি ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ—আজ এ সময়ে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে আপনাদের আমি স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিতে চাই যে আমি বলশেভিক নই—'

অমনি সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

ভবশঙ্কর অনেক-অনেক বক্তৃতা দিয়েছে, অনেক ক প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়েছেও বটে, একবার জনতাকে বিগড়ে দিলে ব্যাপার কী মর্মান্তিক হয়, তা সে খুব ভাল করেই জানে। এই বিগড়নো বিশাল জনতার দিকে তাকিয়ে পা দুটো তার ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল।

ভবশঙ্কর বুঝতে পারলে যে সে ঢের ভুল করেছে। ও-রকম হুড়মুড় করে ছুটে আসা তার ঠিক হয় নি। মানুষকে ধাক্কা দিয়ে, চেয়ার পাল্টে বক্তৃতার গোড়াঘাটেও সে ভুল করে ফেলেছে। 'আমি বলশেভিক নই'—এ কী সঙ্গতি-হীন কথা? বিশেষত কংগ্রেসের লেফটদের সামনে। আবার এই কথা বলেই থেমে যাওয়া? —এ কী ভীষণ বেকুবি, বেল্লিকপনা তার?

নাক, কপাল, কান গরম আগুন হয়ে উঠল ভবশঙ্করের। আজকালকার ছেলেদের নজর বড় তীব্র; ঠাট্টার একটা জিনিশ পেলে তারা আর ছাড়ে না; তাদের উপহাসাস্পদকে তারা কাঁদিয়ে ছাড়ে, জুতো ছুঁড়ে মারে, সোডার বোতলও কি ছোঁড়ে না? শুয়ার, গাধা, বনশোর, খাটাশ, ছাগল কী না বলে? ডায়াসের থেকেই দু-একটি উঁচুদরের ভদ্রলোক, দেশ জুড়ে এদের খ্যাতি, তাকে ইতিমধ্যেই ব্যাটাচ্ছেলে, শালার ব্যাটা, বলে বাপান্ত করেছে। এখনও কুচলি কাটছে। বীতরাগে ভবশঙ্করের মন ভরে উঠল। একদিকে বক্তৃতা দেওয়ার অভিজ্ঞতায় সভা আয়ত্ত করবার টেকনিক শিখেছে বলে ভবশঙ্করের মনের প্রসন্নতা ও সাহসের আর শেষ ছিল না।

কি বেল্লিক—কি বিরাট বেল্লিক!

তবুও তার গলা ছিল। ভবশঙ্কর হুঙ্কার দিয়ে বললে—'আজকাল বলশেভিক ইজম বলে একটা কথা শোনা যায়, সোভিয়েট রাশিয়াকে কেউ প্রশংসা করে কেউ নিন্দা করে। সোভিয়েট রাশিয়া কী জানি না আমি। কিন্তু এটা জানি যে ওরা না কি আমাদের এই পূর্বদেশের লোকের মতই। আমাদের সঙ্গে পৃথিবীতে যদি কারো নিকটতম সম্বন্ধ থাকে—তবে এই রাশিয়ার। সমাজনীতি, রাজনীতি, জীবননীতির অপরাজেয় আদর্শে—'

নিতান্তই নিজের রুচির বিরুদ্ধে এমন সব অনেক কড়া-কড়া কথা বলে গেল ভবশঙ্কর। রাশিয়ার চাষাভূষোর গুণগান করলে ভবশঙ্কর। নিতান্ত নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সোভিয়েটের গুণগান করলে, বলশেভিকদের জয়-জয় করলে। জয়জয়কার পড়ে গেল ভবশঙ্করের।

রোখ চেপে গেল তারও, এখন আর কী কেয়ার করে সে? রাইট উইঙ্গারদের মধ্যে সে একজন রাইট উইঙ্গার, লেফট উইঙ্গারদের ভিতর সে একজন লেফট উইঙ্গার। কাকে এড়াবে সে? সবই তো তার দলের লোক। তাই সব দলেরই দলমতনির্বিশেষে সে দলপতি। গলা তার দামামা বাজিয়ে উঠল। ভবশঙ্কর ইউরোপকে বসালে—জীবনে অতটা কোনোদিন কাউকে বসায় নি সে—অল বেঙ্গল সু ফ্যাকটরিকেও না; কিন্তু তবুও লেফট উইঙ্গ রাইট উইঙ্গ সব উইঙ্গের প্রশংসমান হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে ইউরোপকে বসাতে হল তার। আরো বসাতে হল। আরো বলতে হল।

বিরাট বাজখাই গলায় যত জোর ছিল তার, যত বিক্রম ছিল জীবনে, যত

ক্রোধ ছিল, ক্রোধান্ধতা ছিল, সবই আজ নিজের কাজে এনে লাগাল ভবশঙ্কর। কিংবা এই ছোকরাদের কাজে—নাক-চোখ ঘেমে উঠল ভবশঙ্করের। কী করছে সে? কোথায় যাচ্ছে? এত জোরে যে-জয়ঢাক বাজাচ্ছে তা তো তার নিজের দেউড়ির বাদ্যি না..... ।

ঢের হয়েছে—ঢের হয়েছে—সে এখন থামতে চায়।

কিন্তু কে তাকে থামতে দেবে?

পশ্চিমের সমস্ত সভ্যতাকে রসাতলের অন্ধ তিমিরে পাঠিয়ে দিলে, ইকনমিক সিস্টেমের নিন্দা করলে, ধরে চাবকালে, ভবশঙ্কর বললে তার সায়েন্স মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায় শুধু, দেশে-দেশে শুধু ঘৃণা জাগিয়ে তোলে, শুধু যুদ্ধ-প্রলয়কে খোরাক যোগায়, মেডিসিনকে গাল দিলে, মেডিক্যাল কাউনসিলকে, সিনেমা-থিয়েটার রয়্যাল অ্যাকাডেমি সেণ্ট পলের গির্জা, এমন কি ফ্লিট স্ট্রিট অবধি সবই যেন ভবশঙ্করের হুঙ্কারের ভিতর দিয়ে গুঁড়ি-গুঁড়ি হয়ে মিলিয়ে গেল। তারপর ভবশঙ্কর আমেরিকাকে ধরলে।

আমেরিকারও ইউরোপের মত দুর্গতি হল ভবশঙ্করের হাতে। কিন্তু তবুও আজ আর ভবশঙ্করের জোশ মিটছে না। আবার সে চেপে ধরলে; মেডিসিনকে, মেডিক্যাল কাউনসিলকে পিষে ধনে শেষ করে দিলে।

সমস্ত রাত বিছানায় পড়ে ছটফট করতে লাগল ভবশঙ্কর। নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর গভীর ধিক্কারে, জীবনের এই দুরপনেয় মিথ্যাচারে—কিন্তু সবচেয়ে বেশি কংগ্রেসের আহ্লাদিকে তার নিজেরই মাথায় তুলে এমন ন্যাংটা-নাচনার ক্ষোভে দুঃখে অন্ধতায় বেল্লিকপনায় বিছানায় পড়ে ছটপট করতে লাগল ভবশঙ্কর।

পরদিন সকালবেলা মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে।

মনের ভিতর ধিক্কার এখন আর-কিছু নেই—একটা বিমর্ষ গর্ব। কালকের কাজের জন্য সে পুরস্কার চায়। এক রাতেই সে ঢের নাম করে ফেলেছে নিশ্চয়ই। দেখা যাক ওরা কী বলে: ওরা কি তাকে সপ্তমস্বর্গে তুলে দিয়ে ছেড়েছে! দেশের নেতা হওয়া কিছু এমন নয়! হয় তো সে এখন থেকে এই পথই ধরবে।

ইংরেজি-বাংলা সমস্ত গ্যাশনালিস্ট কাগজ ভবশঙ্কর কিনলে, কই এমন বিশেষ কিছু প্রাধান্য দেয় নি তো থাকে। ভবশঙ্কর মুশড়ে গেল। তবে দু-একটা কাগজ ভবশঙ্করকে অল্পবিস্তর তাইয়েছে। একটা তাকে ঠাট্টা করল না কি। কাম ব্যাক? বলতে চায় কি ওরা? কোনোদিনই কি সে লেফট উইঙ্গার ছিল যে আবার গরুর মত হারিয়ে গিয়ে—ফিরে এসেছে? ভবশঙ্করবাবু তার জীবনের গত ত্রিশটা বছর খতিয়ে দেখল। আটাশ থেকে আটান্ন অব্দি—কই, কোনোদিন পরম এক্স্ট্রিমিস্টের দলে সে তো ছিল না। বাংলার স্বদেশী যুগে সে ডাক্তারি করত, ভিজিট দু টাকার থেকে চার টাকা, চার টাকার থেকে ছ টাকা, আট টাকা, দশ টাকা, বার-চোদ্দ-ষোল এই দিকেই তো তার মন ছিল। সে সাধনা সফলই হয়েছে তার। ষোল অব্দি উঠতে পেরেছিল সে। বক্তৃতাও সে দিয়েছে বটে—মিডওয়াইফারি, নাইটস্কুলের প্রয়োজনীয়তা, চাল ও চিড়ে এই সব নিয়েই তো; বড় জোর ব্যাক করেছে—বিদ্যেসাগরের আওতায়, নিজের ধর্মবুদ্ধিতেও বটে—বিধবাদের।

এক-আধটা বক্তৃতাও ঐ প্রসঙ্গে দিয়েছে বটে সে।

কিন্তু—

অবিশ্যি কংগ্রেসে সে এক-আধবার ঢুঁড়েছে—উনিশ শ পাঁচে-ছয়ে-সাতে।

কিন্তু সে তো একজন নগণ্য দর্শক হয়ে শুধু।

প্ল্যাটফরমেও সে দাঁড়িয়েছে বটে, কলকাতায়, কলকাতায়ই শুধু, উনিশ শ আটে-নয়ে-দশে—কিন্তু সে তো তার জীবনের মজ্জাতে দাঁড়াবার মুদ্রাদোষের জন্য শুধু, শুধুই দাঁড়াবার জন্য, দু-চার মিনিটের জন্য শুধু।

তার পর পলিটিকস একেবারে ছেড়ে দিয়েছে সে। বক্তৃতা সে সেই থেকে আজ অব্দি মাঝে-মাঝে কিছু-কিছু [দিয়েছে] কিন্তু সে সব পারিবারিক-সামাজিক জীবনের গুড়-চাল-চিনি নিয়ে, শুধু জীবনের পরম অপরিহার্য জিনিশগুলো নিয়ে অবজ্ঞা করে, সর্বনাশী পলিটিকসের বিষয় নিয়ে একেবারেই নয়। ও-সব মাতলামিকে এড়িয়ে এসেছে সে—বহুদিন ধরে।

যেন ভবশঙ্কর একজন বক্সিং চ্যাম্পিয়ন, না টেনিসের কিছু। একটা জকি? একটা স' না কি সে?

ভবশঙ্কর দাঁত কড়মড় করতে লাগল।

জার্নালিজমকে সে বারবার ঘৃণা করে—কী বিদেশী কী স্বদেশী জার্নালিজমকে·

বরাবর অবজ্ঞা করে সে। কিন্তু তবুও তো রোজ তাকে খবরের কাগজ পড়তে হয়—পড়ে বীতশ্রদ্ধ হতে হয়। কিন্তু তবুও আবার পরদিন ভোরে খবরের কাগজের ভাঁজ খুলে সবচেয়ে আগে তাকে বসতে হয়—তার পর দিনও তাই। এ-রকম এ বিষম ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা আর পেলে না সে। এ বড়ি রোজই গিলতে হয় তাকে—গিলে ওগরাতে হবে। কেউ তো বলে না তাকে গিলতে; কিন্তু তবুও গেলে যে সে! না গিলে পারে না যে! কেন এমন—কেন এমন!

বটে।...সস্তা গ্র্যাজুয়েটদের ভিতর থেকে এই সব দিশি জার্নালিস্ট তৈরি হয়; এদের ইংরেজি পড়ে-পড়ে খুন হয়ে গেছে সে। ন্যাশনালিজমের বড়াই করে? বটে! বিলেতি পাগলামিতে এদের মগজ ভরা; বিলেতি রিঙের ভাষা, টার্ফ ক্লাবের উপমা, ফুটবল গ্রাউণ্ডের অলঙ্কার এই সব জঘন্য সম্বল নিয়ে জীবনের সমৃদ্ধ মূল্যবান জিনিশগুলোর ওপর এরা শিশুর মত মন্তব্য করে—নিজেদের বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ পিতামহ বলে ভাবে। ভাবে না কি? জানে না কি ভবশঙ্কর সব? ত্রিশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন খবরের কাগজ পড়ে ন্যাশন্যালিজমের, বাঙালিয়ানার, সমস্ত জারিজুরি ধরে ফেলেছে সে।

এর পর জীবনের গুরুত্ব থাকে কোথায়? অথচ এই তরল খোকারাই দেশের কাগজের জগতের নেতা: দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সবই এদের হাতে।

বিরূপতায়, ঘৃণায়, আস্ফালনে ভবশঙ্কর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল।

বধূ চা নিয়ে এল।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা কিছু বুঝতে পারলে না মৃণালিনী।

বুঝবার দ্বিতীয় চেষ্টা না করে চলে গেল সে: সে কেয়ার করে না। ভবশঙ্কর কাগজের স্তূপ ঠেলে ফেলে দিল।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসল সে—চা, জেলি মাখানো টোস্ট, ডিম, গোটা দুই কলা। খেতে মিনিট দশেক লাগল।

তার পর কী করবে সে?

কাগজগুলো? কক্ষনো না। বরং কালকের ডিরেক্টর মিটিঙের জন্য এখন থেকেই তৈরি হয়ে থাকা ভাল। ভবশঙ্কর ইজিচেয়ার থেকে উঠে গিয়ে

সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের পাশে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসল—মেহগিনি কাঠের চেয়ারে। শুধু লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানি নয়—আরো দুটো কোম্পানির চেয়ারম্যান সে। ডিরেক্টরও বটে—আরো দু-তিনটা কোম্পানির। এ-ছাড়া ব্যবসার জাল মাকড়ের মত আরো জড়িয়েছে তাকে, কাগজপত্র চিঠি-ফিটি ঘাঁটতে-ঘাঁটতে চক্ষু স্থির হল তার। দু-চার দিনের গাফিলতিতে এমনই কাজের ভিড় জমে গেছে—হা ভগবান।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে অত্যন্ত স্থির শান্তভাবে স্বভাবসিদ্ধ সাধুতার সঙ্গে ভবশঙ্কর কাজ করতে শুরু করে দিলে। কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি পারল না। কী হবে কাজ করে? মান? মান তার কোথায়? এই সব কাজ করে মানুষের আবার সম্মান হয়? হোক না খুব গুমগুমে কোম্পানি, এ চেয়ারম্যানের মূল্য কী? দুটো দিশি কোম্পানির চেয়ারম্যান—পৃথিবীর চেয়ারম্যানদেরই-বা মূল্য কী? কে তাদের নাম জানে? বিরাট পৃথিবী, ভারত, এমন-কি বাংলাও আয়ত্তের বাইরে। ভবশঙ্কর চেয়ারম্যানের নাম কলকাতারই-বা কটা লোক জানে—জেনেও-বা কটা লোক গ্রাহ্য করে? কাল যখন অ্যালবার্ট হলের মিটিঙে ঢুকেছিল সে কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় নি। গলাবন্ধ গরদের কোটপরা একটা হেডমাস্টার কিংবা সেক্রেটারিয়েটের হেড এ্যাসিস্টেন্ট বলে ভেবেছিল হয় তো। হা ভগবান! ফিরেও তাকায় নি কেউ তার দিকে; তাকাবে কি? তাকে চিনলে তো? সে একটা মানুষের মধ্যে ধর্তব্য হলে তো? চেয়ারম্যান হয়ে, ষোল টাকা ভিজিটের ডাক্তার হয়ে, মানুষের কাছে নিজের মুখচেনা অব্দি হতে পারা যায় না! মান-যশ তো দূরের কথা!

কাল যখন এ্যালবার্ট হলে এক অনামা চেয়ারম্যানমাত্র ডাক্তারমাত্র হয়ে ঢুকেছিল সে, ডায়াসের সব চেয়ে পিছনের চেয়ারটাকেও নিজের হিস্যাতে দখল করে নিতে হয়েছিল তার; হয় তো তখনই যদি কোনো মহত্তর ব্যক্তিত্ব এসে হাজির হত—ও-চেয়ারটুকুও সে পেত না।

ত্রিশ বছর ধরে ডাক্তারি ও চেয়ারম্যানশিপ করে এই তো হল তার। অবিশ্যি টাকা হয়েছে—ভালই হয়েছে। যে-টাকা হয়েছে তাতে সাত পুরুষ দুধ-ভাতে কাটিয়ে দিতে পারে। বিজনেসে লেগে থাকলে এই হবে শুধু—টাকা হবে, আরো টাকা হবে, আরো টাকা হবে, আরো টাকা হবে।

কিন্তু সে টাকা দিয়ে কী করবে ?

এখনই যে-টাকা আছে নিজের জীবনটাকে পাঁচ দিয়ে সাত দিয়ে গুণ করলেও তো সে টাকা শেষ করতে পারবে না সে। আরো টাকা জমাচ্ছে সে শুধু পরের খাবার জন্য ; তাদের জন্য ব্যবস্থা করে যাচ্ছে সে। তারা কাজকর্ম নাও করতে পারে—সংগ্রাম কী, সহিষ্ণুতা কী, নাও বুঝতে পারে তবুও ভবশঙ্করের টাকার উপকার পাবে তারা—টাকা বাড়ানো মানে এই সব জীবনকে প্রশ্রয় দেওয়া।

এ-রকম দরজা বন্ধ করে কাজ করে যাওয়া মানে এদের জন্য টাকা বাড়িয়ে যাওয়া শুধু. গভীর বিতৃষ্ণায় ভবশঙ্করের মন ভরে উঠল ; কলমটা রেখে দিলে সে।

সমস্ত জীবনটা তার হিতসাধনের দিক দিয়ে এইটুকুতে এসে দাঁড়ায় ? পরিবারের জন্য টাকার ভাণ্ডার রেখে যাওয়া শুধু ?

এদের জন্য কেন সে টাকা রেখে যাবে ? এরা নিঃসঙ্কোচে সন্তানের জন্ম দিতে সুবিধা পাবে বলে ? পরবর্তী সন্তানেরা আরো সন্তান নিয়ে আসবে। তার পর আরো সন্তান আরো সন্তান। আরো সন্তান। সন্তানই শুধু। হয় তো ভবশঙ্করের মত এক চেয়ারম্যান সন্তান। কিংবা মিত্তিরের মত এক ব্যারিস্টার সন্তান কিংবা মিত্তিরের ছেলেটার মত এক মুন্সেফ সন্তান, এক সাবজজ সন্তান, কিংবা কালকের মিটিঙের লেফট-রাইট উইঙ্গারদের মত বেয়াড়া সন্তান সব, কিংবা যারা তাকে 'বেটাচ্ছেলে' বলেছিল কাল তাদের মত ডায়াস-বিলাসী ফোঁপরদালাল সন্তান সব।

একটা গভীর অবসাদে ভবশঙ্করের মন ভরে উঠল। কাগজপত্র ডেস্কে বন্ধ করে রেখে দিলে সব।

দরজাটা খুলে দিলে সে।

ইজিচেয়ারে গিয়ে বসল।

কী চায় সে ? জানালা দিয়ে অতিদূর বিস্তৃত নীল আকাশ। মাঘের সকাল বেলায়ই আকাশের দিকে এমন স্তব্ধ হয়ে জীবনে কোনোদিনও তাকায় নি সে। ছেলেবেলার থেকে কোনো কল্পনা, স্বপ্নের মানে বোঝে নি সে, প্রেম—বা নারীও কোনোদিন চায় নি।

[illegible] উকিলের মুহুরি মাত্র ছিল ; একটা অজ পাড়াগাঁয় খড়ের

ঘরে জন্মেছিল ভবশঙ্কর ; কিন্তু ছোটবেলার থেকেই চোখ ছিল তার বিদ্যার দিকে। টাকা জমাতে-জমাতে মান-সম্মান পদগৌরবের দিকে রোখ চাপল তার। মনে হল, মান বুঝি হয় চেয়ারম্যান হয়ে। যাই হোক কিন্তু প্রেমের দিকে কোনোদিন রোখ তো চাপে নি তার। নারীকেও কোনোদিন সে চায় নি ; সৌন্দর্য চায় নি ; স্বপ্ন-কল্পনার মানে বোঝে নি। প্রমুক্ত নীলাভ আকাশের দিকেও—ঠিক আকাশটাকেই দেখবার জন্য, সুদ বা ডিবিডেন্টের, ডিবিডেন্ট বা সুদের চিন্তা করবার জন্য নয়—আজকের মতন এমন ভাবে কদাচিৎ তাকিয়েছে সে। আজও সে চোখ নামাল : আকাশের ভিতর কোনো আশ্রয় খুঁজে পেল না সে।

বধূ আর-একবার এল চায়ের বাসনপত্র কুড়িয়ে নিয়ে যেতে কিন্তু ভবশঙ্কর সে দিকে নজর দিল না।

কী করবে সে ?

কাগজের স্তূপ নিয়েই সে বসল আবার ; একটার পর একটা কাগজ দেখছে সে। কোনো কাগজেই ভবশঙ্করের বক্তৃতাটাকে তেমন কোনোই গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, সেই মিটিঙটাকেই না যেন ! কালকের কলকাতার আর-বিশ-পঞ্চাশটা খুঁটিনাটি এটা-সেটা জিনিশের ভিতর আরো একটা দৈনন্দিন জিনিশ শুধু, খবরের কাগজের কলম ভরাবার মশলা মাত্র।

একজন লোককে কে আসরে নামিয়েছে—ভবশঙ্করের স্বপ্নাতীত অনেক প্রবল দুঃসাধ্য অলৌকিক কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে। এ নিয়ে কোনো কাগজের কোনো ত্রিসীমায়ও কোনো উচ্ছ্বাস নেই, কোনো রোমাঞ্চের লেশ-অব্দি নেই। এ যেন হতই—এ যেন হতই ; কালকের তারিখে এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই হত যেন ; এ এমন সাধারণ ; এ এমন উপেক্ষিত।

এ রকম কত হল, হবেও কত, দিনরাত দণ্ডে-দণ্ডেই হয়ে যাচ্ছে যেন।

সমস্ত দিন ভবশঙ্কর কোনো কাজ করতে পারে নি। সেক্রেটারি ছোকরার খোঁচা খেয়ে নয়—এমনিই দুটো রেজিগনেশন লেটার লিখে রেখেছে সে - কাল ডিরেকটরদের কাছে পেশ করবে ; ব্যস্—সারা !

কিন্তু তার পর কী নিয়ে থাকবে সে ? জানে না। কিন্তু তবুও ব্যবসা নিয়ে থাকবে না আর। টাকা রোজগারের ঢের হয়েছে তার ; টাকার প্রতি আর কোনো মায়া নেই ; চেয়ারম্যানের সম্মান বেঁটে খেয়েও জীবন তার এখন

তৃপ্তি পাচ্ছে না, জীবনের নেশা চড়ে গেছে ভবশঙ্করের।

সকালবেলা এতদূর ভেবে রেখেছে।

কিন্তু দুপুর বেলা মনে হল—

কতকগুলো মানুষের যাতে মঙ্গল হয় এমন কোনো কাজ করতে পারবে কি সে? কিন্তু কোন মানুষদের মঙ্গল সে করবে! সমস্ত জগৎ—এমন কি সমস্ত বাংলা—কলকাতা—বা তাদের পাড়াটুকুর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করতে যে শক্তির দরকার তা তার আজ আর নেই, পরিধি ঢের কমে গেল তাই।

ঘুরেফিরে আবার পরিবারে এসে দাঁড়াল। পরিবারের মঙ্গল? টাকাই তো জমিয়ে গেছে সে: হাঁ। সবই পরিবারের নামেই রেখে যাবে। সকলেই তো তাই করে, গৃহধর্ম কি সবচেয়ে আগে নয়? পরিবারকে ঠকিয়ে কখনও ন্যায় হয়—না ধর্ম হলে? পৃথিবী এখনো তাই ঠিকই তা হলে? পরিবারে ওপরই তো দেশ দাঁড়ায়, জাতি দাঁড়ায়।

ভবশঙ্করের মন ঢের আশ্বস্ত হল: পৃথিবীতে একটা কাজ করেছে সে—নিজের পরিবারটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে। নিজের বাবার কথা মনে হল: অতীত জীবনের দৈন্য ক্লেশ সংগ্রামের ভিতর কতবার পিতাকে মনে-মনে অভিশাপ করেছে ভবশঙ্কর—কেন বাবা তার জন্ম দিল।

বাস্তবিক পক্ষে দেখতে গেলে আজও পিতাকে ক্ষমা করা যায় না—এমন দীনহীন পরিবারে কেন সে বারটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিল—এ সব লালসা মাত্র—আজও সে বলবে: মানুষের জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্যের চেয়ে এ-সব প্রক্রিয়া ঢের-ঢের বিচ্ছিন্ন: আজও সে বলবে।

কিন্তু ভবশঙ্করের নিজের জীবনে এ কেলেঙ্কারি নেই। পাঁচ-সাতটি সন্তানের পিতা হলেও ক্ষতি ছিল না; কিন্তু তবুও তার একটি সন্তান শুধু। সে সন্তানকেও মানুষ করে গেছে সে।

পরিতৃপ্তিতে ভবশঙ্করের মন ভরে উঠল। ঘরের চারদিকে তাকালে সে। কলেজ স্ট্রিটের স্বস্তিকা সিমেণ্ট দিয়ে তৈরি তেতলা বাড়ি—আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার মার্টিন কোম্পানি—আগাগোড়া বাড়িখানা তার। এমন আরো দু খানা বাড়ি তার কলকাতায় রয়েছে—ভাড়ায় খাটছে। ঘরের চারদিকে তাকালে ভবশঙ্কর—ইঞ্জিনিয়ারিঙের কিছু সে জানে না বটে, আর্কিটেকচার সম্বন্ধে তো সে আরো অন্ধ; নিখুঁত বিশেষজ্ঞতা নিয়ে উপভোগ বা বিতৃষ্ণা

করবার ক্ষমতা তার নেই ; তা নেই—নেই বটে ; না-আছে কবির নিবিড় স্বাদ-বিস্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা—কিন্তু একজন সাধারণ পরিতৃপ্ত মানুষের নির্বোধ আমোদে কড়িকাঠগুলোর দিকে সে তাকালে—কী পরিপাটি ! তার আজীবন অর্থকরী পারিপাট্যের প্রতিনিধি যেন এরা। কার্নিশের দিকে তাকাল ভবশঙ্কর ; জানালাগুলোর দিকে তাকাল—আকাশটার দিকে আরেক বার তাকিয়েই মার্বেল পাথরের নিরেট মেঝের দিকে তাকিয়ে এই তেতলায়, সমস্ত থেকে ঢের দূরে, স্বস্তিকা সিমেন্টের দৃঢ়তার ভিতর, এই নিভৃতে, নিজেকে সে এমন নিরাপদ মনে করলে—নিজের জীবন এমন মূল্যবান মনে হল তার।

কিন্তু কেন মূল্যবান ?

মূল্যবান নয় ? মস্ত বড় ফার্মকে সে খাটিয়েছে, মার্টিন কোম্পানিকে খাটিয়েছে, রাতদিন, দিনরাত ; সে, একজন মুহুরির ছেলে। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার দিকে তাকালে সে, ঘরের ভিতর চেয়ারের দিকে তাকালে, পায়ের নীচে কার্পেটের শৌখিনতা বোধ করলে ভবশঙ্কর।

পাশের ঘরে চলে গেল সে—ড্রয়িংরুম : এখানে কার্পেট আছে ঢের দামি। পারসিয়ার থেকে এক কাবুলি এনে বিক্রি করে গেছে। লেসের পর্দা, তেপয়, আতরদান—বড়-বড় ফ্রেমে নামজাদা ছবি সব ! বিশেষত ঘরের ভিতর বিশ-পঁচিশটা।

একটা সোফায় পরম আয়েশে গা এলিয়ে দিল সে ; জীবনে এ-রকম অলস বিলাসিতা খুব কম করেছে ভবশঙ্কর, সময় আর টাকা এতদিন গিলে ফেলেছিল তাকে,' নিজের মূল্য সে বোঝে নি : অবসরই পায় নি বুঝবার জন্য ; আজ এই অবসরের ভিতর এই মহৎ সত্য সে বুঝে ফেলেছে—

নিজে কত মূল্যবান সে ; তার এই সমস্ত শরীরটা অত্যন্ত দামি ; এই উপযুক্ত আয়েস আরাম একে দিতে হবে। সোফায় গড়িয়ে স্বাদ পেয়ে নিল ভবশঙ্কর। একটা মস্ত বড় ছবির কাছে গিয়ে দাঁড়াল—পঁচিশ বছর ধরে ছবি-খানা দেওয়াল জুড়ে রয়েছে—একবার ফিরেও তাকাতে যায় নি ভবশঙ্কর। কিন্তু এ তার নিজের জিনিশ—টাকা দিয়ে কিনেছে সে ; উপভোগ করবে না ? আজ সে উপভোগ করবেই : এর পরম আস্বাদ না পেয়ে ছাড়বে না সে। ছবিখানার পাশে দশ মিনিট-পনের মিনিট-পঁচিশ মিনিট দাঁড়াল সে। তার সমস্ত জীবনের শত সহস্র ক্লেশ সংগ্রাম সহিষ্ণুতাও যেন এর চেয়ে ঢের

সহজ ছিল—আজ বিধাতা তার কাছ থেকে এ কী নিদারুণ ধৈর্য চাচ্ছে ; এ ছবির পাশে এমন করে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখছে কেন ? সে দাঁড়াতে চায় না, দাঁড়াতে পারে না, এর কোনো রস সে উপভোগ করতে পারে না—পৃথিবীর ভিতর এ ছবিখানার কোনো অর্থ, কোনো কারণ, খুঁজে বের করতে পারে না সে।

কিন্তু অনেক দাম দিয়ে এই ছবিখানা কিনেছে যে সে ; জীবনে তার অবসরও ঢের কম ; এখনই এর মূল্য আদায় করে নিক সে—না-হলে মৃত্যুর পরেও যেন নিস্তার পাবে না ভবশঙ্কর।

কিন্তু আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে বুঝল সে যে ও-রকম করে মূল্য আদায় করা চলে না ; তার অর্জিত সমস্ত জিনিশই বিধাতা তাকে ভোগ করতে দেয় নি। এ ছবিকে উপভোগ করতে পারবে না—এ পঁচিশখানা প্রসিদ্ধ ছবির একখানাও না। পৃথিবীতে এ-সব ছবি যদি কেউ নাও আঁকত তা হলেও ভবশঙ্করের নিজের জন্মটা বেশ নির্বিবাদে চলে যেত। তেপয়ের ওপর কতকগুলো এলবাম নেড়েচেড়ে কোনো সুখ পেলে না সে, মেহগিনির শেলফে বইগুলো রয়েছে—কবিতার বই, গল্পের বই, শুধু উল্টেপাল্টে কোনো পরিতৃপ্তি পেল না সে।

এ বাড়িতে আর কী আছে ?

ছেলে রয়েছে ; কিন্তু ছেলেকে পুত্রবধূর হাতে অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে সে। বধূর চেয়ে বাবা নিশ্চয়ই বড় নয়—ছেলের কাছে, ভবশঙ্কর চায়ও না তো।

শ্বশুর মশায় ড্রয়িংরুমে তো কোনোদিন আসেন না। পুত্রবধূ চলে যাচ্ছিল—ভবশঙ্করকে ড্রয়িংরুমে দেখে থমকে দাঁড়াল। বৌমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল ভবশঙ্কর—কনের মত, প্রণাম করে সে চলে গেল—

এ মেয়েটির কথা ভুলে গেল ভবশঙ্কর ; আবার না দেখা হলে আর মনে হবে না।

বাড়ির ভিতর উপভোগের জিনিশ খুঁজতে গিয়ে নিজের বধূর কথা তার মনেই হল না।

ভবশঙ্কর তার নিজের কামরায় চলে গেল। গত দু দিনের ভিতর অনেক গুখখুরি হয়ে গেছে। নিজে সে বাস্তবিক কী, কতটুকু, কী রকম আশা

করতে পারে, না পারে, বুঝেছে সে।

চেয়ারম্যানের কাজ নিয়েই বসল সে। টাকা জমবে শুধ্ ? জমুক। টাকা জমানোটা তার মতলব নয়।

ব্যবসায় উন্নতি দিয়েই বা করবে কী সে ? চেয়ারম্যানের নামের ভড়ংও কিছু না। কিন্তু তবুও ব্যবসায়ের যাতে উন্নতি হয়, চেয়ারম্যানের মর্যাদা বজায় থাকে, টাকা জমে, সেই জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে তার।

এ কেমন ?

কিন্তু যেমনই হোক, একটা ছবি বা সাহিত্য বা কংগ্রেসের আহ্লাদি, বা খবরের কাগজের প্রশংসা বা স্ত্রীকে উপভোগ করতে যাওয়ার চেয়ে—এ ঢের ভাল।

সম্পাদকীয়

এই চতুর্থ খণ্ডে আমাদের পরিকল্পনার কিছু বদল ঘটাতে হল। পাণ্ডুলিপি-পুঞ্জের বাইরে স্বতন্ত্র কাগজে যে-কটি কবিতা আমাদের কাছে ছিল, সেগুলো আমরা পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে দিয়েছি। সেই কারণে তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত উপন্যাস-গল্প-কবিতা এই বিষয় বিন্যাস সম্ভব ছিল। কিন্তু জীবনানন্দের যে কবিতাগুলি খাতায় লেখা সেগুলো স্বতন্ত্র কবিতা হিশেবে প্রকাশ করার সবচেয়ে বড় অসুবিধে—তার কোনো-কোনোটির অংশবিশেষ কবিতা আকারে প্রকাশিত হয়েছে, আবার কোথাও একই কবিতার বিভিন্ন খশড়া আছে। সেই খশড়াগুলির সঙ্গে পরিণত কবিতার দূরত্ব এতই বেশি যে তাদের স্বতন্ত্র কবিতার মর্যাদাও দেয়া চলে বটে কিন্তু সেই খশড়াগুলিকে পরিণত কবিতার সঙ্গে অন্বিত করাই সম্পাদনার দায়িত্ব। এই কারণে—স্বতন্ত্র একটি খণ্ডে এই কবিতাগুলিকে একত্রিত করাই সাব্যস্ত হল।

আবার, এখনো জীবনানন্দের অপ্রকাশিত উপন্যাসের আকার ও পরিমাণ যা তাতে বর্তমান খণ্ডের মত উপন্যাস ও গল্প দিয়েও, স্বতন্ত্রভাবে উপন্যাসের জন্যেই একটি খণ্ড ও গল্পের জন্যেও দুটি বা একটি খণ্ড দরকার হবে। চতুর্থ খণ্ড থেকে আমরা এই নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী লেখাগুলিকে সাজাচ্ছি।

বর্তমান খণ্ডে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যথাক্রমে লেখা একটি বড় গল্প, তিনটি ছোট গল্প ও একটি উপন্যাস থাকছে। ১৯৩১-এ লেখা 'পূর্ণিমা' রচনাটি গদ্য পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরোন খাতার অন্যতম। ১৯৩১-এ জীবনানন্দ অনেকগুলি গল্প লিখেছিলেন। তার ভিতর 'পূর্ণিমা'ই সবচেয়ে

বড়। জীবনানন্দ এক খাতায় পর-পর গল্প লিখে গেছেন যখন, তখন সেই লেখাগুলির মধ্যে চিন্তার একটা ধারাবাহিকতা দেখা যায়। বর্তমান খণ্ডের গল্পগুলিতে জীবনানন্দের চিন্তার ও লিখবার এই অভ্যাসটি পাঠকদের জানাবার সুযোগ পাওয়া গেল, প্রথম। কারণ, এর আগের কোনো খণ্ডে একই খাতা থেকে সবগুলি গল্প সংকলন করা সম্ভব হয় নি।

উপন্যাস

জীবনপ্রণালী

জীবনানন্দ এই উপন্যাসটিতে নিজেই তারিখ লিখেছিলেন 18th August···। প্রথম পাতায়। আর দ্বিতীয় খাতাটিতে শুধু August 1933। তার পরের লাইনে ব্র্যাকেটে (Begun August 18···) প্রথম পাতার নামপত্রে লেখা

A novel—I

Jibanananda Das

Presidency Boarding House. Calcutta. August 1833

(18th August···)

দ্বিতীয় পাতার নামপত্রে A novel II লিখে বাকি সবই আছে, শুধু House শব্দটি নেই আর ব্র্যাকেটে আরম্ভের তারিখ।

প্রথম পাতাটিতে ১১৯ ও দ্বিতীয় পাতাটিতে ১২৬ পৃষ্ঠা। প্রায় সব পৃষ্ঠাতেই লেখা জীবনানন্দীয় রীতিতে দুই লাইনের ফাঁকে, মাঝে-মধ্যে পৃষ্ঠার কিছু অংশ শাদা রেখে। কিন্তু দুই পাতা জোড়া পাণ্ডুলিপিতে লেখকের কোনো অনিশ্চয়তা নেই. তিনি পরিকল্পনা করেই একটি উপন্যাস শুরু করেছেন ও শেষ করেছেন। উপন্যাসটির শেষ পৃষ্ঠা দেখে বোঝা যায়—লেখক ঐ পর্যন্তই লিখতে চেয়েছেন। শেষ পৃষ্ঠার লেখাগুলিতে এমন কোনো চিহ্ন নেই যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ, বা, লেখক লিখতে-লিখতে ছেড়ে দিয়েছেন।

লেখকের পরিকল্পনার বা ঈপ্সিত সংশোধনের একটা ছক পরিষ্কার হয় দ্বিতীয় পাতার তৃতীয় মলাটে কিছু ইতস্তত লেখা থেকে।

Addenda :

Sribilash : You ought to sterilize yourself.

Anjali : কাদায় পা খেয়ে যাচ্ছে। চুলে টাক। ভাল তেলের অভাবে। টুথপেস্টের অভাবে দাঁত, ও চশমার অভাবে চোখ, nourishment-এর অভাবে ··। কে জানে পেটের ব্যথাটা গলস্টোন না অ্যাপেনডিসাইটিস। ব্লাড প্রেসার হয় নি তো? পেটে টিউমার? জরায়ুতে কোনো দোষ? Any female disease? মাইয়ের ওপর ঐ দাগটা শ্বেত কুষ্ঠ নয় তো···

Pratima : আমাকে শচীন ডাক কেন? শচীনদা তো ডাকতে এতদিন। Any scene with Amal and Anjali (disloyalty) just before end.

এই সংকেতগুলি উপন্যাসে বড় একটা ব্যবহৃত হয় নি; এমন হতে পারে যে উপন্যাস কিছুদূর লেখা হওয়ার পর লেখক এই সংকেতগুলি রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'প্রতিমা' চরিত্রটির উল্লেখ থাকায় সন্দেহ হয়, উপন্যাসটি লেখার পর পড়ে লেখক এই সংশোধনের সংকেতগুলি লিখেছিলেন। কারণ উপন্যাসে প্রতিমা চরিত্রটি একেবারে শেষ দিকে এসেছে। বর্তমান পাঠে অঞ্জলি চরিত্রটি যা দাঁড়িয়েছে, তাকে আরো নির্দিষ্ট করার লক্ষ হয় ত ছিল লেখকের।

এই উপন্যাসটির কোনো নাম লেখক দেন নি। আমরা লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত একটি পদ (১১৩ পৃ) থেকে উপন্যাসটির নাম তৈরি করেছি। এ-রকমই আর-দুটো পদ থেকেও আমরা নাম বাছতে চেয়েছিলাম, 'মানুষের স্বাদ', 'রক্তমাংসের ব্যবহার'। এই তিনটির মধ্যে 'জীবনপ্রণালী' নামটিই উপন্যাসটির প্রবণতার সঙ্গতিপূর্ণ মনে হল।

জীবনানন্দের উপন্যাসে সাধারণভাবে ঘটনার ওপর নির্ভরতা থাকে না। কিন্তু বর্তমান উপন্যাসটি বেড়ে উঠেছে পরপর কয়েকটি আপাততুচ্ছ অথচ দরকারি ঘটনার ওপর ভর দিয়ে। ৪৫ পৃষ্ঠার বিরতি পর্যন্ত ঘটনা এগিয়েছে অঞ্জলির সিনেমা দেখা নিয়ে। তারপর, শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের আশ্রয় রজনীকান্ত খাসনবীশের পাঠানো 'দশখানা দশ টাকার নোট'। এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী অংশ জুড়ে আছে গ্রামের নানা চরিত্র ও গ্রামে বেড়াতে আসা কয়েকটি প্রবাসী চরিত্র, যাদের সঙ্গে উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের অতীতে কোনো এক ধরনের

সম্পর্ক ছিল। এই চরিত্রগুলিই, আর তাদের সম্পর্কে শচীনের প্রতিক্রিয়া, আর, তাদের না-চিনেই, এমন-কি তাদের সঙ্গে কোনো কথাও না বলে তাদের ঘিরে অঞ্জলির জীবনবাসনা—উপন্যাসটির কাহিনীকে আবার ঘটনামুক্ত করে দিয়েছে। এ-উপন্যাসে জীবনানন্দ অনেক নির্দিষ্ট অর্থে ঔপন্যাসিকের মত কাহিনী সাজিয়েছেন—তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত 'কারুবাসনা' উপন্যাসের জার্নালধর্ম থেকে 'জীবনপ্রণালী'র এটা প্রধান পার্থক্য।

পাণ্ডুলিপিতে উপন্যাসটির কিছু বর্জিত অংশ

রচনাসংগ্রহের পৃষ্ঠা/নির্দেশ		বর্জিত অংশ বা সংশোধন
১	৫ম লাইনে 'আর'-এর আগে	(আজ)
১	৫ম লাইনে 'না'-র পরে	যা হোক পয়সা ঠিক করে।
১	৬ষ্ঠ লাইন	হ্যাজাক [আমাদের ছাপায় শব্দটি ভুল করে থেকে গেছে]।
২	৮ম লাইন 'ইকনমিকস নিলে পারতে'-র পরে	—'আমার মনে হয় ইকনমিকস নিয়ে…' —'ইকনমিকস পড়ানো'
২	১২ লাইনের পরে	'অনেক মেয়েই তোমাদের জন্য তো বাংলা সাহিত্যের…' B.A. পাশ করে —মাস্টারি করতে বললাম B.A. পাশ করে— —মাস্টারি করার জন্যেই। মাস্টারি করার… —বি. এ. এবার তা হলে পড়বে ?
২	২৫ লাইনের পর 'যোগাড় করে রাখা দরকার' কেটে	'পাশ করতে হবে'

রচনাসংগ্রহের পৃষ্ঠা/নির্দেশ		বর্জিত অংশ বা সংশোধন
২	শেষ লাইনের 'একশও পেতে পারি'-র পরে	অঞ্জলি এই রকম মনে করে। একখানা খবরের কাগজ হাতে তুলে বিজ্ঞাপনের কলম কোনোদিন দেখতে যায় নি। যে-মানুষ অনেক দিকে বঞ্চিত তার চেয়ে কোথাও যদি হাতটা নির্বিবাদ ভরসা—
৫	২ লাইনের পর	দিয়ে পুকুর থেকে এক বালতি জল ও একটা ঘটি···
৫	৩ লাইনের পর	অঞ্জলি—আস্তে-আস্তে জল দাও তো আমায়।
৬	শেষ লাইনের আগে	—যাও বাবার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নাও গে —এত রাতে? তিনি জিজ্ঞেস করবেন, কেন, কিসের জন্য পয়সা দরকার? —তাও জিজ্ঞেস করবেন না কি? —এত বড় পরিবার চালাতে হচ্ছে—সত্তরটা টাকা মোটে মাইনে। হিশেব করে চলতে— [এই অংশটি ৮ পৃষ্ঠার শেষ দিকে প্রায় অবিকল ব্যবহৃত হয়েছে]।
৭	২৪শ লাইনে 'আমার' পর নতুন লাইনে	একটু হেসে—'আমার মুখের দিকে কখনই-বা তাকালে তুমি?'
১২	৩য় লাইন	সিঁদুরের প্রতি
১২	১৮শ লাইনের প্রথম 'আমার'-এর পর	একটু হেসে—নামাবলি যত পরিত্যাগ করতে পার ততই ভাল।

রচনাসংগ্রহের পৃষ্ঠা/নির্দেশ		বর্জিত অংশ বা সংশোধন
১৩	৮ম লাইন 'টাকা'র পর	বেশ ভাল
১৩	১২শ লাইনে 'সিঁদুরহীন' —এর জায়গায়	সিঁদুর টিপ
১৩	৯ম লাইনে 'রূপসী'র জায়গায়	সুন্দরী
১৪	১০ম লাইন 'ঝটকা'র জায়গায়	বাদলা
১৫	৪র্থ লাইনে 'বিশ্রী'র জায়গায়	শূন্যতা
১৫	৪র্থ লাইনে 'বিশ্রী'র পর	হেমন্তের রাতে একটা বুড়ো ঠুটো তালগাছ দেখলে আঁতকে উঠতে হয় না !
১৬	১৮ লাইনের পর	কিন্তু এ-সব চিন্তা ভাবনা বেশিক্ষণ টেঁকে না। নিজের অবস্থা দেখে নিজেকে দয়া করে।
১৮	৩য় লাইনে 'উচ্ছ্বিত'-র পর	'অপরূপ' ও 'উদ্বেল'
১৮	১৯শ লাইনে 'আত্মদান'-র জায়গায়	আত্মসমর্পণ
১৮	২৩শ লাইনে 'কৃতী'র জায়গায়	গভীর
১৮	২৮শ লাইনে 'হেঃ হেঃ'-র জায়গায়	ঐ সব লোককে
১৯	২৬শ লাইনে 'আড়াই হাত ডেবে'-র জায়গায়	বুড়ো মানুষের মত বসে
২২	৫ম লাইনের পর	—হ্যাঁ, হ্যাঁ রাজেন —ঐ ছ-আনা করে যেগুলো পাওয়া

যায় সেইগুলো বুঝি ?

—কী জানি !

—তা ছাড়া আর দেবে কী ? কেরোসিনের বাতির চেয়েও অধম।

—হ্যাঁ, বড্ড আশ্চর্য—একেবারে চোখের কাছে না নিলে লেখা পড়তে পারা যায় না—

—তার মানে চোখটিও গিয়েছে—জে-কে মৈত্রকে চোখ দেখান না কেন ? হয় তো মাইনাস টুয়েলভ-এর চশমা দেবে আপনাকে।

—তা দিতে পারে—অসম্ভব নয়। অনেক দিন থেকেই বুঝতে পারছি চোখ খেয়ে যাচ্ছে আমার, কিন্তু তবুও কী করব ? উপায় নেই।

—কেন ? অথচ বিনে পয়সায় আপনি আছেন।

—মাঝে-মাঝে কাঁচা ডিম খাই।

—রুই মাছের মুড়ো ? ট্যাংডস ? মাসকলায়ের ডাল ? খেয়ে যে দৃষ্টি ফিরে পায় শচীনদা।

রাজেন একটু টিটকিরি দিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে—

—একেই বলে ভবিতব্য।

চুরুটের ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে টিটকিরি দিয়ে তাকাতে লাগল রাজেন।

—সাত বছর ধরেই ভেবে আসছেন।

—হ্যাঁ, প্রায় সাত বছরই ত হতে

রচনাসংগ্রহের পৃষ্ঠা/নির্দেশ		বর্জিত অংশ বা সংশোধন
		চলল, রাজেন। —এ সাত বছর সুবিধা মতন কিছু চাকরিও পেলেন না, চশমাও নিলেন না। —না, চশমাও নেয়া হল না। —আগামী সাত বছরের মধ্যে চাকরি না পেলে তা হলে আরো সাতটা বছর বিনে চশমায়ই চলবেন। বিছানার থেকে একটা চুরুট তুলে নিয়ে জ্বাললাম। রাজেন—রোজগার না-করতে-করতে মানুষ এই রকম পাথরের মত হয়ে যায়—চোখ অন্ধ হয় পরে, মন অন্ধ হয়ে যায় তার চেয়ে আগে। —তাই নাকি রাজেন?
২২	২৪ শ লাইনে 'সকালবেলা'র জায়গায়	ভোরের বেলা
২২	২৭ শ লাইনে 'এই সুন্দর শান্তিকে'র জায়গায়	এ সুন্দর শান্তির দিনাতিপাত / জীবনযাত্রাকে ভেঙে
৩২	৩য় লাইনের পর	৩২ টাকা পান শুধু, পরিবর্তে কী অক্লান্ত কাজ করেন শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন আপনি। ছ ঘণ্টা ছেলেদের ক্লাশ করেন / পড়ান। ক্লাশের পর কর্তাদের খোশামুদি।

রচনাসংগ্রহের পৃষ্ঠা/নির্দেশ		বর্জিত অংশ বা সংশোধন
৪২	১৮শ লাইনের প্রথমে	কিন্তু একটি প্রসন্ন নারীর হাতের
৪৩	৪র্থ লাইনের পর	—না এঁটো নয় ; অনেক দিন ব্যবহারই করা হয় নি— —কোথায় রয়েছে ? —তাকের এক কোণে পড়েছিল । —ভিতরে মাকড়সার বাসা হয় নি তো ? —দেখি । গ্লাশটা তাকের থেকে নামিয়ে এনে অঞ্জলি—এই যাঃ ! তেলাপোকা মরে রয়েছে যে ! ছিঃ, এতে তুমি খাবে ? —কটা মরেছে ? —একটা, দুটো, তিনটে । —তা হলে একটা কলোনি বেঁধে ছিল । —হ্যাঁ । কিসের গুঁড়িগুঁড়ি ডিম দেখছি—ধুলো, নোংরা, খড়, ইস, এ-গেলাসটা যেখানে ছিল সেখানেই থাক । —কলসীটা / কুঁজো কোথায় ? —কেন, মুখের কাছে তুলে গড়িয়ে খাবে ? —তাই করা যাক । —অতটা ভরসা হারিও না । কুঁজোর মুখে একটা মাটির খুরি আছে—তাইতে করে দেব ?

রচনাসংগ্রহের পৃষ্ঠা/নির্দেশ		বর্জিত অংশ বা সংশোধন
		—দিন। একে পল্লী বধূ—তার পরে মাটির খুরিতে বাংলার নদীর জল—এর চেয়ে বড় প্রসাদ জীবনে কোনো দিন পাই নি।
৪৫	১২ লাইনের পর	না হলে কোথায় কী রকম কাদা লাগল কী করে বুঝব
৪৫	১৩শ লাইনে	খুব পরিষ্কার করেই বুঝব / বিধাতা নিশ্চয়ই বুঝবেন
৪৫	১৫শ লাইনে	তোমার এত সাপের ভয় অমল
৪৫	২৬শ লাইনের 'ছেয়ে'র পর	যাই হোক বাইরে এসে ছারপোকা মারব ভাবছিলাম
৫২	২৫শ লাইনে 'দেখলাম'-এর পর	যে-দিনগুলোর প্রতিধ্বনিও আজ পৃথিবীতে বেঁচে নেই তাদেরই ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছা করে আমার
৫৭	১৪শ লাইনের পর	—মহাভারতে অরুন্ধতী নামটা পড়েছিলাম / পেয়েছিলাম। কার নাম মনে আছে তোমার ? —না। মহাভারত অনেক দিন—
৮১	৬ লাইনের পর	চুপ করে ছিলাম। অঞ্জলি—শোনা উচিত ছিল না হয় তো, কিন্তু বেড়ার পেছনে দাঁড়িয়ে-ছিলাম—কানে গেল সব—সব শুনেছি।
৮৯	১৬শ লাইনে 'ঘোরাচ্ছে'-র পর	কিন্তু একটা খাঁচার পাখিরও যা পথ আছে, তাও তার জন্য নেই। অথচ

রচনাসংগ্রহের পৃষ্ঠা/নির্দেশ		বর্জিত অংশ বা সংশোধন
		বিধাতা যদি তাকে জানতে দিতেন তা হলে সবচেয়ে নির্বিঘ্ন সুন্দর পথই তা তার জন্য ছিল। অঞ্জলির মিষ্টি-সিজম এই রকম। এ আয়ত্ত করতে গিয়ে সে কতগুলো আধুনিক বাংলা নভেল / রচনা পড়েছে তা আমি ঠিক বলতে পারি না। কিন্তু আমি তাকে তার আকাঙ্ক্ষিত
১০০	২৩ লাইনের পর	একটু চুপ থেকে—English III-এর একখানা নোট এনে দিতে হবে আমাকে। —আচ্ছা। —আর মডার্ন ইয়োরোপের একখানা। —আনব। —English history-র একখানা। মাথা নেড়ে হ্যাঁ। —Ethics-এর এগুলোরও কি নোট পড়ব ? —তাই পড়লেই তো ভাল হয়। —ইংরেজির অবিশ্যি টেক্সটগুলো অনেক পরে নিতে হবে। —হ্যাঁ। —টেক্সটও ছেলেদের কাছে পাব, যা বদলে গেছে তাই শুধু কিনে দিতে হবে।
১০৩	১০ লাইনের পর	—হয় তো পাও নি, হয় তো পেয়ে থাকবে, পেলেও সে কথা আমাকে জানাবার তো কোনো দরকার নেই

রচনাসংগ্রহের পৃষ্ঠা/নির্দেশ		বর্জিত অংশ বা সংশোধন
		তোমার।
১০৫	১২ লাইনের পর	—শেষ পর্যন্ত মানুষের হৃদয় নিয়ে একটু খেলা করতে ভাল লাগে আমার
১১০	১০ম লাইনের 'লিখি নি'র পর	যখনই শুনেছি কোনো মেয়েমানুষ আমাকে ভালবেসেছে—তার দৃষ্টির থেকে নিজেকে অদৃশ্য করে—
১১০	১১ লাইনের পর	নারীর কাছ থেকে এই ত্রিশ বছর ধরে নিজেকে আড়ালে আড়ালে রেখে বেড়িয়েছি আমি
১১০	২০শ লাইনের 'দিন'-এর পর	এবং যে জিনিশকে সত্য ও সুন্দর জীবনের প্রয়োজনে সব থেকে প্রিয়তম ও নিকটতম বলে মনে করব সে জিনিশকেও
১১৬	৯ লাইনের পর	স্বপ্নও দেখবে নাকি? সকলেই দেখে —তুমিও কেন দেখবে না। মৃত্যু এসে জীবনের এই উচ্ছিষ্টটুকুকে তুলে নিয়ে যাবে। সে দাম্পত্য এই রকম একদিন। তারপর—অন্ধকার, শান্তি। তা নয় কি অঞ্জলি! যে-জীবনের পথে স্বামী নেই, প্রেম নেই, কেউ নেই, কিছু নেই —খানিকটা আমচুরের অম্বলের জন্য, শীতের এক [ফালি] রোদের জন্য, সেই জীবনের দিকে শিশুর মত হাত বাড়িয়ে কাঁদবে তুমি; মৃত্যুকে মনে হবে হৃদয়হীন ধাঙড়ের মত, কিন্তু

রচনাসংগ্রহের পৃষ্ঠা/নির্দেশ		বর্জিত অংশ বা সংশোধন
		তবুও ঝাড়ু হাতে এসে— —হ্যাঁ, তাই, তাইই—আমি খুব ভাল করেই জানি, আমি খুব ভাল করেই জানি।
১২৩	১০ লাইনের পর	—তুমি একটা ওষুধ খাচ্ছ দেখছিলাম। —হ্যাঁ কড লিভার অয়েল ইমালশন। —ইমালশন কেন? —অঞ্জলি কিনে দিল আমাকে / কিনল আমার জন্য। —কেন, কী হয়েছে তোমার? —সে মনে......

বড়গল্প

পূর্ণিমা

'প্রতিক্ষণ', শারদীয় ১৯৮৫ সংখ্যায় রচনাটি প্রকাশের সময় এই ভূমিকাটুকু ছিল।

জীবনানন্দের বেশির ভাগ পাণ্ডুলিপির মতই এই রচনাটিও খাতায় লেখা—ছাত্র-ব্যবহার্য এক্সারসাইজ খাতায়। অনুমান করতে ইচ্ছে হয়, বুঝি জীবনানন্দের লেখার আগেই সম্ভাব্য আয়তনের একটা আঁচ আসত। ছোটগল্প লিখেছেন যে-খাতাগুলিতে তাতেও দেখা যায় খাতার আয়তনের মধ্যে গল্পগুলি শেষ হয়ে যাচ্ছে। উপন্যাসের সময় এ-রকম একাধিক খাতা তিনি ব্যবহার করতেন। খাতাগুলির প্রথম পাতায় ইংরেজিতে নিজের নাম, জায়গার নাম, তারিখ বা মাস বা বছর এবং উপন্যাস হলে, খাতার ক্রমিক সংখ্যা লিখে রাখতেন। সেই অভ্যাসেই এই রচনাটি যে-দুটি খাতায় ছড়ানো তাতে প্রথম পৃষ্ঠায় ইংরেজিতে জীবনানন্দ দাশ নামটি এবং বরিশাল, নভেম্বর ১৯৩১ কথা কটি লেখা। তার সঙ্গে ওপরের দিকে একটু কোণাচে করে লেখা 'পূর্ণিমা I' ও 'পূর্ণিমা II'। তাঁর এই নামটি আমরা এখানে রক্ষা করেছি। তাঁর এই খাতার হাতের লেখা টানা, ছোট ও অস্পষ্ট। তবে, জীবনানন্দের পাণ্ডু-লিপির সঙ্গে অভ্যস্ত পাঠকের পড়তে অসুবিধে হয় না। সংশোধন কিছু-কিছু আছে। মনে হয়, লিখতে-লিখতেই করেছেন।

উপন্যাসটির একেবারে প্রথম লাইনে 'কুমুদিনী' এই নামটির নীচে দাগ দিয়ে ওপরে 'চপলা' লেখা। কিন্তু তারপর—মাত্র একবার ত্রয়োদশ লাইনে 'সে' কেটে 'চপলা' করা ছাড়া—আর কোথাও এই 'চপলা' নামটি ব্যবহৃত হয় নি। এই চরিত্রটিকে তিনি 'চামেলী' নামেই লিখেছেন।
বানান পরিবর্তন ও যতিচিহ্নের সামান্য বদল ছাড়া এই পাঠে আর-কোনো সংস্কার করা হয় নি। জীবনানন্দের গদ্য-পাণ্ডুলিপির সবচেয়ে পুরোন রচনাগুলির অন্যতম এই 'পূর্ণিমা'।

খাতার বিভিন্ন পাতায় রচনাটির এই সংকেতগুলি লেখা

His ambitions

These sweet and beautiful women

কথাগুলি লিখে কেটে দেয়া।

Where saw didi ?

Name ?

To meet Biraj

Cuttings

Magazines

বিলেতি

Change

P……

all attention and sweetness

While writing

—Neglecting Sontosh—expressing new modes of change and…

—Depending Biraj

রচনাসংগ্রহের পৃষ্ঠা/নির্দেশ		বর্জিত অংশ বা সংশোধন
১৭১	শেষ লাইনের পর	ভাবি দিদির কথা—কপালে যার সৌভাগ্যও রয়েছে স্বয়ং বিধাতাও তা খণ্ডাতে পারে না। নইলে দিদির চেয়ে অকর্মণ্যই-বা আমি কী ছিলাম। লোকে ধরে-ধরে শেষ পর্যন্ত আমাকেই পছন্দ করে গেছে—এক মুখেই সকলে বলে যেত যে তিন বোনের ভিতর পূর্ণিমা রূপগুণেই সবচেয়ে মূল্যবান নয় শুধু—লক্ষ্মী-মতীও সবচেয়ে বেশি—এর কপালেও সব্বায়ের চেয়ে ভাল
১৭৫	২৬শ লাইনে প্রথম দাড়ির পর	সন্তোষ ভাবছে : কিন্তু তা নয়, আমরা নিজেরাই নিজেদের নষ্ট করে ফেলি। নিজেদের সম্যক ভাবে তৈরি করার ভারও আমাদের নিজেদেরই ওপর। তা যখন হল না, যখন নিজের জীবনই নিষ্ফল করলাম না শুধু, অন্যের জীবনও
১৭৯	শেষ লাইনের পর	জীবনের সুশৃঙ্খল. ও ব্যবস্থার বিচারের দিকে তাকিয়ে অন্তত দুই বোন তারা একই সঙ্গে একই দরিদ্রতার ভিতর থেকে এসেছে যে—জীবন এক-জনকে ··
১৮১	১৩শ লাইনে প্রথম দাঁড়ির পর	কিন্তু সেই থেকেই আমার মনের ভিতর একটা সমস্যা বেধে গেছে এই যে নিজের জীবনকে নিয়ে যা খুশি

রচনাসংগ্রহের পৃষ্ঠা/নির্দেশ		বর্জিত অংশ বা সংশোধন
		তাই করি না কেন, নিজের জীবনই বুঝবে তা, কিন্তু অন্য একটা জীবনের কোথায় যে কী সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে—কখন সে আমাদের বিস্মিত করে দেয়, স্তম্ভিত করে দেয়, অপরাধী বানিয়ে দেয়
১৮১	শেষ লাইনের আগের লাইনে প্রথম দাঁড়ির পর	বিয়ের আগে মেয়েমানুষের রূপ-লালসার মোহ আমাকে পথে-পথে ঘুরিয়েছে, কাঁদিয়েছে আমাকে। কিন্তু সে-সব মায়ার জাল জীবনের নতুন উপলব্ধির কাছে রোদের মুখে কুয়াশার মত কত সহজেই ভেসে গেল—কিন্তু কোনো চিন্তা, কোনো অনুভূতি-উপলব্ধিই তো জীবনের করুণা মমতাকে ক্ষুব্ধ [?] করতে পারছে না। বরং নিজেরা যত গভীর হচ্ছে ও-জিনিশগুলোকেও তত গভীর করে নিচ্ছে। একজন ঘরোয়া স্ত্রী ও জীবনের সাধারণ ব্যবস্থা থাকলে এই জিনিশ-গুলোরই ঢের আবশ্যকতা বোধ করতাম আমি···

খাতায় লেখাটির শেষে সমাপ্তিসূচক চিহ্ন আছে।

ছোটগল্প

জুন ১৯৩২, বরিশাল বলে চিহ্নিত একটি খাতায় জীবনানন্দ পর পর তিনটি গল্প লিখেছিলেন। সেই তিনটি গল্পই আমরা এখানে একসঙ্গে রাখছি। তাতে

বোঝা যাবে, গল্প তিনটির ভিতর একটা যোগসূত্র আছে। ডাক্তারি-এনজিনিয়ারিং পেশা, বাঙালি ছোট ব্যবসাদার, ডাক্তার ও এনজিনিয়ারদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস, ছোট ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নানা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা—তিনটি গল্পেই এই পরিবেশ পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে গেছেন লেখক। এমন-কি গল্প তিনটির চরিত্রগুলির মধ্যেও মিল আছে।

মেয়েমানুষ

গল্পের নাম আমরা গল্পের ভিতর থেকে সংগত করেছি। এই গল্পের প্রথম পৃষ্ঠাতে লেখক একটি চরিত্রের নাম দিয়েছেন, 'হেমেন্দ্র'. প্রায় ৬০০ শব্দ পরে এক জায়গায় নিজেই 'হেমেন' কেটে 'ভূপেন' করেছেন। তারপর, আবারও শ খানেক শব্দের পর ঐ একই রকম ভাবে 'ভূপেন' কেটে 'হেমেন' করেছেন ও শ দুই শব্দের পর আবার 'ভূপেন' কেটে 'হেমেন' করেছেন। তার মাত্র শ-খানেক শব্দের পর থেকে রচনার শেষ পর্যন্ত 'ভূপেন'ই লিখে গেছেন। নামের এই গোলমাল আমরা ঠিক করে নিয়েছি। কিছু সংশোধনে নানা বিকল্প থেকে একটি মাত্র আমরা বেছে নিয়েছি। গল্পের প্রায় শুরুর দিকে. আমাদের এই মুদ্রণে প্রথম পৃষ্ঠার ১২ লাইনের পর ('মাথার চুল পাতলা হয়ে আসছে') এই বর্ণনাটি লিখে কেটে দেয়:

> গায়ের চামড়া মুখের চামড়া মাংস [illegible] হয়ে উঠেছে, [illegible]
> শাড়ি ও দুটো ঢাকা; কিন্তু [illegible] মাত্র [illegible]। শুধু
> একটি যে কোন পুরুষের আর একটি মেয়েমানুষের বুঝতে পারা যায় না।

এই বর্ণনার একটা পরোক্ষ ইঙ্গিত রচনার শেষে আছে।

কথা শুধু—কথা, কথা, কথা, কথা, কথা

রচনাসংগ্রহের পৃষ্ঠা/নির্দেশ		পঙ্‌ক্তি অংশ বা সংশোধন
২২৯	২৪শ লাইনে দাঁড়ির পরে	কিছুতেই তার সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না, অবিশ্যি প্রয়োজনও নেই পেরে উঠবার। মিত্তির যে ঘুঘু, জাতঘুঘু—ভবশঙ্কর এ-সব বোঝে। মনে-মনে

রচনাসংগ্রহের পৃষ্ঠা/নির্দেশ		বর্জিত অংশ বা সংশোধন
		সেই জন্য মিস্তিরকে প্রশংসাই করে সে।
২৩৭	১০ লাইনের শেষে	পরিবারের জন্য টাকার ভাণ্ডার রেখে যাওয়া, শুধু পরিবারের জন্য টাকার ভাণ্ডার রেখে যাওয়া— সমস্ত জীবনটা তার পৃথিবীর হিতসাধনের দিকে এটুকুতে এসে দাঁড়ায়? নিজের সন্তানকে নিঃসঙ্কোচে সন্তান জন্মাবার সুবিধা দেয়া শুধু? সেই সন্তান আবার সন্তান জন্মাবে, সমস্ত জীবনটা তার পৃথিবীর হিতসাধনের দিক দিয়ে এটুকুতে এসে দাঁড়ায়?
২৪০	২১শ লাইনের প্রথম শব্দের শেষে	নিজেকে নিজের ঘোড়াটার চেয়েও অধম করে ফেলেছিল; গাড়ি করে বেরলে ঘোড়াটা যে কেমন ছুটে তাকে চালিয়ে নিচ্ছে শুধু মনে এ কথা কতবার সে ভেবেছে। কিন্তু সমস্ত জীবন ভরে নিজের কত যে উপকার হল একবারও মনে হয় নি ভবশঙ্করের।
২৪১	২৩ লাইনের পরে	ঠিক বইয়ের সেলফকেও যেন অমনি করে ছুঁয়ে যেতে পারত বৌমা। নিজে সে এই মেহগিনির সেলফটার মত যেন।
২৪২	৩ লাইনের পরে	জীবনটাকে নিয়ে কী করবে সে এতক্ষণ যেন বুঝতেই পারছিল না। চেয়ারে বসে কাগজপত্র সাজিয়ে

রচনাসংগ্রহের পৃষ্ঠা/নির্দেশ	বর্জিত অংশ বা সংশোধন
.	কলম ধরেই বুঝতে পারল—এইই করবে সে, চেয়ারে বসে কাগজপত্র সাজিয়ে কলমটা তুলে ধরবে শুধু ?

দেবেশ রায়